শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি

ফিকহি মাকালাত

আধুনিক সমস্যার শরয়ি সমাধান

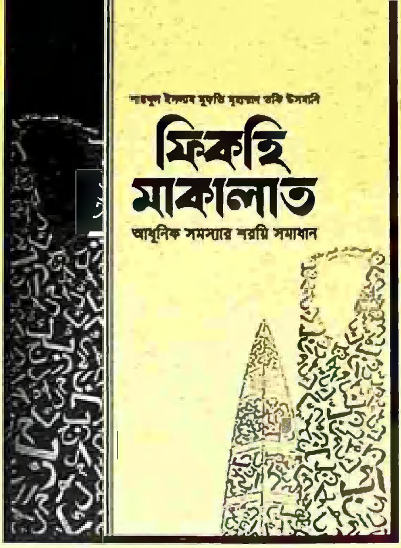

গ্রন্থ সম্পর্কে

শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি (হাফিজাহুল্লাহ) বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফকিহ। আধুনিক সমস্যার সমাধান বিষয়ে তার রচনা-বক্তৃতা পুরো বিশ্বে মুসলিম উম্মাহর ব্যাপক উপকার ও কল্যাণ বিতরণ করছে। 'ফিকহি মাকালাত' গ্রন্থটি শায়খুল ইসলামের সেসব রচনার সংকলন-সমষ্টি। এসব রচনার অধিকাংশ সেমিনারে উপস্থাপিত হয়েছে এবং প্রবন্ধ আকারে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এতে আধুনিক সমস্যাবলির সমাধান তুলে ধরা হয়েছে, ফলে মুদ্রাব্যবস্থা, হালাল-হারাম, ক্রয়-বিক্রয়, ব্যাংকিং ব্যবস্থা, পবিত্রতা অর্জন, কাজা নামাজ, ট্রাফিক দুর্ঘটনা, মাতৃদুগ্ধ পান, আমদানি-রপ্তানি, মুদারাবা, জাকাত, জিহাদ, ভোট-নির্বাচন, পশু জবাই, আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার, হারাম বস্তু দিয়ে চিকিৎসা, মানব-অঙ্গ প্রতিস্থাপন, ইত্যাদি বিষয়ে উদ্ভূত বিভিন্ন অবস্থার বিশ্লেষণ অত্যন্ত সুচারুরূপে এ গ্রন্থে তুলে ধরা হয়েছে।

আধুনিক সমস্যার শরয়ি সমাধান

ফিকহি মাকালাত

৪

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

আধুনিক সমস্যার শরয়ি সমাধান
ফিকহি মাকালাত-৪

মূল : শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি

তরজমা : মুফতি মুহাম্মাদ ইসমাইল

সম্পাদনা : মাকতাবাতুল ইসলাম সম্পাদনা পর্ষদ

ভাষা সম্পাদনা : আহমাদ গালিব

বিষয় সম্পাদনা : মুফতি রেজওয়ান বিন রায়হান

বানান ও ভাষারীতি : মাকতাবাতুল ইসলাম

সম্পাদক মণ্ডলী

১. মুফতি রেজওয়ান বিন রায়হান। ২. মুফতি আবদুল কাইয়ুম শেখ। ৩. মুফতি রাওয়াহা। ৪. মুফতি সাইফ আকরামি। ৫. মাওলানা আহমাদ গালিব। ৬. মাওলানা ফরিদ মাসউদ। ৭. মুফতি মুহাম্মাদুল্লাহ মুজাহিদ। ৮. মাওলানা হাসান আহমাদ।

আধুনিক সমস্যার শরয়ি সমাধান

ফিকহি মাকালাত

৪

শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি

MAKTABATUL ISLAM

মাকতাবাতুল ইসলাম

আধুনিক সমস্যার শরয়ি সমাধান

ফিকহি মাকালাত-৪

মূল : শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি

তরজমা : মুফতি মুহাম্মাদ ইসমাইল

সম্পাদনা : মাকতাবাতুল ইসলাম সম্পাদনা পর্ষদ

প্রকাশক

হাফেজ কুতুবুদ্দিন ইবনু আশ-শায়খ মুহিউদ্দিন আহমাদ

সর্বস্বত্ব : সংরক্ষিত

পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রি.

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০১৫ খ্রি.

প্রচ্ছদ : মাকতাবাতুল ইসলাম

মূল্য : BD ৳ ৪৭০, US $ 10, UK £ 8

সার্বিক যোগাযোগ

মাকতাবাতুল ইসলাম

[সেরা মুদ্রণ ও প্রকাশনার অগ্রপথিক]

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
৬৬২ আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা
ঢাকা-১২১২

বাংলোবাজার বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামি টাওয়ার (২য় তলা)
বাংলোবাজার, ঢাকা-১১০০

০১৯১১৬২০৪৪৭, ০১৯১২৩৯৫৩৫১, ০১৯১১৪২৫৬১৫, ০১৯১১৪২৫৮৮৬

ISBN : 978-984-91049-1-9

www.facebook/Maktabatul Islam

www.maktabatul-islam.com

FIQHI MAKALAT 4.TH

Writer : Shaikhul Islam Mufti Mohammad Taqi Osmani

Translatet by : Mufti Muhammad Ismail

একমাত্র পরিবেশক : অর্পণ প্রকাশন

অনলাইন পরিবেশক

rokomari.com, wafilife.com, boibiswa.com

بسم الله الرحمن الرحيم

সূচি

উমরি কাজার হাকিকত-১১

কারাগার, সেনানিবাস ও বিমানবন্দরে জুমার নামাজ-২৭

নারীর হিজাব ও তার সীমারেখা-৩৯

ইসলামে ছবি-ভাস্কর্যের বিধান-৭১

হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসার বিধান-১০৩

পশু জবাইয়ের বিধান-১১৭

আধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা পশু জবাইয়ের পদ্ধতি ও তার হুকুম-১৭৭

অমুসলিম দেশ থেকে আমদানিকৃত গোশতের বিধান-২০৩

বিস্তারিত সূচি

উমরি কাজার হাকিকত ১৩
উমরি কাজা সম্পর্কে জাল হাদিস ২১
উমরি কাজার সঠিক পদ্ধতি ২২
নামাজের ফিদয়া ২৪
সারকথা ২৫

কারাগার, সেনানিবাস ও
বিমানবন্দরে জুমার নামাজ ২৯
সারকথা ৩৭

নারীর হিজাব ও তার সীমারেখা ৪১
শরয়ি পর্দার তিন স্তর ৪১
পর্দার প্রথম স্তরটিই মুখ্য : শরিয়তের দলিল ৪২
পর্দার দ্বিতীয় স্তর : শরিয়তের দলিল ৪৬
নারী সাহাবি ও পর্দা ৪৯
পর্দার তৃতীয় স্তর : শরিয়তের দলিল ৫২
নারীদের প্রতি দৃষ্টিপাত ৫৭
হানাফি মাজহাব ৫৭
সারমর্ম ৭০

ইসলামে ছবি-ভাস্কর্যের বিধান ৭৩
ছবির নিষেধাজ্ঞা-সম্বলিত হাদিসসমূহ ৭৩
ছবি সম্পর্কে সাহাবিগণের অভিমত ও তাঁদের কর্মপন্থা ৭৯
ফকিহগণের মাজহাব ৮৩
ক্যামেরার ছবি বা ফটোগ্রাফির বিধান ৯৪

প্রয়োজনের সময় ছবি তোলা ৯৯
টিভি ও ভিডিও ১০০

হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসার বিধান ১০৫
হাম্বালি মাজহাব ১০৬
শাফিয়ি মাজহাব ১০৬
মালিকি মাজহাব ১০৭
হানাফি মাজহাব ১০৮
অধিকাংশ হানাফি আলেমের ফতোয়া ও তার দলিল ১১০
হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা নাজায়েজ হওয়ার দলিল ১১২
হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা জায়েজ
দাবিদার ফকিহগণের পক্ষ থেকে জবাব ১১৫

পশু জবাইয়ের বিধান ১১৯
এক. শরিয়তসম্মত জবাই এবং তার শর্তাবলি ১২৩
পশুর প্রাণ বের করার পদ্ধতি ১২৫
জবাইয়ের যন্ত্র ১২৮
রগ-শিরা কাটা ছাড়া প্রাণ বের করা ১২৯
দুই. জবাইয়ের সময় বিসমিল্লাহ পড়া ১৩২
তিন. জবাইকারীর শর্তসমূহ ১৪৭
আহলে কিতাবের জবাইকৃত পশুর মাসআলা ১৫১
আহলে কিতাবের জন্য শরিয়তসম্মত
পদ্ধতিতে পশু জবাই করা ১৫৩
আহলে কিতাবের জবাইয়ে কি 'বিসমিল্লাহ' শর্ত? ১৬৪
যারা নিজেদের খ্রিস্টান বলে পরিচয় দেয় সেসব
বস্তুবাদী নাস্তিকদের জবাইকৃত পশুর হুকুম ১৬৯
জবাইকারী অজ্ঞাত থাকলে জবাইকৃত পশুর হুকুম ১৭২

আধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা পশু জবাইয়ের পদ্ধতি ও তার হুকুম ১৭৯
মুরগি জবাইয়ের আধুনিক পদ্ধতি ও তার বিধান ১৭৯
এক. বিদ্যুৎ-সংযোজিত ঠান্ডা পানির ভেতর দিয়ে মুরগি অতিবাহিত হওয়া ১৮১
দুই. ঘূর্ণায়মান ছুরি দ্বারা মুরগির মাথা কাটা ১৮২
তিন : জবাইয়ের সময় বিসমিল্লাহ বলা ১৮৩
চার. গরম পানির ভেতর দিয়ে মুরগি অতিবাহিত হওয়া ১৯৪
মেশিনে জবাইকৃত মুরগির বর্ণিত আলোচনার সারকথা ১৯৬
মেশিনে চতুষ্পদ জন্তু জবাই ১৯৭
পশু অজ্ঞানের পদ্ধতি ১৯৯
অজ্ঞান করে জবাইকৃত পশুর হুকুম ২০১

অমুসলিম দেশ থেকে আমদানিকৃত গোশতের বিধান ২০৫
গ্র্যান্ড ওলামা বোর্ডের সিদ্ধান্ত ২০৮
আমদানিকৃত গোশতের জটিলতা নিরসন ২১৩
আলোচনার সারমর্ম ২১৫
সুপারিশসমূহ ২২১

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক
https://t.me/islaMic_fdf

বিষয় : উমরি কাজার হাকিকত

শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি

এই প্রবন্ধটি মূলত একটি প্রশ্নের জবাব। ফারাহাত হাশেমি নামের এক ডাক্তার উমরি কাজার ব্যাপারে মন্তব্য করেন যে, উমরি কাজা নামাজ আদায় করা জরুরি নয়। বরং এর পরিবর্তে শুধু তাওবা করাই যথেষ্ট। এমন মন্তব্য সঠিক কি না? এর জবাবে শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি (হাফিজাহুল্লাহ) এ জবাব লেখেন।

—আবদুল্লাহ মায়মান

মাকতাবাতুল ইসলাম মাকতাবাতুল ইসলাম

উমরি কাজার হাকিকত

প্রশ্ন : ডাক্তার ফারাহাত হাশেমি দরসে কুরআনে খুব জোরেশোরে এ কথা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, মানুষের মাঝে উমরি কাজার যে মাসআলাটি প্রসিদ্ধ আছে অর্থাৎ, নামাজবিহীন কোনো মানুষ যখন পেছনের ছুটে-যাওয়া নামাজ আদায় করা শুরু করে; তখন অতীতের সব নামাজই আদায় করতে হবে। এ ব্যাপারে কুরআন-হাদিসের কোনো ভিত্তি নেই। বরং বিগত জীবনের ছুটে-যাওয়া নামাজের কাফফারা শুধু তাওবার মাধ্যমেই হয়ে যাবে। ছুটে-যাওয়া নামাজ আদায় করার কোনো প্রয়োজন নেই।

শায়খের কাছে আমার আবেদন, অনুগ্রহপূর্বক এ ব্যাপারে শরিয়তের বিধান সম্পর্কে আমাদের অবহিত করবেন। বাস্তবেই কি উমরি কাজার গুরুত্ব আছে? চার ইমান কিংবা ফকিহগণের মাঝে কারও এমন কোনো অভিমত আছে কি? যদি অনেক নামাজ কাজা হয়ে যায় তাহলে কি তার কাফফারা শুধু তাওবার মাধ্যমেই হয়ে যায় এবং তার উমরি কাজা কি জরুরি নয়? যদি ওই ডাক্তারের কথা সঠিক না হয় তাহলে তার দরসে কুরআনের ওপর আস্থা রাখা যায় কি? আর যদি উমরি কাজা আদায় করার গুরুত্ব থেকেই থাকে তাহলে তা আদায়ের সঠিক পদ্ধতি কী?

—মুহাম্মাদ রিদওয়ান
করাচি, পাকিস্তান

উত্তর : বুখারি শরিফে আনাস ইবনু মালিক রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها ولا كفارة لها إلا ذالك.

'যে ব্যক্তি কোনো নামাজ আদায়ের কথা ভুলে যায়, স্মরণ হওয়া মাত্রই তার ওই নামাজ আদায় করা জরুরি। তা ছাড়া এই নামাজের আর কোনো কাফফারা নেই।'[১]

মুসলিম শরিফে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এই ভাষ্যে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে—

إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنهما فليصلها إذا ذكرها فإن الله عز وجل يقول : أقم الصلاة لذكري.

'যদি কোনো ব্যক্তি নামাজ আদায় না করে ঘুমিয়ে যায় অথবা অলসতার কারণে নামাজ ছুটে যায় তাহলে স্মরণ হওয়া মাত্রই তা আদায় করে নেবে। কেননা, মহান আল্লাহ বলেন— (أقم الصلاة لذكري) 'আমার স্মরণ হওয়া মাত্রই নামাজ কায়েম করো।'[২]

সুনানে নাসায়িতে বর্ণিত হয়েছে—

سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يرقد عن الصلاة أو يغفل عنها . كفارتها أن يصليها إذا ذكرها.

'যে ব্যক্তি নামাজের সময় ঘুমিয়ে গেছে অথবা অলসতার কারণে যার নামাজ ছুটে গেছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে বলেন, এর কাফফারা হলো, যখনই নামাজের কথা স্মরণ হবে তখনই নামাজ আদায় করে নেবে।'[৩]

বর্ণিত হাদিসগুলোতে রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মূলনীতি বর্ণনা করে দিয়েছেন—সময়মতো যখন কোনো নামাজ আদায় করা সম্ভব হবে না তখন তার জন্য জরুরি হলো, স্মরণ হওয়া মাত্রই নামাজ আদায়

---

[১] সহিহ বুখারি, কিতাবুল মাওয়াকিত, অধ্যায় : ৩৭, হাদিস : ৫৯৭।

[২] সহিহ মুসলিম, কিতাবুল মাসাজিদ, হাদিস : ১৫৬৯।

[৩] সুনানে নাসায়ি, কিতাবুল মাওয়াকিত, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৭১।

করে নিতে হবে—চাই নামাজ ভুলের কারণে কিংবা ঘুমের কারণে অথবা অলসতার কারণে ছুটে যাক।

সহিহ্ মুসলিম ও সুনানে নাসায়ির বর্ণনায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র কুরআনের আয়াত أقم الصلاة لذكري বলে এ কথা স্পষ্ট করে বুঝিয়েছেন যে, পবিত্র কুরআনের এ আয়াতে কাজা নামাজ আদায় করার নির্দেশ রয়েছে। আর আয়াতের ব্যাখ্যা হলো, যখনই মানুষের মহান আল্লাহর এই ফরজ আদায়ের কথা স্মরণ হবে তখনই নামাজ আদায় করে নেবে।

এই নীতিমালা বর্ণনা করার সময় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজের কোনো পরিসংখ্যান নির্দিষ্ট করে দেননি যে, এই পরিমাণ নামাজ কাজা হলে, আদায় করা ওয়াজিব। (আর এই পরিমাণ নামাজ কাজা হলে আদায় করা ওয়াজিব নয়)। যেমন : খন্দক যুদ্ধে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেশ কয়েক ওয়াক্ত নামাজ ছুটে গিয়েছিলো; তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবগুলো নামাজই আদায় করেছেন। যার বিস্তারিত বর্ণনা হাদিসের প্রায় সব কিতাবেই এসেছে। সে ক্ষেত্রেও রাসুলে আরাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেননি যে, যদি এর চেয়ে বেশি নামাজ ছুটে যায় তাহলে এর কাজা ওয়াজিব নয়।

শরিয়তের একটি সর্বস্বীকৃত নীতি হলো, কুরআন-হাদিসে যখন সাধারণ কোনো বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়, তখন তার প্রতিটি শাখা-প্রশাখার জন্য পৃথক কোনো নির্দেশ দেওয়া হয় না। এর কোনো প্রয়োজনও নেই। যেমন : পবিত্র কুরআনে রমজানের রোজা ফরজ হওয়ার নির্দেশ উল্লেখ করে এ কথা উল্লেখ করে দিয়েছেন—

﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾

'তোমাদের মাঝে কেউ অসুস্থ হলে কিংবা সফরে বের হলে পরবর্তী সময়ে সে ওই সংখ্যা অনুপাতে পূর্ণ করে নেবে।'[৪]

এ আয়াতে সাধারণভাবে একটি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নির্দেশটি হলো, যদি কেউ অসুস্থতা কিংবা সফরের কারণে রোজা রাখতে না পারে তাহলে পরবর্তী সময়ে কাজা করে নেবে। এতে এ কথা বলা হয়নি এবং তা বলার

[৪] সুরা বাকারা : ১৮৪।

প্রয়োজনও নেই যে, এক রমজানে রোজা কাজা হলে এই বিধান। এখানে বরং এটি একটি সাধারণ নির্দেশ। এতে রোজা ছুটে যাওয়ার সবধরনের অবস্থাই অন্তর্ভুক্ত। এখন যদি কারও দুই রমজানের রোজা একসঙ্গে ছুটে যায় আর সে ছুটে-যাওয়া দুই রমজানের রোজা কাজার ব্যাপারে আলাদা আলাদা বিধান খোঁজে তাহলে তার এই অনুসন্ধান হবে অযৌক্তিক ও নীতি-ভ্রষ্টতার পরিচায়ক। এমনিভাবে একাধিক নামাজ কাজা আদায়ের দলিল খোঁজা ভ্রান্তি হিসেবেই বিবেচিত হবে। বাস্তব কথা হলো, যদি কোনো ব্যক্তি শরিয়তের সাধারণ নির্দেশ থেকে কোনো কিছু বাইরে রাখতে চায়, তাহলে এর জন্য স্বতন্ত্র দলিলের প্রয়োজন। অর্থাৎ, তখন সেটি স্বতন্ত্র দলিলের ভিত্তিতে প্রমাণিত হবে যে এ বিষয়টি উল্লিখিত হুকুম থেকে পৃথক। কাজেই, কুরআন-হাদিসের সাধারণ নির্দেশের বহির্ভূত হওয়ার ব্যাপারে প্রমাণ পেশ করতে না পারলে সাধারণ নির্দেশ স্বস্থানেই বহাল থাকবে।

কাজা নামাজ আদায়ের যে নির্দেশ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণিত হাদিসের মাধ্যমে দিয়েছেন, তার ওপর ভিত্তি করে ফকিহগণ পরিস্কারভাবে এই সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, ছুটে-যাওয়া নামাজের সংখ্যা যত বেশিই হোক, তার কাজা আদায় করা জরুরি। হানাফি মাজহাবের প্রসিদ্ধ আলেম ইবনু নুজাইম রহ. লিখেছেন—

فالأصل فيه أن كل صلاة فاتت عن الوقت بعد ثبوت وجوبها فيه، فإنه يلزم قضاؤها، سواء ترك عمدا أو سهوا أو بسبب نوم، وسواء كانت الفوائت قليلة أو كثيرة.

এ ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো, ওয়াজিব হওয়ার পর যে নামাজ ছুটে গিয়েছে, তা আদায় করা ওয়াজিব। সেটি ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় আর ভুলের অথবা ঘুমের কারণে—যেভাবেই ছুটুক না কেন। এই অভিমত শুধু হানাফি ইমামদের নয় বরং মালিকি, শাফিয়ি এবং হাম্বালি মাজহাবের সকলে ইমামেরই এ মত।[৫]

ইমাম মালিক রহ. বলেন—

من نسي صلوات كثيرة أو ترك صلوات كثيرة فليصل على قدر طاقته،

[৫] মক্কা মুকাররমা থেকে মুদ্রিত আল-বাহরুর রায়েক, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৪১।

وليذهب إلى حوائجه، فإذا فرغ من حوائجه صلى أيضا ما بقي عليه حتى يأتي على جميع ما نسي أو ترك.

'যার অনেক নামাজ ভুলে ছুটে যায়, কিংবা যে স্বেচ্ছায় অনেক নামাজ ছেড়ে দিয়েছে তার জন্য ওয়াজিব হলো, ছুটে-যাওয়া নামাজ আদায় করার জন্য সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া এবং একইসঙ্গে নিজের প্রয়োজনীয় কার্যক্রমও আদায় করতে থকা। তবে যখনই এ ব্যক্তি সুযোগ পাবে তখনই ছুটে-যাওয়া নামাজ আদায় করতে থাকবে। সে কাজা নামাজ আদায় করতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তার কাজা নামাজ আদায় শেষ হবে। এমনকি ভুলক্রমে যে নামাজ ছুটে গিয়েছিলো তারও কাজা আদায় সম্পন্ন করতে হবে।'[৬]

ইমাম মালিক রহ.-এর এ কথাটি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মালিকি মাজহাবের ইমাম দুসুকি মালিকি রহ. বলেন—

فيكفى أن يقضي فى اليوم الواحد صلاة يومين فأكثر، ولا يكفي قضاء صلاة يوم في يوم إلا إذا خشي ضياع عياله إن قضى أكثرمن يوم في يوم، وفي ..... أجوبة ابن رشد أنه إنما أمربتعجيل قضاء الفوائت خوف معالجة الموت، وحينئذ فيجوز التاخير لمدة بحيث يغلب على الظن وفاؤه بها فيها.

'একদিনে দুই বা ততধিক দিনের কাজা নামাজ আদায় করা যথেষ্ট। একদিনে শুধু একদিনের কাজা নামাজ আদায় করা যথেষ্ট নয়। তবে হ্যাঁ, যদি একাধিক দিনের কাজা নামাজ আদায় করতে গেলে পরিবার-পরিজনের কষ্ট হয় তাহলে একদিনের কাজা নামাজই আদায় করতে হবে। ইবনু রুশদের জবাবে এ কথা উল্লেখ আছে যে, দ্রুত কাজা নামাজ আদায়ের নির্দেশ এ জন্য দেওয়া হয়েছে, যেন মৃত্যুর ডাক এসে না যায়। সুতরাং এ পরিমাণ সময় বিলম্ব করার সুযোগ আছে, যে পরিমাণ সময়ের মধ্যে পুরো কাজা নামাজ আদায় করার নিশ্চিত সম্ভাবনা থাকে।[৭]

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রহ.-এর মাজহাবেও কাছাকাছি এমন মন্তব্যই বর্ণিত

[৬] আল মুদাওয়ানাতুল কুবরা, ইমাম মালিক, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২১৫।
[৭] হাশিয়া দুসুকি আলা শারহিল কাজি, খণ্ড : ১,পৃষ্ঠা : ২৬৩।

হয়েছে। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রহ.-এর একজন বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী মুরদাবি রহ. বলেন—

(ومن فاتته صلوات لزمه قضاؤها على الفور) هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم..... قوله : لزمه قضاؤها على الفور، مقيد بما إذا لم يتضرر في بدنه أو معيشته يحتاجها، فإن تضرر بسبب ذلك سقطت الفورية.

'যে ব্যক্তির প্রচুর নামাজ ছুটে গেছে, তার জন্য তাৎক্ষণিক কাজা নামাজ আদায় করা ওয়াজিব। এটিই মাজহাবের অভিমত যার ওপর প্রমাণাদি উত্থাপিত হয়েছে। হাম্বালি মাজহাবের বড়ো একটি অংশের অভিমত এটিই অর্থাৎ, কাজা নামাজ তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করা ওয়াজিব এবং এটিই অনেকের চূড়ান্ত অভিমত। অবশ্য তা আদায় অপরিহার্য হওয়ার বিষয়টি এই শর্তের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে, এর ফলে যেন তার দৈহিক বা জীবিকার কোনো ক্ষতির আশংকা না থাকে। যদি এমনটি হয়, তাহলে তাৎক্ষণিক আদায়ের নির্দেশটিও রহিত হয়ে যাবে।[৮]

ইমাম শাফিয়ি রহ.-এর মাজহাবে এ ব্যাপারে কিছুটা শিথিলতা রয়েছে, কোনো অসুবিধার কারণে নামাজ ছুটে গেলে তাৎক্ষণিক আদায় না করে বিলম্বে আদায় করা জায়েজ আছে। তবে কোনো অসুবিধা ছাড়া নামাজ কাজা হলে তাৎক্ষণিক আদায় জরুরি।

(من فاته)..... (مكتوبة) فأكثر (قضى) ما فاته بعذر أو غيره، نعم غير المعذور يلزم القضاء فورا، ويظهر أنه صرف جميع زمنه للقضاء ماعدا ما يحتاج لصرفه فيما لا بد منه.

'যে ব্যক্তির এক বা একাধিক ফরজ নামাজ ছুটে গিয়েছে, তার জন্য জরুরি হলো, ছুটে-যাওয়া নামাজ আদায় করা। চাই কোনো অসুবিধার কারণে কাজা হোক অথবা বিনা কারণে কাজা হোক। তবে বিনা কারণে যার নামাজ কাজা হয়েছে তার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে কাজা নামাজ আদায় করা ওয়াজিব।' উল্লেখ্য, সে পুরো সময়টি কাজা নামাজ আদায়ে ব্যয় করবে। শুধু এতটুকু সময় ছাড় পাবে যতটুকু সময় তার জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রয়োজন।[৯] ইমাম ইবনু তাইমিয়া রহ. ফকিহগণের এই অভিমত বর্ণনা করে একমত পোষন করে বলেন—

ومن عليه فاتته فعليه أن يبارد إلى قضاؤها على الفور سواء فاتته عمدا أو سهوا عند جمهور العلماء كمالك وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم، وكذلك الراجح في مذهب الشافعي أنها إذا فاتت عمدا كان قضاؤها واجبا على الفور.

'যে ব্যক্তির জিম্মায় কোনো কাজা নামাজ থাকে তার জন্য ওয়াজিব হলো, দ্রুত সে নামাজ আদায় করে নেওয়া। চাই সে নামাজ ইচ্ছাকৃতভাবে কাজা হোক কিংবা ভুলক্রমে। এটিই অধিকাংশ ফকিহ-এর অভিমত। যেমন : ইমাম মালিক রহ. ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল এবং ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর অভিমত এটি। ইমাম শাফিয়ি রহ.-এর মাজহাবেও এটিই প্রাধান্যপ্রাপ্ত, ইচ্ছাকৃতভাবে কাজা করলে তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করা ওয়াজিব।'[১০]

ইমাম ইবনু তাইমিয়া রহ.-কে জিজ্ঞেস করা হলো—

رجل عليه صلوات كثيرة فاتته هل يصليها بسننها؟ أم الفريضة وحدها.

'যে ব্যক্তির প্রচুর পরিমাণে কাজা নামাজ রয়েছে, সে ওই নামাজ আদায় করতে কি সুন্নতও পড়বে? না শুধু ফরজ আদায় করবে?

ইবনু তাইমিয়া রহ. জবাব দেন—

المسارعة إلى قضاء الفوائت الكثيرة أولى من الإشتغال عنها بالنوافل، وأما مع قلة الفوائت فقضاء السنن معها حسن.

কাজা নামাজের সংখ্যা বেশি হলে তখন কাজা আদায় করা নফল আদায়ের চেয়ে উত্তম। হ্যাঁ, তবে যদি কারও নামাজের সংখ্যা কম হয় তাহলে সুন্নতসহ আদায় করা উত্তম।[১১]

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ফকিহগণের সামনেও এ বিষয়টি ছিলো,তারা সবাই এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন যে, কাজা নামাজের স্মরণ হওয়া-মাত্রই আদায় করে নেওয়া ওয়াজিব। আর যদি একান্তই দেরি করতে হয় তাহলে দৈনিক কী পরিমাণ নামাজ আদায় করতে হবে সে বিষয়টিও পরিস্কার করে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, সুন্নত পড়তে হবে কি না? কাজা নামাজ

[১০] ফতোয়া শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া, খণ্ড : ২৩, পৃষ্ঠা : ২৫৯।
[১১] ফতোয়া শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া, খণ্ড : ২২, পৃষ্ঠা : ১০৪।

আদায়ে তারতিব (ধারাবাহিকতা) রক্ষা করতে হবে কি না? এ বিষয়গুলোও তারা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। কিন্তু নামাজের সংখ্যা যত বেশিই হোক না কেন কাজা আদায় করতে হবে কি না—এমন কথা প্রসিদ্ধ ফকিহগণের কেউ বলেননি। প্রসিদ্ধ ফকিহগণের সকলেই এ মত পোষণ করেছেন যে, অবশ্যই কাজা আদায় করতে হবে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোষণা অনুযায়ী, পবিত্র কুরআনের আয়াত— أقم الصلاة لذكري 'আমার স্মরণ হওয়া মাত্রই নামাজ আদায় করো'-এর মর্মার্থ হিসেবে এ বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত আছে যে, কাজা নামাজের কথা স্মরণ হওয়া মাত্রই কাজা আদায়ের চিন্তা করতে হবে—কুরআন-হাদিসে এমন কোনো দলিল নেই, যা দ্বারা এটি বোঝা যায়, বেশি সংখ্যক নামাজ কাজা হলে আদায় করতে হবে না। আর এ বিষয়টিও তো হাস্যকর ব্যাপার যে, কাজা নামাজের সংখ্যা কম হলে আদায় করতে হবে, কিন্তু বেশি হলে আদায় করতে হবে না। এমন কে আছে যে এ সিদ্ধান্ত বলে দেবে যে, এই পরিমাণ হলে কাজা আদায় করতে হবে আর এই পরিমাণ হলে আদায় করতে হবে না?

প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির ওপর নামাজ পড়া ফরজ। এটি দিবালোকের মতো স্পষ্ট। এই ফরজ বিধানটি শরিয়তে অন্যান্য ফরজের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এটি একটি স্বীকৃত নীতিমালা যে, যদি কোনো ফরজ অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত হয় তাহলে এ থেকে দায়মুক্তির জন্য কমপক্ষে অনুরূপ একটি অকাট্য প্রমাণের প্রয়োজন। আর এ ক্ষেত্রে অকাট্য দলিল তো নেই-ই বরং দুর্বল থেকে দুর্বলতম দলিলও খুঁজে পাওয়া যায় না—যার ভিত্তিতে এ কথা বলা যায় যে, মানুষের ওপর যে নামাজ ফরজ হয়েছে তা যদি উদাসীনতা বা অলসতার কারণে আদায় না করে থাকে তাহলে তার (ফরজিয়্যাত) অপরিহার্যতা রহিত হয়ে যায়। (অর্থাৎ, তার নামাজ কাজা আদায় করতে হবে না।)

কাজেই, কাজা নামাজের সংখ্যা বেশি হলে আদায় করতে হবে না, এমন দাবি করা কুরআন-সুন্নাহ ও ফকিহগণের ঐকমত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত, আর নামাজের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত ভ্রান্ত যুক্তির মাধ্যমে বিচূর্ণ করে দেওয়ার নামান্তর। যা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আর এ কথা বলা চরম ভণ্ডামি যে, ছুটে-যাওয়া নামাজের কাফফারা হিসেবে শুধু তাওবাই যথেষ্ট। কারণ, তাওবা কবুল হওয়ার অন্যতম শর্ত হলো, সামর্থ্যানুযায়ী নিজ

ভুলের সংশোধন করার মাধ্যমেই তাওবা কবুল হতে পারে। অন্যথায় নয়।

উমরি কাজা সম্পর্কে জাল হাদিস

এখানে এ বিষয়টি স্পষ্ট করে দেওয়া প্রয়োজন যে, উসুলে হাদিসের বিভিন্ন গ্রন্থে জাল হাদিসের আলামত সনাক্ত করতে গিয়ে উমরি কাজার হাদিস দৃষ্টান্ত হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। যেমন : শাহ আবদুল আজিজ মোহাদ্দিসে দেহলবি রহ. 'হাদিসের পঞ্চম আলামত' বর্ণনা করতে গিয়ে লেখেন—

'জাল হাদিসের পঞ্চম আলামত হলো, সেগুলো এমন হাদিস যেগুলো বিবেক এবং শরিয়তের চাহিদার পরিপন্থি এবং শরিয়তের নীতিমালাও যেগুলোকে মিথ্যে সাব্যস্ত করে। যেমন : উমরি কাজার হাদিস।[১২]

হতে পারে মুর্খ ব্যক্তি এ থেকে এমনও বুঝতে পারে যে, পূর্বের ছুটে-যাওয়া কাজা নামাজ আদায়ের কোনো ভিত্তি নেই এবং এব্যাপারে যে হাদিস আছে, সেগুলো জাল হাদিস। তাই এ বিষয়টিও পরিস্কার করে দেওয়া জরুরি মনে করছি। ভিত্তিহীন কিছু দোয়া ও অজিফার কিতাবে এমন জাল হাদিসও বর্ণিত হয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে যে, নির্দিষ্ট কোনো একদিনে শুধু এক ওয়াক্ত কাজা নামাজ আদায় করে নিলে সত্তর বছরের কাজা নামাজ আদায় হয়ে যাবে। মুহাদ্দিসগণ এমন হাদিসকে জাল বলে আখ্যা দিয়েছেন। মোল্লা আলি কারি রহ. জাল হাদিসের ওপর লেখা তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আল-মাওজুয়াতুল কুবরা'য় বলেছেন—

> حديث : من قضى صلاة من الفرائض في آخر جمعة من شهر رمضان كان ذلك جابرا لكل صلاة فائتة في عمره إلى سبعين سنة، باطل قطعا، لأنه مناقض للإجماع على أن شيئا من العبادة لا يقوم مقام فائتة سنوات.
>
> 'যে ব্যক্তি রমজানের শেষ জুমায় একটি ফরজ নামাজ কাজা পড়বে তা তার সত্তর বছরের ছুটে-যাওয়া কাজা নামাজের জন্য কাফফারা হয়ে যাবে। এই রেওয়ায়েতটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও বাতিল বলে গণ্য হবে। কারণ, এ জাতীয় রেওয়ায়েত উম্মতের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের বিপরীত। উম্মাহর সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃত অভিমত হলো, কোনো ইবাদতই বছরের

---

[১২] উজালায়ে নাফিয়া : ২৪।

পর বছর ছুটে-যাওয়া নামাজের স্থলাভিসিক্ত হতে পারে না।[১৩]

ইমাম শাওকানি রহ. লেখেন—

حديث : من صلى في آخر جمعة من رمضان الخمس الصلوات المفروضة في اليوم والليلة قضت عنه ما أخل به من صلاة سنة، هذا موضوع لا إشكال فية.

'যে ব্যক্তি রমজানের শেষ জুমায় দিনে-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ আদায় করবে। এর দ্বারা তার মধ্যে পুরো বছরের নামাজে যে অপূর্ণতা রয়েছে সেসবের কাজা আদায় হয়ে যাবে। [১৪]

শাহ আবদুল আজিজ রহ.-এর উল্লিখিত ভাষ্যে উমরি কাজার যেসব বর্ণনাকে জাল সাব্যস্ত করা হয়েছে তা দ্বারা সেসব বর্ণনাই উদ্দেশ্য যেসব বর্ণনায় একটিমাত্র অথবা কয়েকটি নামাজকে গোটা জীবনের ছুটে-যাওয়া সব নামাজের ক্ষতিপূরণ বলা হয়েছে। মূলত এ জাতীয় বর্ণনার কোনো ভিত্তি নেই।

মোল্লা আলি কারি রহ. এসব বর্ণনা জাল হওয়ার ব্যাপারে এ কারণও উল্লেখ করেছেন যে, একটি বা কয়েকটি নামাজ বছরের পর বছর কাজা নামাজের প্রতিকার হতে পারে না। এব্যাপারে উম্মতের ঐকমত্য রয়েছে। সুতরাং এসব বর্ণনাকে জাল সাব্যস্ত করার দ্বারা যদি কারও মাঝে এই ভুল ধারণা সৃষ্টি হয় যে, উমরি কাজার বিষয়টি মূলত কল্পিত ও ভিত্তিহীন, উমরি কাজা অর্থাৎ, বিগত দিনের ছুটে-যাওয়া নামাজের কাজা আদায় করা জরুরি নয়, তাহলে তা হবে নিরেট মুর্খতা ও অজ্ঞতা।

উমরি কাজার সঠিক পদ্ধতি

কুরআন-সুন্নাহ ও ফকিহগণের ঐকমত্যের ভিত্তিতে এ বিষয়টি নিঃসন্দেহে প্রমাণিত যে, যদি কোনো মুসলিম জীবনের শুরুতে অলসতা, উদাসীনতা কিংবা অন্য যে-কোনো কারণে নামাজ কাজা করে, আর পরবর্তী কালে এ ব্যাপারে বোধদয় হয় এবং তাওবা করার তাওফিক হয় তখন তার দায়িত্বে এ বিষয়টি জরুরি হবে যে,

[১৩] আল-মাওজুয়াতুল কুবরা : ৩৫৬।

[১৪] আল-ফাওয়ায়িদুল মাজমুআত, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৫৪-১১৫।

নিজের জীবনের ছুটে-যাওয়া নামাজগুলোর সঠিক হিসাব বের করে তা আদায়ে তৎপর হওয়া। ইমাম মালিক রহ. ইমাম আহমাদ রহ. এবং ইমাম শাফিয়ি রহ. এই তিন মনীষী এ বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন যে, যদি বিনা ওজরে (কোনো কারণ ছাড়াই) নামাজ কাজা হয়ে থাকে তখন স্মরণ হওয়া মাত্রই আবশ্যক হলো, তাৎক্ষণিক নামাজ আদায় করা। অবশ্য একান্ত প্রয়োজনীয় কাজগুলো করার সুযোগ রয়েছে। তবে হানাফি মাজহাবের ফকিহগণের অভিমত হলো, মানুষ যেহেতু নিজের সাধ্যের আওতাধীন কাজের ব্যাপারে আদিষ্ট, তাই কাজা নামাজ আদায়ে এতটুকু বিলম্ব করা জায়েজ, যতটুকু সময় মানুষের জীবিকা ও প্রয়োজন পূরণের জন্য যথেষ্ট। এটুকু পর্যন্ত ছাড় রয়েছে। এ ব্যাপারে দুররুল মুখতারে বর্ণিত হয়েছে—

> ويجوز تأخير الفوائت وإن وجبت على الفور لعذر السعي على العيال وفي الحوائج على الأصح.
>
> 'ছুটে-যাওয়া নামাজের কাজা আদায়ে বিলম্ব করা বৈধ আছে। যদিও ওয়াজিব হলো, তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করা। তবে হ্যাঁ, নিজের পরিবার-পরিজনের জীবিকা নির্বাহ ও অন্যান্য প্রয়োজন পূরণের তাগিদে বিলম্ব করার সুযোগ রয়েছে।[১৫]

এ ব্যাপারে শায়খ শামি রহ. লেখেন—

> فيسعي ويقضي ما قدر بعد فراغه، ثم وثم إلى أن تتم.
>
> 'তাই এমন ব্যক্তি কাজ করতে থাকবে এবং কাজের ফাঁকে যে পরিমাণ কাজা আদায় করতে সক্ষম হবে সে পরিমাণই কাজা নামাজ আদায় করতে থাকবে। এভাবেই কাজা নামাজ আদায় করে শেষ করবে। [১৬]

কোনো কোনো আলেম বিষয়টিকে আরও সহজ করার জন্য এ পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিদিন ফরজ নামাজ আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে সে সময়ের কাজা নামাজ আদায় করে নেবে। এভাবে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় হয়ে যাবে। মোটকথা, সময় পেলে আরও বেশি আদায় করতে হবে। তারা আরও বলেন—

> وفوره مع كل فرض فرض، إذ لم يجب في اليوم أداء أكثر من خمس، فكذا القضاء، فإن زاد أو جمع الخمس فحسن.

---

[১৫] দুররুল মুখতার, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৫৪৩।

[১৬] দুররুল মুখতার, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৫৪৩।

> ‘কাজা নামজ তাৎক্ষণিকভাবে আদায়ের পদ্ধতি হলো, প্রত্যেক ফরজের সঙ্গে একটি করে ফরজ পড়ে নেবে। কারণ, একদিনে পাঁচের অধিক নামাজ আদায় করা জরুরি নয়। সুতরাং কাজা নামাজকেও তার ওপর কিয়াস করে পাঁচের বেশি পড়া জরুরি না হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তারপরও যদি কেউ পাঁচ ওয়াক্তের বেশি আদায় করে কিংবা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ একইসঙ্গে আদায় করে নেয় তবে তা উত্তম হবে।[১৭]

অবশ্য কাজা নামাজ আদায়ের সময় নিয়তের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। অর্থাৎ, নির্দিষ্টভাবে কাজা নামাজের নিয়ত করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ ফজরের নামাজ কাজা আদায়ের সময় এভাবে নিয়ত করবে—আমার দায়িত্বে সর্বাগ্রে থাকা ফজরের যে নামাজটি রয়েছে, আমি সে নামাজটির কাজা আদায় করছি।

নামাজের ফিদয়া

পবিত্র কুরআনে রোজার ফিদয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি রোজা রাখতে একেবারেই সক্ষম নয় এবং ভবিষ্যতেও সক্ষম হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তার জন্য পবিত্র কুরআনের নির্দেশ হলো, প্রতি রোজার বিনিময়ে একজন মিসকিনকে খাবার খাওয়াতে হবে। তবে নামাজের ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহ-এর এমন কোনো বিধান উল্লেখ নেই। অবশ্য ইমাম মুহাম্মাদ রহ. বলেছেন, ‘যে ব্যক্তির নামাজ কাজা হয়েছে এবং তা আদায় করাও সম্ভব নয়, সে এভাবে অসিয়ত করবে—আমি যদি এই নামাজ আদায় করতে না পারি তাহলে তোমরা আমার রেখে-যাওয়া সম্পদ থেকে এই নামাজগুলোর ফিদয়া আদার করে দেবে।’

নামাজের ফিদয়া রোজার ফিদয়ার সমপরিমাণ অর্থাৎ, এক ওয়াক্ত নামাজের ফিদয়া একজন মিসকিনকে খাবার খাওয়ানো। (অথবা পৌনে দুই সের গম বা তার সমপরিমাণ মূল্য সদকা করা।) ইমাম মুহাম্মাদ রহ. উল্লিখিত হুকুমটি সতর্কতামুলক দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, যদিও নামাজের ফিদয়ার কথা কুরআন-সুন্নাহ-এর মাঝে উল্লেখ নেই, কিন্তু রোজার ওপর কিয়াস করে

---

[১৭] আল-বাহরুজ জুখার : আহমাদ ইবনু মুরতাজা : খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৫৪১।

এই হুকুম দেওয়া হয়েছে। তাই আশা করা যায়, এর মাধ্যমে দায়মুক্ত হওয়া যাবে ইনশা আল্লাহ।[১৮]

উল্লেখ্য, এই অসিয়ত মৃতব্যক্তির রেখে-যাওয়া সম্পদের এক তৃতীয়াংশের ক্ষেত্রে কার্যকর হবে। অর্থাৎ, যদি মৃত ব্যক্তির নামাজ বা রোজার ফিদয়া তার পুরো সম্পদের এক তৃতীয়াংশের কম বা সমান হয় তাহলে তার ওয়ারিসদের ওপর ওয়াজিব হবে মৃত ব্যক্তির ওই ফিদয়া আদায় করা। আর যদি ফিদয়ার পরিমাণ এক তৃতীয়াংশের চেয়ে বেশি হয় তাহলে বর্ধিত অংশ আদায় করা ওয়ারিসদের ওপর ওয়াজিব নয়।

এমনিভাবে যদি কেউ রোজা বা নামাজের ফিদয়ার অসিয়ত না করে মারা যায় তাহলে ওয়ারিসদের ওপর ফিদয়া আদায় করা জরুরি নয়। তবে যদি প্রাপ্তবয়স্ক ওয়ারিসগণ স্বেচ্ছায় নিজেদের সম্পদ থেকে ফিদয়া আদায় করে দেয় তাহলে সেটি তাদের জন্য উত্তম হবে ও ইহসান হবে। আশা করা যায়, মহান আল্লাহ এজন্য মৃত ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দেবেন এবং তাকে রহমতের ছায়ায় আশ্রয় দান করবেন।

সারকথা

মানুষের জীবনে যেসব নামাজ কাজা হয়ে যায়, সেগুলোর কাজা আদায় করা ওয়াজিব। শুধু তাওবা করার মাধ্যমে তা মাফ হবে না। তা যত বেশিই হোক না কেন। যদি সে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে, সুযোগমতো আরও বেশি আদায় করতে থাকে, সেইসঙ্গে এই অসিয়তও যদি করে যায় যে, যেসব নামাজ আমি আদায় করতে অক্ষম হবো, সেসব নামাজের ফিদয়া তোমরা আমার ত্যাজ্য সম্পদ থেকে আদায় করে দেবে। তাহলে আশা করা যায়, মহান আল্লাহ তার এই কাজ কবুল করে তাকে মাফ করে দেবেন। উমরি কাজা নামাজ আদায়ের সঠিক পদ্ধতি এটিই। আর 'উমরি কাজা জরুরি নয়, শুধু তাওবাই যথেষ্ট' এমন কথা বলা চরম দৃষ্টতা ও ভ্রষ্টতার শামিল। যে ব্যক্তি নামাজের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিধানের ক্ষেত্রে কেবল মনগড়া ও কল্পনাপ্রসূত অভিমত প্রদান করে এবং কোনো প্রকার দলিল-

[১৮] রদ্দুল মুখতার, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৫৪১।

প্রমাণের তোয়াক্কা করে না বরং, এমন ধৃষ্টতা ও ভ্রষ্টতা প্রদর্শন করে আপন অযৌক্তিক মতের ওপর অবিচল থাকে, তার ওপর আস্থা স্থাপন করা যায় না কোনোভাবেই।

—মুহাম্মাদ তকি উসমানি

দারুল ইফতা : দারুল উলুম করাচি,
১৩ রজব, ১৪২২ হি.

কারাগার, সেনানিবাস ও বিমানবন্দরে জুমার নামাজ

শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি

'জেলখানা, সেনানিবাস ও বিমানবন্দরে জুমার নামাজ' এ লেখাটি মূলত এক ব্যক্তির প্রশ্নের বিস্তারিত জবাব, এক ভাই কারাগারের বন্দীদের জুমার নামাজ আদায় সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। সে প্রশ্নের প্রতিউত্তরে শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি (হাফিজাহুল্লাহ) বিস্তারিত জবাব লিখেছেন। প্রাসঙ্গিকভাবে তিনি বিমানবন্দর ও সেনানিবাসে জুমার নামাজের বিষয়টিও উল্লেখ করেছেন।

—আবদুল্লাহ মায়মান

মাকতাবাতুল ইসলাম
মাকতাবাতুল ইসলাম

কারাগার, সেনানিবাস ও বিমানবন্দরে জুমার নামাজ

আমার ইয়েমেন সফরনামায় (যা মাসিক আল-বালাগ-১৪২২ হি. রবিউস সানি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়) দুবাই বিমানবন্দরে জুমার নামাজ আদায়ের বিষয়টি উল্লেখ করেছিলাম। সেখানে এ বিষয়টিও উল্লেখ করেছিলাম—জুমার নামাজ সহিহ হওয়ার জন্য ফকিহগণ (إذن عام) 'সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকারের যে শর্ত দিয়েছেন, তার সঠিক ব্যাখ্যা হলো, যে বড়ো এরিয়ায় জুমার নামাজ আদায় করা হচ্ছে, সেখানকার সবার জন্য জুমার নামাজ আদায়ের সাধারণ অনুমতি থাকতে হবে—সেই এরিয়ার ভেতর ও বাইরের জনসাধারণের নিরাপত্তা ও ব্যবস্থাপনা জনিত কারণে প্রবেশের সাধারণ অনুমতি না থাকলেও।

ইয়েমেন সফরনামাটি প্রকাশিত হওয়ার পর অনেকেই চিঠি দিয়ে অনুরোধ করেন, এ বিষয়টি যেন ব্যাখ্যাসহ বিস্তারিত প্রকাশ করি। ইতোপূর্বে এ বিষয়ে আমি একটি ফতোয়াও লিখেছিলাম। যা এখনো প্রকাশিত হয়নি। যেহেতু সে ফতোয়াটিকে যাচাই-বাছাই ও যোগ-বিয়োগ করে প্রকাশ করতে হবে তাই এখন কেবল এটি প্রকাশ করা হলো।

তবে স্মরণ রাখতে হবে যে, এ ফতোয়াটি শুধু ওই ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যেখানে বিমানবন্দরটি শহরের ভেতরে অবস্থিত হবে এবং তা এত বিশাল হবে যে, সেখানে সবসময় মানুষের উল্লেখযোগ্য অংশ অবস্থান করে। দুবাই বিমানবন্দরটি তেমন একটি বিমানবন্দর।

প্রশ্ন : কারাগারে কয়েদিদের জুমার নামাজ আদায়ের ব্যাপারে আলেমগণের অভিমত কী? কয়েদিরা সেখানে জুমার নামাজ পড়তে পারবে কি? এ ব্যাপারে পরস্পর-বিরোধী অভিমত পাওয়া যায়। তাই এ মাসআলাটি বিস্তারিত ব্যাখ্যার দাবি রাখে।

উত্তর : কারাগারে জুমার নামাজ জায়েজ-নাজায়েজের ব্যাপারে পূর্ববর্তী ফকিহগণের কিতাবে স্পষ্ট কোনো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ উল্লেখ নেই। সে জন্যই বর্তমান আলেমগণের মাঝে এ বিষয়ে মতভেদ দেখা যায়।

মতভেদের মূল কারণ হলো, হানাফি মাজহাবের ফকিহগণ জুমার নামাজ সহিহ হওয়ার শর্তাবলির মাঝে إذن عام অর্থাৎ, সর্ব সাধারণের প্রবেশের অনুমতি অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আর কারাগারে যেহেতু সর্বসাধারণের অনুমতি নেই; তাই বাহ্যত মনে হয়, কারাগারে জুমার নামাজ জায়েজ নেই। বর্তমানে এ বিষয়টি শুধু কারাগারের মাঝে সীমাবদ্ধ নয়; বরং সেনানিবাস, শিল্পাঞ্চল এবং বিমানবন্দরেও সম্প্রসারিত হয়েছে। যেখানে জনসাধারণের প্রবেশাধিকার নেই। সুতরাং এ বিষয়ে একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছা জরুরি যে, إذن عام অর্থাৎ, 'সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার' শর্তটি কোন পর্যায়ের? আর এর মূল উদ্দেশ্যই বা কী?

কোনো কোনো আলেমের অভিমত হলো, 'সর্বসাধারণের প্রবেশের অনুমতির শর্তটি ওই যুগের সঙ্গে সম্পৃক্ত; যে যুগে পুরো শহরে একটি মাত্র স্থানে জুমার নামাজ অনুষ্ঠিত হতো। এ দ্বারা উদ্দেশ্য ছিলো যেন কারও জুমার নামাজ ছুটে না যায়। কিন্তু যখন শহরের একাধিক স্থানে জুমার নামাজ পড়া বৈধ হিসেবে সাব্যস্ত হয় এবং বাস্তবেও একাধিক স্থানে জুমার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। সুতরাং এখন যেহেতু জুমার নামাজ ছুটে যাওয়ার সংশয়ও আর নেই, অতএব, 'সর্বসাধারণের অনুমতির বিষয়টি এখন আর অবশিষ্ট নেই। এসব আলেম শামি রহ.-এর এই উদ্ধৃতি বর্ণনা করেন—

وكذلك السلطان إذا أراد أن يصلي بحشمة في داره، فإن فتح بابه وأذن للناس إذنا عاما، جاز صلاته، شهدتها عامة أولا، وإن لم يفتح أبواب الدار وأغلق الأبواب وأجلس البوابين ليمنع عن الدخول، لم تجز، لأن إشتراط السلطان لتحرز تفويتها على الناس، وذا لا يحصل إلا بإذن العام. اه قلت : وينبغي أن يكون محل النزاع ما إذا

كانت لا تقام إلا في محل واحد، أما لو تعددت فلا، لأنه لا يتحقق التفويت، كأفاده التعليل، تأمل.

'বাদশাহ যদি নিজের কর্মচারীদের নিয়ে নিজ বাসভবনে নামাজ পড়তে চান, আর দরজা খুলে দিয়ে সেখানে সর্বসাধারণের প্রবেশের অনুমতি দিয়ে দেন, তাহলে বাদশাহ-এর নামাজ আদায় জায়েজ হবে—সাধারণ মানুষ সেখানে জুমার নামাজ আদায় করুক অথবা না করুক। আর যদি দরজা খুলে না দিয়ে বন্ধ করে রাখা হয় এবং দরজায় প্রহরী বসিয়ে রেখে সর্বসাধারণকে প্রবেশে বাধা দেওয়া হয়, তাহলে তার জুমার নামাজ জায়েজ হবে না। কেননা, (জুমার নামাজ সহিহ হওয়ার জন্য) বাদশাহ-এর উপস্থিতির শর্ত এজন্য করা হয়েছে যে, যেন সাধারণ মানুষ জুমার নামাজ আদায় করা বাদ না দেয়। আর এটি তখনই সম্ভব হবে যখন إذن عام অর্থাৎ, 'সর্বসাধারণের প্রবেশের অনুমতি' থাকবে। তবে এই শর্তটি ওই সময়ের জন্য যখন শহরের একটি মাত্র স্থানে জুমার নামাজ অনুষ্ঠিত হবে। আর যদি একাধিক স্থানে জুমার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়, তাহলে এই শর্ত প্রয়োগ হবে না। কারণ, তখন জুমার নামাজ ছুটে যাওয়ার আশংকা থাকে না।[১৯]

তবে এর ওপর প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, যদি إذن عام 'সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার'-এর অনুমতির শর্তারোপের কারণে শুধু নামাজ ছুটে যাওয়ার আশংকা হয়, তাহলে যে শহরের একাধিক স্থানে জুমার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়; সেখানে যদি কেউ নিজ বাড়িতে গেট বন্ধ করে জুমার নামাজের জামাত পড়ে নেয় তাহলে তাও জায়েজ হতে হবে। এছাড়া যখন থেকে একাধিক স্থানে জুমার নামাজ আদায়ের প্রচলন ঘটেছে ওই সময় থেকেই ফিকাহশাস্ত্রের কিতাবগুলো থেকে إذن عام 'সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার' শর্তটি তুলে দেওয়া উচিত। অথবা শর্তটি যদি উল্লেখ রাখতেই হয় তাহলে একই সঙ্গে এ বিষয়টিও উল্লেখ করতে হবে যে, বর্তমানে উল্লিখিত শর্তের ওপর আমল করা ওয়াজিব নয়। অথচ ফকিহগণ একাধিক স্থানে জুমার প্রচলন হওয়া সত্ত্বেও ওই শর্তটি তাদের কিতাবে উল্লেখ করে আসছেন।

---

[১৯] ফতোয়া শামি, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৫২।

এই প্রশ্নটি জটিল হওয়া সত্ত্বেও ফিকাহশাস্ত্রের কিতাবগুলোতে দৃষ্টি দিলে যা পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ—

'জাহিরুর রিয়ায়াতে إذن عام -এর শর্তটি উল্লেখ নেই। যেমন : শামি রহ. লেখেন—

وذكر فى النوادر شرطا آخر لم يذكره في ظاهر الرواية، وهو أداء الجمعة بطريق الاشتهار، حتى أن أميرا لو جمع جيشه فى الحصن وأغلق الأبواب وصلى بهم الجمعة لا تجز لهم.

'নাওয়াদির গ্রন্থে অন্য একটি শর্তের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যা জাহিরুর রিওয়ায়াত গ্রন্থে উল্লেখ নেই। আর তা হলো প্রকাশ্যে জুমার নামাজ আদায় করা। এমনকি বাদশাহ যদি তার সেনাবাহিনীকে এ নির্দেশ দেন—সবাই যেন দূর্গের ভেতরে সমবেত হয়, তারপর দূর্গের ফটক বন্ধ করে দিয়ে জুমার নামাজ আদায় করেন তাহলে তার জুমার নামাজ আদায় হবে না।[২০]

হেদায়া গ্রন্থকারও إذن عام অর্থাৎ, সর্বসাধারণের অনুমতির শর্তটি উল্লেখ করেননি। এমনিভাবে আরও অনেক ফকিহগণও এ শর্তটি উল্লেখ করেননি। যাদের মাঝে শামসুল আইম্মা সারাখসি রহ.-এর উস্তাদ ইমাম সুগদি রহ.-ও অন্তর্ভুক্ত।[২১]

দুই. নাওয়াদির গ্রন্থেও এই রেওয়ায়েত অনুযায়ী ফুকাহায়ে মুতাআখখিরিন এ শর্তটি নিজেদের কিতাবে উল্লেখ করেছেন। তবে ফকিহগণের মাঝে إذن عام-এর মর্মার্থে কিছুটা মতপার্থক্য রয়েছে। কোনো কোনো আলেম তো এর এই উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন যে, যার ওপর জুমা ফরজ হয়েছে তার অবশ্যই ওই স্থানে আসার অনুমতি থাকতে হবে। এ প্রসঙ্গে শামি রহ., বুরজুন্দিসহ অন্যান্য থেকে বর্ণনা করেন—

أي أن يأذن للناس إذنا عاما بأن لا يمنع أحدا ممن تصح منه الجمعة عن دخول الموضع الذي تصلي، وهذا مراد من فسر الإذن العام بالاشتهار.

---

[২০] বাদায়েয়ুস সানায়ে, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৭৯।

[২১] আন-নাতাফ ফিল ফাতাওয়া, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৯০।

'সব মানুষের জন্য সাধারণ প্রবেশাধিকার থাকতে হবে। যার ওপর জুমার নমাজ আদায় করা ওয়াজিব এমন কাউকে জুমার নামাজ আদায়ের স্থানে আসতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যাবে না। এটিই إذن عام এর প্রসিদ্ধ উদ্দেশ্য।[২২]

অপরদিকে কিছু ফকিহের আলোচনা দ্বারা এমনটি বোঝা যায়, إذن عام অর্থাৎ, সর্বসাধারণের অনুমতির জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, যে আবাসিক এলাকায় জুমা পড়া হচ্ছে, ওই আবাসিক এলাকার লোকদের সেখানে আসার পূর্ণ অনুমতি থাকতে হবে। বাইরের লোকদের আসার অনুমতি না থাকলে কোনো সমস্যা নেই। যেমন : বাহরুল উলুম রহ. লেখেন—

وفي فتح القدير : إن أغلق باب المدينة لم يجوز، وفيه تأمل، فإنه لا ينافي الإذن العام لمن فى البلد، وأما من في خارج البلد فالظاهر أنهم لا يجيبون لإقامة الجمعة، بل ربما يجيبون للشر والفساد.

'ফাতহুল কাদির গ্রন্থে এসেছে, যদি শহরের ফটক বন্ধ করে দেওয়া হয় তাহলে জুমার নামাজ জায়েজ হবে না। এতে অবশ্যই চিন্তা করার আছে। কেননা, তা দ্বারা শহরে বসবাসরত লোকদের প্রবেশদ্বারে সাধারণ অনুমতিতে কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই। উল্লেখ্য, যারা বাহ্যত শহরের বাইরে অবস্থান করছে তারা এখানে জুমা পড়তে আসবে না। বরং কখনো তারা এলে ফিতনা-ফাসাদ করার জন্য আসবে।[২৩]

দুররুল মুখতারে এ বিষয়ে বলা হয়েছে—

فلا يضر على باب القلعة لعدو أو لعادة قديمة، لأن الإذن العام مقدر لأهله، وغلقه لمنع العدو لا المصلي، نعم لو لم يغلق لكان أحسن، كما في مجمع الأنهر.

'দূর্গের ফটক বন্ধ করলে কোনো ক্ষতি নেই। কারণ, তা হয়তো দুশমনের ভয়ে কিংবা পূর্বেকার নিয়মকানুনের কারণেও হতে পারে। কেননা, إذن عام অর্থাৎ, সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকারের অনুমতির ব্যাপারটি নিজ গোত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর ফটক বন্ধ করাটা শত্রুর

[২২] ফতোয়া শামি, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৫৯।
[২৩] রাসায়িলুল আরকান : ১১৫।

প্রতিবন্ধকতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যারা নামাজ আদায়ের জন্য আসবে তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। হ্যাঁ, তবে যদি বন্ধ না করা হতো তাহলে অনেক উত্তম হতো। যেমনটি 'মাজমাউল আনহার' গ্রন্থে এসেছে।[২৪]

মাজমাউল আনহার গ্রন্থে বলা হয়েছে—

وما يقع في بعض القلاع من غلق أبوابه خوفا من الأعداء، أو كانت له عاده قديمة عند حضور الوقت فلا بأس به،لأن الإذن العام مقدر لأهله، ولكن لو لم يكن لكان أحسن.

كما شرح عيون المذهب..... وفي البحر والمنع خلافه، لكن ما قدرناه أولى، لأن الإذن العام يحصل بفتح باب الجامع وعدم المنع، ولا مدخل في باب القلعة وفتحه، ولأن غلق بابها لمنع العدو، لا لمنع لغيره تدبر.

শত্রুর ভয়ে নামাজের আগে দূর্গের ফটক বন্ধ করে রাখা হতো অথবা পূর্বেকার রীতিনীতির কারণে। সুতরাং তাতে কোনো সমস্যা নেই। কারণ, إذن عام অর্থাৎ, 'সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার' নিজ গোত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তবে তা যদি না করা হতো তাহলে অনেক উত্তম হতো। এই অভিমতটি 'উয়ুনুল মাজাহির'-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে 'বাহর' এবং 'মানাহ' গ্রন্থে এর বিপরীত উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু আমরা যে বিষয়টি বলেছি সেটিই উত্তম। কারণ, إذن عام অর্থাৎ, 'সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার' মসজিদের দরজা খোলা এবং প্রবেশ দানে বাধা না দেওয়ার দ্বারাই অর্জিত হয়। আর দূর্গের ফটক বন্ধ ও খোলা ছাড়া গত্যন্তর নেই। কারণ, দূর্গের ফটক বন্ধ করা মূলত শত্রুকে প্রতিরোধের জন্য, কোনো মুসল্লিকে আটকানোর উদ্দেশ্যে নয়। কাজেই এখানে চিন্তার খোরাক রয়েছে।[২৫]

এখানে এমনটি মনে হয় যে, যেসব ফকিহ إذن عام অর্থাৎ, 'সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার'-এর যে শর্তটি জুমার নামাজ ছুটে যাওয়ার আশংকার ওপর ভিত্তি করে সাব্যস্ত করেছেন তার উদ্দেশ্য এই যে, إذن عام অর্থাৎ, 'সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার'-এর বিষয়টি সাধারণ ও ব্যাপক মর্মার্থের

[২৪] দুররুল মুখতার, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৫২।

[২৫] মাজমাউল আনহার, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৪৬।

প্রেক্ষিতে এমন এক কারণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, যা শহরের একাধিক স্থানে জুমার নামাজ আদায়ের ব্যবস্থা হওয়ার ফলে আর অবশিষ্ট থাকেনি। কিন্তু দ্বিতীয় মর্মার্থটি এখনো অবশিষ্ট রয়েছে। কারণ, দ্বিতীয় মর্মার্থটির ভিত্তি ওই কারণের ওপর ছিলো না। বরং 'বাদায়েউস সানায়ে'র গ্রন্থকারের ভাষ্য অনুযায়ী إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة 'জুমার দিন যখন নামাজের জন্য ডাকা হবে.... এর ইঙ্গিতের ওপর ভিত্তি করে ছিলো। যেমনটি শুরুম্বুলালি রহ. উল্লেখ করেছেন—

قلت اطلعت على رسالة العلامة بن الشحنة وقد قال فيها بعدم صحة الجمعة في قلعة القاهرة لأنها تقفل وقت صلاة الجمعة وليست مصرا على حدتها. وأقول فى المنع نظر ظاهر لأن وجه القول بعدم صحة صلاة الإمام بقفله قصره اختصاصه بها دون العامة والعلة مفقودة في هذه القضية فإن القلعة وإن قفلت لم يختص الحاكم فيها بالجمعة لأن عند باب القلعة عدة جوامع في كل منها خطبة لا يفوت من منع من دخول القلعة الجمعة بل لو بقيت القلعة مفتوحة لا يرغب في طلوعها للجمعة لوجودها فيما هو أسهل من التكلف بالصعود لها وفي كل محلة من المصر عدة من الخطب فلا وجه لمنع صحة الجمعة بالقلعة عند قفلها.

যদিও তাহতাবি রহ.-এই ভাষ্যে আল্লাম শুরুম্বুলালি রহ.-এর ওপর প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। তবে শুরুম্বুলালি রহ.-এর উদ্দেশ্য দৃশ্যত এমন মনে হয়েছে যে, একাধিক স্থানে জুমার নামাজ আদায়ের ক্ষেত্রে إذن عام অর্থাৎ, 'সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার'-এর অনুমতির উল্লিখিত ব্যাপক অর্থ নেওয়ার প্রয়োজন নেই যার আলোকে যাদের ওপর জুমার নামাজ ওয়াজিব তাদের সেখানে আসার অনুমতি থাকবে। বরং যদি এমন জনবসতি হয়, যেখানে ওই এলাকার অধিবাসীদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যার উপস্থিতি রয়েছে এবং ওই জনবসতির সব লোকের সেখানে জুমা আদায়ের অনুমতি থাকে তা হলে এতটুকু অনুমতিই إذن عام অর্থাৎ, 'সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার'-এর অনুমতির জন্য যথেষ্ট হবে। তবে শর্ত হলো, ওই জনবসতির বাইরের লোকদের ভেতরে প্রবেশের অনুমতি না দেওয়াটা নামাজে বাধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে যেন না হয়। বরং ওই নিষেধাজ্ঞা

হবে শুধুই নিরাপত্তাজনিত কারণে কিংবা শৃঙ্খলা রক্ষার লক্ষ্যে।

যদি শুরুম্বুলালি রহ.-এর উপর্যুক্ত ভাষ্যের উদ্দেশ্য এমনটি নেওয়া হয়, তাহলে তাহতাবি রহ. যে প্রশ্ন করেছিলেন তার আর কোনো কার্যকারিতা থাকে না।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, একাধিক স্থানে জুমা আদায়ের অবস্থায় إذن عام অর্থাৎ, 'সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার'-এর শর্তটি হানাফি ফকিহগণের কাছে একদম শেষ হয়ে যায়নি। বরং তার উদ্দেশ্য হলো, যে জনবসতিতে (কোনো একক ব্যক্তির বাড়ি নয়) জুমার নামাজ আদায় করা হয় ওই জনবসতির অধিবাসীদের সেখানে প্রবেশের অনুমতি থাকতে হবে। ওই জনবসতি ছাড়া বাইরের লোকদের জন্য যদি এ কারণে নিষেধাজ্ঞা থাকে যে, তারা এখানে এলে শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তায় বিঘ্ন সৃষ্টি হবে। তাই তাদের আসতে দেওয়া হচ্ছে না। তাহলে এই নিষেধাজ্ঞা إذن عام অর্থাৎ, 'সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার'-এর পরিপন্থি বলে গণ্য হবে না। তবে অবশ্যই এই নিষেধাজ্ঞা নামাজ থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে হতে পারবে না। বরং তা শুধুই নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা রক্ষার উদ্দেশ্যেই হতে হবে। আবার এমন হতে পারবে না যে, বাইরের লোকদের নিষেধাজ্ঞার কারণে স্থানীয় অধিবাসীদের জুমার নামাজ থেকে বঞ্চিত হতে হয়।

এরপর আরও একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে, ফকিহগণ একটি মাসআলা উল্লেখ করেছেন। যেখানে বলা হয়েছে কয়েদিদের জন্য জুমার দিন পৃথকভাবে জোহরের জামাত করা মাকরুহ।[২৬]

এ থেকে বোঝা যায়, কয়েদিদের জুমার নামাজ জায়েজ নেই। অন্যথায় তাদের তো জোহরের নামাজ জামাতে পড়ার প্রশ্নই আসতো না। তবে এই প্রশ্নের জবাবে বলা যেতে পারে যে, শামি রহ. ও শুরুম্বুলালি রহ.-এর ভাষ্যের প্রেক্ষিতে বোঝা যায়, এই হুকুমটি ওই সময়ের, যখন শহরে বাদশাহ-এর নেতৃত্বে একই স্থানে জুমার নামাজ আদায় করা হতো এবং বাদশাহ-এর পক্ষ থেকে অন্য কোনো স্থানে জুমার নামাজ আদায় করা নিষিদ্ধ ছিলো। তাছাড়া কারাগারের অবস্থাও বিভিন্ন প্রকারের হতো। হতে

[২৬] ফাতহুল কাদির, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৫।

পারে এর দ্বারা ওই কারাগার উদ্দেশ্য যা একটি ঘর বা একটি সীমিত পরিসরের মাঝে সীমাবদ্ধ। যাকে স্বতন্ত্র জনবসতি বলা সম্ভবই নয়। এখানে আরও একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে। যা 'বাদায়েউস সানায়ে' গ্রন্থে লেখা হয়েছে—

السلطان إذا صلى في فهندة والقوم مع أمراء السلطان فى المسجد الجامع : إن فتح باب داره وأذن للعامة بالدخول في فهندة جاز، وتكون الصلاة في موضعين ولو لم يأذن للعامة وصلي مع جيشه لا تجوز صلاة السلطان، وجوز صلاة للعامة.

উল্লিখিত মাসআলাটি একাধিক স্থানে জুমা আদায়ের অবস্থাতেই স্বীকৃত। তা স্বত্ত্বেও বাদশাহ-এর পক্ষ থেকে إذن عام অর্থাৎ, 'সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার' না দেওয়ার অবস্থায় জুমার নামাজকে অনানুষ্ঠিত সাব্যস্ত করা হয়েছে। তবে বাহ্যত এখানে উদ্দেশ্য হলো, বাদশাহ নিজ-মহলে কেবল সৈন্য-সামন্ত, নিরাপত্তাকর্মী ও কর্মচারীদের নিয়ে নামাজ পড়ে নেবেন, অন্যদের সেখানে প্রবেশের অনুমতি থাকবে না। যেমন : উল্লিখিত إن فتح باب داره الخ... ভাষ্য থেকে আঁচ করা যায়। সুতরাং এখানে নিষেধাজ্ঞার কারণ হলো, বাদশাহ-এর মহল তার নিজস্ব বাসস্থান। আর ইতোপূর্বে বলা হয়েছে যে, ব্যক্তিগত স্থানে ততক্ষণ পর্যন্ত জুমা বৈধ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তিগত স্থানটি সাধারণ মানুষের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া না হবে। তবে যদি এমন কোনো এলাকা হয় যেখানে অনেক মানুষ বসবাস করে, তেমন এলাকাকে এসব ছোটোখাটো বিষয়ের ওপর তুলনা করা হবে না।

সারকথা

এক.বাদশাহ-এর পক্ষ থেকে যদি কোনো এক স্থানে জুমার নামাজ পড়ার অনুমতি থাকে, তখন শুদ্ধ হওয়ার জন্য জরুরি হলো, যাদের ওপর জুমার নামাজ ফরজ তাদের সবার এখানে এসে জুমার নামাজ পড়ার সাধারণ অনুমতি থাকা। এমন সাধারণ অনুমতি ছাড়া জুমার নামাজ শুদ্ধ হবে না।

দুই. এমনিভাবে কারও ব্যক্তিগত বাড়ি, মহল কিংবা দোকানে ততক্ষণ পর্যন্ত জুমার নামাজ আদায় করা জায়েজ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সেখানে সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার না থাকবে। তা শহর কিংবা যে-কোনো স্থানই হোক।

তিন. যদি কোনো জনবসতি এমন হয়, যেখানে অনেক লোকের বসবাস এবং তা শহরের ভেতরেই অবস্থিত থাকে তবে নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য অন্য কাউকে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া না হয়, বরং উল্লিখিত কারণে সেখানে প্রবেশের কিছু নিয়ম-কানুন বেঁধে দেওয়া হয়; তাহলে ওই জনবসতির এমন একটি স্থানে জুমার নামাজ আদায় করা জায়েজ, যেখানে সবার প্রবেশের অনুমতি থাকে না। যেমন : বড়ো জেলখানা, সেনানিবাস, শিল্প-কারখানা অথবা এমন বড়ো বিমানবন্দর যা শহরে অবস্থিত এবং সবসময় সেখানে অনেক মানুষ অবস্থান করে। তবে তাতে প্রবেশের জন্য রয়েছে বিশেষ কিছু নিয়ম-কানুন, তাহলে এমন সব স্থানেই জুমার নামাজ জায়েজ। তবে শর্ত হলো, এ জাতীয় স্থানগুলো শহরে অবস্থিত হতে হবে এবং সব কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জুমার নামাজের স্থানে উপস্থিত হয়ে নামাজ আদায়ের অনুমতি থাকতে হবে। মহান আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

নারীর হিজাব ও তার সীমারেখা

শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি

'নারীর হিজাব ও তার সীমারেখা'—এ লেখাটি মূলত تكملة فتح الملهم। 'ফাতহুল মুলহিমের সম্পূরক গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি (হাফিজাহুল্লাহ) حجاب المرأة وحدوده অর্থাৎ, 'নারীর হিজাব ও তার সীমারেখা' শিরোনামে উল্লেখ করেছেন। সর্বসাধারণের উপকারার্থে আমি এর উর্দু তরজমা পেশ করি।

—আবদুল্লাহ মায়মান

মাকতাবাতুল ইসলাম মাকতাবাতুল ইসলাম

নারীর হিজাব ও তার সীমারেখা

বর্তমান যুগে নারীদের পর্দার বিধান অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। যা নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্কও হচ্ছে। তাই এ বিষয়টির নিগূঢ় তত্ত্ব এবং এ ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কী—এ লেখায় তা তুলে ধরা হবে।

বর্তমান সময়ে নারীদের হিজাব-পর্দা-বেপর্দা নিয়ে প্রচুর লেখালেখি হয়েছে। এ বিষয়ে সবচেয়ে সুন্দর গ্রন্থ পিতাজি, মুফতি মুহাম্মাদ শফি রহ.-এর تفصيل الكتاب في تفسير آيات الحجاب। যা আহকামুল কুরআনের তৃতীয় খণ্ডের অংশ হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থে সম্মানিত পিতা এ বিষয়ে সব আয়াত ও হাদিস একত্র করেছেন। পর্দার সীমারেখা ও প্রকৃতির ব্যাপারে ফকিহগণের মাজহাব ও মুফাসসিরগণের অভিমতও তুলে ধরেছেন।

শরয়ি পর্দার তিন স্তর

উল্লিখিত গ্রন্থে বিশদ আলোচনার পর যে ফলাফল বের হয়েছে তার সারকথা নিম্নরূপ—

শরয়ি পর্দার বিষয়ে কুরআন-হাদিস যে নির্দেশনা দিয়েছে তার মোট স্তর তিনটি।—

১. উত্তম স্তর;

২. মধ্যম স্তর;

৩. নিম্নস্তর।

প্রতিটি স্তরই অপরটি থেকে তুলনামুলক উত্তম ও শ্রেষ্ঠ এবং প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য। এসব স্তরই কুরআন-হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। এ থেকে কোনো একটিও রহিত হয়নি। তবে হ্যাঁ, বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে নারীদের ওপর এই স্তরগুলোর নির্দেশ প্রয়োগ হয়। স্তর তিনটির বিবরণ নিচে তুলে ধরা হলো—

প্রথম স্তর : নিজের বাড়ি কিংবা অন্য যে-কোনো স্থানে নারীরা এমনভাবে অবস্থান করবে যে, নিজের ব্যক্তিসত্তা, পোষাক-আষাক, নিজের বাহ্যিক-গোপন সৌন্দর্যের কোনো অংশ, তার শরীরের কোনো অংশ এমনকি তার চেহারা, হাত ইত্যাদি কোনো কিছুই যেন অপরিচিত পুরুষের দৃষ্টিগোচর না হয়।

দ্বিতীয় স্তর : নারীরা বোরকা, ওড়না ইত্যাদির মাধ্যমে এমনভাবে পর্দা করবে যেন চেহারা, হাত ও দেহের কোনো অংশ এমনকি সৌন্দর্যের পোষাক-আষাক অপরিচিত কোনো পুরুষের দৃষ্টিগোচর না হয়। বরং নারীর পুরো শরীর অর্থাৎ, মাথা থেকে পা পর্যন্ত আবৃত থাকবে।

তৃতীয় স্তর : নারীরা বোরকা, ওড়না ইত্যাদি দ্বারা এতটুকু পর্দা করবে যেন তার চেহারা, হাত ও পা শুধু খোলা থাকে।

পর্দার প্রথম স্তরটিই মুখ্য : শরিয়তের দলিল

নারীদের পর্দার ক্ষেত্রে প্রথম স্তরটিই মুখ্য এবং এটি মৌলিক স্তর। প্রথম স্তরের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, নারীরা ঘরে অবস্থান করবে। প্রয়োজন ছাড়া ঘরের বাইরে যাবে না। (প্রয়োজনের সংজ্ঞা উল্লেখ করা হবে ইনশাআল্লাহ) পর্দার প্রথম স্তরের পক্ষে পবিত্র কুরআনের এ আয়াতটি তুলে ধরা হয়—

﴿وقرن في بيوتكن﴾

'তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান করো।'

মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণের উদ্দেশ্যে এ আয়াতটি নাজিল

হলেও এটি স্পষ্ট যে, এ নির্দেশ নবিজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের ক্ষেত্রেই কেবল প্রযোজ্য নয়। কারণ, আগের-পরের আয়াতগুলোর প্রতি দৃষ্টি দিলেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মহানবির স্ত্রীগণের জন্যই শুধু নির্দেশটি নির্দিষ্ট নয়। এ অভিমতটি আলেমগণের সর্বসম্মত অভিমত। মহান আল্লাহ অন্যস্থানে বলেন—

﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾

'নবি-পত্নীগণের কাছে তোমাদের কিছু চাওয়ার প্রয়োজন হলে পর্দার আড়াল থেকে চেয়ে নেবে।'

অর্থাৎ, তোমরা যখন নবির পত্নীগণের কাছে কোনো কিছু চাইবে তখন পর্দার আড়াল থেকে চেয়ে নাও। এ আয়াতটি জয়নাব রা.-এর ওলিমার সময় নাজিল হয়েছে। ওই সময়ই তাঁর ও অন্য পুরুষদের মাঝে পর্দার বিধান কার্যকর করা হয়। বর্ণিত হাদিসগুলোকেও আয়াতের স্বপক্ষে প্রমাণ হিসেবে পাওয়া যায়—

এক.

عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، أخرجه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح غريب.

'আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নারীজাতি গুপ্তধন। তারা প্রকাশ্যে বের হলে শয়তান উঁকিঝুঁকি দিতে থাকে।

ইবনু খুজাইমা এবং ইবনু হিব্বান রহ. এ হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। তাদের কিতাবে অতিরিক্ত এ কথাও উল্লেখ করেছেন—

وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها.

'নারীজাতি যতক্ষণ ঘরে থাকে ততক্ষণ আল্লাহর সান্নিধ্যে থাকে।'

দুই.

عن جابر رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان.

'জাবির রা. থেকে বর্ণিত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বলেছেন, নারী শয়তানের আকৃতিতে প্রকাশ্যে আসে আর শয়তানের আকৃতিতে প্রত্যাবর্তন করে।[২৭]

তিন.

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : خرجت سودة رضي الله تعالى عنها بعد ما ضرب عليها الحجاب لتقضي حاجتها وكانت امرأة جسيمة تفرع النساء جسما لا تخفي على من يعرفها، فرأها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : يا سودة! والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين، قالت فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وإنه ليتعشى وفي يده عرق فدخلت فقالت : يا رسول الله! إني خرجت فقال لي عمر كذا وكذا قالت : فأوحى ثم رفع عنه وأن العرق في يده ما وضعه فقال : إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن.

‘আয়শা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পর সাওদা রা. প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য ঘর থেকে বের হলেন। সাওদা রা. যেহেতু একটু মোটা ছিলেন এবং অন্যান্য নবি-পত্নীগণ থেকে দীর্ঘদেহী ছিলেন। তাই পূর্ব পরিচিতজনদের দৃষ্টি তিনি এড়িয়ে যেতে পারতেন না। সুতরাং একবার তিনি যখন বের হলেন, তখন উমর ইবনু খাত্তাব রা. তাকে দেখে বললেন, হে সাওদা! আল্লাহর শপথ! আপনি আমার দৃষ্টির আড়াল হতে পারবেন না। অতএব, আপনি চিন্তা করুন, আপনি কীভাবে বের হবেন। আয়শা রা. বলেন, সাওদা রা. উমর রা.-এর এ কথা শুনে ফিরে আসেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সময় আমার ঘরে ছিলেন এবং সন্ধ্যার খাবার খাচ্ছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে গোশতসহ একটি হাড় ছিলো। এ সময় সাওদা রা. ঘরে প্রবেশ করে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমি ঘর থেকে বের হলে উমর রা. আমার উদ্দেশ্যে এ কথা বলেছেন। আয়শা রা. বলেন, এ অবস্থায়ই আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহি অবতীর্ণ হওয়া শুরু হয়। এক পর্যায়ে ওহি অবতীর্ণ হওয়া শেষ হয়। আর গোশতসহ হাড়টি তখনো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে ছিলো এবং তিনি তা ফেলেননি। এরপর রাসুল

---

[২৭] মুসলিম, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১২৯।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'হে নারীজাতি! প্রয়োজনের জন্য তোমাদের ঘর থেকে বের হওয়ার অনুমতি রয়েছে।[২৮]

হাদিসের এ বাক্যটি قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتك 'তোমাদের প্রয়োজনে বাইরে যাওয়ার অনুমতি রয়েছে।' এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নারীদের ঘর থেকে বের হওয়ার অনুমতি 'প্রয়োজন'-এর সঙ্গে সীমাবদ্ধ। প্রয়োজন না হলে নারী ঘরেই অবস্থান করবে।

চার.

عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله عليه وسلم قال : صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها.

'আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নারীদের নিজের ঘরের ভেতরের অংশে নামাজ পড়া ঘরের ভেতরে নামাজ পড়া থেকে উত্তম। আর ঘরের ভেতরে নামাজ পড়া ঘরের আঙিনায় নামাজ পড়া থেকে উত্তম।[২৯]

পাঁচ.

عن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي أنها جائت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله !إني احب الصلاة معك، قال : علمت أنك تحبين الصلاة معي؟ وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي، قال : فأمرت فبني لها مسجد في أقصي شيئ من بيتها وأظلم فكانت تصلي حتى لقيت الله عز وجل.

'উম্মে হুমাইদ সায়িদি রা. থেকে বর্ণিত। তিনি মহানবি সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে আবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমি আপনার সঙ্গে (জামাতে) নামাজ পড়তে

---

[২৮] মুসলিম : ৫৭৯৬।

[২৯] কানজুল উম্মাল, খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ২৫৯। আত-তারগিব, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৩৫।

চাই। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি জানি, তুমি আমার সঙ্গে (জামাতে) নামাজ পড়তে অধিক আগ্রহী। কিন্তু তোমার ঘরের ভেতরের অংশে নামাজ আদায় করা ওই নামাজ থেকে উত্তম যা তোমার ঘরের ভেতরে আদায় করা হয়। আর ঘরের ভেতরের নামাজ ঘরের আঙিনায় নামাজ পড়া থেকে উত্তম। আর তোমার ঘরের আঙিনার নামাজ তোমার গোত্রের মসজিদে নামাজ আদায় করা থেকে উত্তম। আর তোমার গোত্রের মসজিদে নামাজ আদায় করা আমার মসজিদে (মসজিদে নববিতে) আদায় করা থেকে উত্তম। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ কথা শুনে উম্মে হুমাইদ সায়িদি রা. নিজের ঘরের ভেতরের অন্ধকার অংশে নামাজের স্থান নির্ধারণ করে নেন এবং আমৃত্যু তিনি সেখানেই নামাজ আদায় করেন।[৩০]

ছয়.

عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه مرفوعا : ليس للنساء نصيب فى الخروج إلا مضطرة.

'আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নারীদের ঘর থেকে বের হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। তবে একান্তই যদি কোনো প্রয়োজন হয়।[৩১]

উপরে বর্ণিত হাদিসসমুহের মাধ্যমে এ কথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, নারীদের ক্ষেত্রে মূল ও প্রকৃত নির্দেশ হলো, নারীরা ঘরে থাকাবস্থায় পর্দা করবে এবং নিজের সত্তাকে অপরিচিত পুরুষ থেকে গোপন রাখবে। প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের হবে না।

পর্দার দ্বিতীয় স্তর : শরিয়তের দলিল

অনেক সময় নারীদের ব্যক্তিগত মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্যই বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন হয়। ওই সময় শর্ত-সাপেক্ষে নারীদের বাইরে যাওয়ার অনুমতি

[৩০] মুসনাদে আহমাদ-৬পৃষ্ঠা : ৩৭১, নাইলুল আওতার, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১৬১, আত-তারগিব, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৩৫।

[৩১] কানজুল উম্মাল-৮পৃষ্ঠা : ২৬৩।

রয়েছে। বোরকা বা চাদর দিয়ে নিজেকে এমনভাবে আবৃত করে বের হবে যেন দেহের কোনো অংশই দেখা না যায়। এটিই পর্দার দ্বিতীয় স্তর।

পর্দার দ্বিতীয় এই স্তরটিও কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। পবিত্র কুরআনে 'মহান আল্লাহ বলেন—

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾

'হে নবি! আপনি আপনার পত্নীদের, আপনার কন্যাদের ও মুসলিম নারীদের বলে দিন, তারা যেন তাদের চাদর নিজেদের ওপর টেনে নেয়।'[৩২]

এ থেকে বাহ্যিকভাবে বোঝা যায়, নারীরা নিজের চাদর দ্বারা পুরো শরীর এমনকি চেহারা পর্যন্ত আবৃত করে নেবে। আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা.-এর বর্ণনা অনুযায়ী (جلباب) জিলবাব হলো ওই ওড়না যা দ্বারা দেহের ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত আবৃত করা যায়।

ইমাম ইবনু হাজম রহ. তার কিতাব (المحلي) 'আল-মুহাল্লা'য় বলেছেন—

والجلباب في لغة العرب التي خاطبها بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما غطي جميع الجسم لا بعضه.

'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে جلباب অর্থাৎ, ওড়না সম্পর্কে বলেছেন, আরবি অভিধানে তার অর্থ হলো, এমন ওড়না যা পুরো শরীর আবৃত করে নেয়, আংশিক দেহ নয়।

ইবনু জারির ও ইবনু মুনজির রহ.-সহ অন্যরা ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু সিরিন রহ. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি উবাইদা আসলামি রহ.-এর কাছে এ আয়াত—يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলাম। তখন তিনি তার চাদর দ্বারা নিজেকে এমনভাবে আবৃত করলেন যে, তার পুরো শরীর এমনকি মাথা, চেহারা, ও চোখের পলক পর্যন্ত তিনি ঢেকে নিলেন। শুধু বাম চোখ বাম পাশ দিয়ে বের করে রাখলেন।[৩৩]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু জারির তবারি রহ. আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা.-

[৩২] সুরা আহজাব, আয়াত : ৫৯।

[৩৩] রুহুল মাআনি, খণ্ড : ২২, পৃষ্ঠা : ৮৯।

এর সূত্রে বর্ণনা করেন, মহান আল্লাহ মুমিন নারীদের এই নির্দেশ দিয়েছেন, যখন সে কোনো প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হবে, তখন চাদর দ্বারা নিজের চেহারা ওপর থেকে আবৃত করে নেবে। তবে শুধু একটি চোখ খোলা রাখবে।[৩৪]

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. ও কাতাদা রা. থেকে এ কথাও বর্ণিত আছে যে, নারীরা নিজের কপালে চাদর মুড়িয়ে বেঁধে নেবে। এরপর দুচোখ খোলা রেখে নাকে মুড়িয়ে নেবে । অবশ্য পুরো বুক ও নিজের চেহারার অধিকাংশ অংশ ঢেকে নেবে।[৩৫]

মোটকথা উল্লিখিত আয়াত থেকে এ বিষয়টি স্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান হয় যে, নারীরা যখন কোনো প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হবে তখন তার জন্য শরিয়তের নির্দেশ হলো, তারা তাদের চেহারা আবৃত করে বের হবে। এমনিভাবে নিচের আয়াতটিও এ কথার প্রতি নির্দেশ করছে—

﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ﴾

‘বৃদ্ধা নারী, যাদের আর বিয়ের আশা নেই, তাদের জন্য কোনো দোষ নেই, যদি তারা তাদের (শরীর থেকে অতিরিক্ত) কাপড় খুলে রাখে।[৩৬]

উল্লিখিত আয়াতে মহান আল্লাহ বৃদ্ধা নারীদের অতিরিক্ত কাপড় খুলে রাখার অনুমতি দিয়েছেন। উল্লেখ্য যে, وضع ثياب অর্থাৎ, ‘কাপড় খোলা’-এর দ্বারা দেহের পুরো কাপড় খুলে ফেলা উদ্দেশ্য নয়। বরং ‘কাপড় খোলা’র দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, وضع جلباب অর্থাৎ, চাদর খুলে রাখা কিংবা দেহের উপরিভাগের ওই কাপড় খুলে রাখা যা খোলার দ্বারা সতর খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই।

এমনিভাবে আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. এ আয়াতে (ثِيَاب) ‘কাপড়’ শব্দের ব্যাখ্যা (جِلْبَاب) ওড়না কিংবা (رداء) চাদর দ্বারা করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা., আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা., মুজাহিদ রহ., সাইদ ইবনু জুবায়ের রহ., আবুশ শাসা রহ., ইবরাহিম নাখায়ি রহ., হাসান রহ., কাতাদাহ রহ., ইমাম জুহরি রহ. এবং ইমাম আওজায়ি রহ.-সহ আরও অনেকেই (ثِيَاب)

---

[৩৪] তাফসিরে ইবনু জারির, খণ্ড : ২২, পৃষ্ঠা : ৪৬।

[৩৫] রুহুল মাআনি, খণ্ড : ২২, পৃষ্ঠা : ৮৯।

[৩৬] সুরা নুর, আয়াত : ৬০।

'কাপড়' শব্দের এ ব্যাখ্যাই করেছেন। সুতরাং এ আয়াতে (ثیاب) কাপড় খুলে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যার চূড়ান্ত ফলাফল হলো, (کشف الوجه) 'চেহারা খুলে রাখার অনুমতি। আর এ নির্দেশ শুধু ওই বৃদ্ধা নারীর জন্য প্রযোজ্য, যার ভবিষ্যতে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার কোনো আগ্রহ নেই। কিন্তু যুবতী নারীদের জন্য এই বিধান প্রযোজ্য নয়। তাদের জন্য অপরিচিত পুরুষের সামনে جلباب অর্থাৎ, ওড়না খোলাও জায়েজ নেই।

নারী সাহাবি ও পর্দা

উপরে বর্ণিত হাদিসসমূহ থেকে এ কথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, নারী সাহাবিগণও যখন কোনো প্রয়োজনে বাইরে বের হতেন তখন চাদর দ্বারা পূর্ণ শরীর ঢেকে বের হতেন। অপরিচিত লোকদের সামনে নিজের চেহারা প্রকাশ করতেন না। নিচের হাদিসগুলো দ্বারা সেটিই স্পষ্ট প্রমাণিত।

এক.

عن قيس بن شماس رضي الله عنه قال : جائت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم، يقال لها أم خلاد، وهي منتقبة تسئل عن ابنها وهو مقتول، فقال لها بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : جئت تسئلين عن ابنك وأنت منتقبة؟ فقالت : إن أرزأ ابني فلن أرزأ حيائي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : له أجر شهيدين، فقالت : ولم ذاك يا رسول الله؟ لأنه قتله أهل الكتاب.

'কায়েস ইবনু শাম্মাস রা. বর্ণনা করেন। উম্মে খাল্লাদ নামে এক নারী নবিজির দরবারে নেকাব পরিহিত অবস্থায় এসে উপস্থিত হন। এসেই তিনি সন্তান হত্যার বিষয়ে প্রশ্ন করতে থাকেন। মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত কোনো এক সাহাবি ওই নারীকে সম্বোধন করে বললেন, তুমি তোমার সন্তান হত্যা সম্পর্কে জানতে এসেছো, অথচ তুমি নিজের চেহারা নেকাব দ্বারা আবৃত করে রেখেছো? জবাবে ওই নারী বলেন, আমার সন্তানের ওপর বিপদ নেমে এসেছে, আমার লজ্জার ওপর তো বিপদ নেমে আসেনি! এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই নারী দুই

শহীদের সওয়াব লাভ করবে। জিজ্ঞেস করা হলো, তা কীভাবে সম্ভব হে আল্লাহর রাসুল? নবিজি জবাবে বললেন, কারণ, আহলে কিতাব তার সন্তান হত্যা করেছে।[৩৭]

দুই.

عن أم عطية رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج الأبكار والعواتق وذوات الخدور والحيض فى العيدين فأما الحيض فيعتزلن المصلي ويشهدن دعوة المسلمين، فقالت إحداهن يا رسول الله! إن لم يكن لها جلباب؟ قال : فلتعرها أختها من جلبابها، هذا الحديث أخرجه عدة من أصحاب الصحاح.

উম্মে আতিয়্যাহ রা. বর্ণনা করেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে দুই ইদের দিন কুমারী, অকুমারী, পর্দানশীল এবং ঋতুবতী নারীগণ বের হতো। তবে ঋতুবতী নারীগণ ইদগাহের বাইরে অবস্থান করতো এবং মুসলিমদের সঙ্গে দোয়ায় অংশগ্রহণ করতো। এক নারী রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসুল! যদি কোনো নারীর কাছে চাদর না থাকে? (তাহলে সে কীভাবে ইদগাহে হাজির হবে?) জবাবে তিনি বললেন, তার বোন তার চাদর দ্বারা তাকে আবৃত করে নেবে।[৩৮]

তিন.

عن حفصة بنت سيرين ولفظه، فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم : على أحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب أن لا تخرج؟ فقال : لتلبسها صاحبتها من جلبابها.

হাফসা বিনতু সিরিন রা. থেকে বর্ণিত। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! যদি আমাদের মধ্যে কারও কাছে চাদর না থাকে এবং সে যদি ইদগাহে না যায় তাহলে কি গুনাহ হবে? জবাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে তার বান্ধবী নিজের চাদর পরিয়ে দেবে।[৩৯]

---

[৩৭] আবু দাউদ : ২৪৯০।

[৩৮] তিরমিজি, হাদিস : ৫৩৯।

[৩৯] মুসলিম, হাদিস : ৯৮০।

চার.

عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت :لما نزلت هذه الآية : يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ خرج نساء الأنصار كان على رؤسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها.

'উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন পবিত্র কুরআনের এ আয়াত يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ (নারীরা নিজেকে চাদর দ্বারা ঢেকে নেবে) অবতীর্ণ হলো, তখন আনসার নারীগণ নিজেদের ঘর থেকে এমনভাবে বের হতেন যে, কোনো প্রকার নড়াচড়াহীন হওয়ার কারণে মনে হতো, যেন তাদের মাথায় পাখি বসে আছে। তারা মাথায় কালো কাপড় জড়িয়ে বের হতেন।[৪০]

পাঁচ.

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : رحم الله تعالى نساء الأنصار لما نزلت يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وبناتك الآية، شققن مروطهن فاعتجرن خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما على رؤسهن الغربان.

'আয়শা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনসারি নারীদের প্রতি রহমত বর্ষিত হোক। যখন পবিত্র কুরআনের এ আয়াত يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ... অবতীর্ণ হলো, তখন তারা তাদের চাদর ফেঁড়ে ওড়না বানিয়ে নেন। এরপর তারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে এমনভাবে নামাজ পড়তেন যেন তাদের মাথায় কাক বসে আছে।[৪১]

ছয়.

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : كان الركبان يمرون بنا ونحن رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا جاذوا بنا سدلت أحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه.

'আয়শা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু

---

[৪০] রুহুল মাআনি, খণ্ড : ২২, পৃষ্ঠা : ৮৯।

[৪১] রুহুল মাআনি, খণ্ড : ২২, পৃষ্ঠা : ৮৯।

আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ইহরাম অবস্থায় ছিলাম। এমন সময় আমাদের পাশ দিয়েই আরোহীগণ চলাচল করছিলো। যখন আরোহীগণ আমাদের কাছে চলে আসতো, তখন আমরা আমাদের চাদরগুলো চেহারার ওপর টেনে দিতাম। আর যখন আরোহীগণ আমাদের অতিক্রম করে চলে যেতো তখন আমরা আমাদের চেহারা থেকে চাদর সরিয়ে ফেলতাম।[৪২]

উপরে বর্ণিত হাদিসগুলোর মাধ্যমে এ কথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, নারী সাহাবিগণ পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পর চাদর দ্বারা নিজেদের ওেহারা আবৃত করা অপরিহার্য মনে করতেন। ঘর থেকে বের হওয়ার সময় চাদর দ্বারা চেহারা ঢেকে বের হতেন। সর্বশেষ বর্ণিত হাদিসটি তো এ বিষয়ে আরও স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, পর্দার প্রতি নারীদের অবশ্যই যত্নবান হতে হবে। শুধু তাই নয়, ইহরাম অবস্থায়ও যখন চেহারায় কাপড় স্পর্শ করা শরয়িভাবে নিষিদ্ধ তখনও তাঁরা পর্দার ব্যাপারে যত্নবান থেকেছেন।

পর্দার তৃতীয় স্তর : শরিয়তের দলিল

পর্দার তৃতীয় স্তর হলো, নারী যখন ঘর থেকে বের হবে তখন পুরো শরীর মাথা থেকে পা পর্যন্ত আবৃত করে নেবে। বিশেষ প্রয়োজনে চেহারা ও হাতের তালু বের করার অনুমতির রয়েছে। তবে শর্ত হলো ফিতনা থেকে শংকামুক্ত হতে হবে।

পর্দার তৃতীয় এ স্তরটির প্রমাণ পবিত্র কুরআনের এ আয়াতে দ্বারা পাওয়া যায়—

﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾

‘হে নবি! আপনি মুমিন নারীদের বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে, নিজের লজ্জাস্থান হেফাজত করে এবং তারা যেন তাদের সৌন্দর্যের প্রকাশ না করে। তবে তার যে অংশ এমনিতেই খোলা থাকে। (তার কথা আলাদা)।[৪৩]

[৪২] আবু দাউদ, হাদিস : ১৮৩৩।

[৪৩] সুরা নুর, আয়াত : ৩১।

مَا ظَهَرَ مِنْهَا 'তবে তার (শরীরের) যে অংশ সাধারণত খোলা থাকে' আয়াতে উল্লিখিত অংশটুকুর ব্যাখ্যায় তাফসিরবিদগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা., আয়শা রা., আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, مَا ظَهَرَ مِنْهَا-এর ব্যাখ্যা করেছেন চেহারা ও হাতের তালু দ্বারা।

আতা রহ., ইকরামা রহ., সাইদ ইবনু খুবাইব রহ., আবুশ শাসা রহ., ইমাম দাহহাক রহ., ইবরাহিম নাখায়ি রহ.—সবারই একই অভিমত। অবশ্য, আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. مَا ظَهَرَ مِنْهَا-এর ব্যাখ্যা করেছের চাদর ও ওড়না দ্বারা। প্রথম তাফসির অনুযায়ী বোঝা যায়, প্রয়োজনের সময় নারীদের 'চেহারা' ও 'হাতের তালু' বের করার সুযোগ রয়েছে। বর্ণিত হাদিসগুলোও এর স্বপক্ষের প্রমাণ।

এক.

عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها وقال : يا أسماء! إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يري منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجه وكفيه.

'আয়শা রা. থেকে বর্ণিত। একদিন আসমা বিনতু আবু বকর রা. মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এমনভাবে উপস্থিত হলেন যে, তার পরিধানে ছিলো একেবারে পাতলা কাপড়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ অবস্থা দেখে দৃষ্টি সরিয়ে নিলেন। আর আসমা রা. কে সম্বোধন করে বললেন, হে আসমা! যখন নারী প্রাপ্তবয়স্কা হয়, তখন তার জন্য এমন কাপড় পরিধান করা উচিত নয়; যা দ্বারা তার দেহের কোনো অংশ দৃষ্টিগোচর হয়। শুধু তার এই অংশ আর এই অংশ ছাড়া। তখন তিনি চেহারা ও হাতের তালুর দিকে ইশারা করেন।'[৪৪]

দুই.

عن علي رضي الله تعالى عنه في رقصة رجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزدلفة أنه صلى الله عليه وسلم أردف الفضل بن عباس وأتى الجمرة فرماها ثم أتى المنحر وفيه واستفتته جارية

[৪৪] আবু দাউদ : ৪১০৬।

شابة من خثعهم، فقالت : إن أبي شيخ كبير قد أدركته فريضة الله فى الحج أفيجزئ أن أحج عنه؟ قال حجي عن أبيك، قال : ولوي العنق الفضل فقال العباس: يا رسول الله! لم لويت عنق ابن عمك؟ قال : رأيت شابا وشابة فلم أمن الشيطان عليهما.

'মুজদালিফা থেকে প্রত্যাবর্তনের ঘটনা উল্লেখ করতে গিয়ে আলি রা. বর্ণনা করেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজল ইবনু আব্বাস রা.-কে নিজের বাহনের পেছনে বসিয়ে নেন। এরপর তিনি জামরার (শয়তানকে পাথর মারার স্থান) কাছে চলে আসেন এবং রমি (পাথর নিক্ষেপ) করেন। এরপর তিনি 'মানহারে' (কুরবানি করার স্থান) যান। এ বর্ণনাতেই এ কথা বর্ণিত আছে যে, খাশআম গোত্রের এক যুবতী নারী রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে জানতে চাইলো, হে আল্লাহর রাসুল! আমার পিতা অনেক বৃদ্ধ, তার ওপর হজ ফরজ হয়েছে। আমি যদি তার পক্ষ থেকে হজ করি তাহলে তার পক্ষ থেকে হজ আদায় হবে কি? জবাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ আদায় করে নাও। এই কথার ফাঁকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজল ইবনু আব্বাস রা.-এর চেহারা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিলেন। তখন আব্বাস রা. জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! আপনি আপনার চাচাতো ভাইয়ের চেহারা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিলেন কেন? জবাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি একজন যুবক ও একজন যুবতীকে দেখেছি। আর শয়তান থেকে আমি তাদের নিরাপদ মনে করিনি।[৪৫]

وأخرج أبو يعلى عن الفضل بن عباس قال : كنت ردف رسول الله عليه وسلم وأعرابي معه ابنة له حسناء فجعل الأعرابي يعرضها على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء أن يتجوزها قال : فجعلت ألتفت إليها وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ برأسي فيلويه، ذكره الهيثمي في كتاب النكاح من مجمع الزوائد : ج ٤٠-ص- ٢٧٧وقال رجاله رجال الصحيح، فأما أن يكون هذه في واقعة أخري

[৪৫] তিরমিজি : ৮৮৫।

وأما أن يكون أحد الرواةوهم في بيان أن البنت كانت الاعرابي، وإن حديث الترمذي صريح في أن اباها لم يكن معها، والله أعلم.

'আবু ইয়ালা রহ. ফজল ইবনু আব্বাস রা. থেকে যে বর্ণনাটি নকল করেছেন, তাতে ফজল রা. বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে আরোহী ছিলাম। এ সময় গ্রাম্য এক ব্যক্তির সঙ্গে তার সুশ্রী কন্যা ছিলো। সেই গ্রাম্য ব্যক্তি তার সুশ্রী কণ্যাকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এমনভাবে উপস্থাপন করলো, যেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বিয়ে করেন। ফজল রা. বলেন, তখন আমি তাদের দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন আমার মাথা ভিন্ন দিকে ঘুরিয়ে দেন।'

এই ঘটনা বিস্তারিতভাবে ইমাম বুখারি রহ.-ও তার কিতাবে ৬২২৮ নং বর্ণনায় বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তার ভাষ্য হলো—

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولفظه : أردف رسول الله عليه وسلم الفضل بن عباس يوم النحر خلفه على عجزراحلته، وكان الفضل رجلا وضيئا، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم للناس يفتيهم وأقبلت امرأة من خثعهم وضيئة تستفي رسول الله عليه وسلم فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم والفضل ينظر إليها، فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها.

'আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাই ওয়াসাল্লাম কুরবানির দিন ফজল ইবনু আব্বাস রা.-কে নিজের আরোহনের পেছনে বসিয়ে নেন। ফজল রা. খুব সুন্দর ছিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মানুষের প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। এমন সময় আশআম গোত্রের এক সুন্দরী রূপসী নারী এসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে মাসআলা জিজ্ঞেস করতে থাকে। ফজল রা. সেই যুবতীর দিকে তাকিয়ে থাকেন। ওই যুবতীর সৌন্দর্যে তিনি অভিভূত হয়ে পড়েন। যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশ্নের জবাব দেবেন এমন সময় লক্ষ্য করলেন যে, ফজল ইবনু আব্বাস রা. ওই নারীর দিকে তাকিয়ে আছেন। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের হাত পেছনে নিয়ে ফজল রা.-এর থুতনি ধরে তার চেহারা যুবতীর দিক থেকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিলেন।

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা.-এর বর্ণনা থেকে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, ওই নারীর চেহারা খোলা ছিলো। এজন্যই ওই বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, সেই নারী সুন্দরী ছিলো। তার সৌন্দর্যে ফজল রা. বিমোহিত হয়েছিলেন। হাদিসে এ কথাও পরিস্কার এসেছে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজল রা-এর চেহারা ওই যুবতীর দিক থেকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। তবে সেই যুবতীর চেহারা আবৃত করার নির্দেশ দেননি। কারণ, ওই নারী ছিলো ইহরামরত অবস্থায়। তাছাড়া একারণেও হয়তো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চেহারা আবৃত করার নির্দেশ দেননি যে, তখন হয়তো খুব ভীড় ছিলো। এ সময় চেহারা ঢেকে রাখা কিংবা আবৃত করার নির্দেশ দিলে পড়ে যাওয়া কিংবা কষ্ট পাওয়ার আশংকা ছিলো। মোটকথা, এ হাদিস ওই কথার স্পষ্ট প্রমাণ যে, যদি নারীদের পুরো শরীর ঢাকা থাকে, তখন প্রয়োজনের সময় তার চেহারা খোলা জায়েজ আছে।

তিন.

عن سهل بن سعد رضي الله عنه : أن امرأة جائت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله! جئت لأهب لك نفسي، فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه.

'সাহল ইবনু সাদ রা. থেকে বর্ণিত। এক নারী রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে বললো, হে আল্লাহর রাসুল! আমি নিজেকে আপনার জন্য হেবা (দান) করার উদ্দেশ্যে এসেছি। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিকে তাকালেন এবং মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখলেন। এরপর দৃষ্টি নিচু করলেন এবং মাথা মোবারক অবনত করে ফেললেন।[৪৬]

---

[৪৬] মুসলিম : হাদিস : ৫১২৫।

বর্ণিত ঘটনা থেকেও এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, ওই সময় নারীর চেহারা খোলা ছিলো। ইমাম সারাখসি রহ. 'মাবসুত' কিতাবে নারীদের চেহারা 'সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়' দলিল হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[৪৭]

নারীদের চেহারা ও হাতের তালু দেখার ব্যাপারে ফকিহগণ এ বিষয়ে একমত যে, যদি অন্তরের হীন চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে কেউ দৃষ্টিপাত করে কিংবা কোনো ফিতনার আশংকা হয় যা একান্তবাসের দিকে নিয়ে যায় তাহলে দৃষ্টিপাত করা জায়েজ নেই। এমনকি এই অবস্থায় কোনো নারীর চেহারা ও হাতের তালু দেখা হারাম হওয়ার ব্যাপারে সবাই একমত। তবে দেখার দ্বারা যদি পুরুষ ফিতনামুক্ত থাকে এবং দেখার দ্বারা অন্তরের হীন উদ্দেশ্যও যদি না থাকে তবু দেখার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। হানাফি ও মালিকি মাজহাবে এমন পরিস্থিতিতে চেহারা ও হাতের তালু দেখা জায়েজ আছে। শাফিয়ি মাজহাবের অধিকাংশ আলেম ও হাম্বালি মাজহাবের কোনো কোনো আলেমের একই অভিমত। কিন্তু শাফিয়ি ও হাম্বালি মাজহাবের গ্রহণযোগ্য অভিমত হলো, যদিও তাতে ফিতনার কোনো আশংকা না থাকে তবু নারীর চেহারা ও হাতের তালু দেখা নাজায়েজ।

নারীদের প্রতি দৃষ্টিপাত

হানাফি মাজহাব :

ইমাম শামসুল আইম্মা সারাখসি রহ. বলেন—

يباح النظر إلى موضع الزينة الظاهرة منهن دون الباطنة لقوله تعالى :ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وقال علي وابن عباس رضي الله تعالى عنهم : ما ظهر منها : الكحل والخاتم، وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها : إحدى عينيها، وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه : خفها وملائتها، وإستدل في ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم : النساء حبائل الشيطان، بهن بصيد الرجال،....... ولأن حرمة النظر لخوف الفتنة وعامة محاسنها في وجهها فخوف الفتنة في النظر إلى وجهها أكثر

[৪৭] মাবসুত, খণ্ড : ১ পৃষ্ঠা : ১৫২।

منه إلى سائر الأعضاء، وبنحو هذا تستدل عائشة رضي الله تعالى عنها ولكنها تقول : هي لا تجد بدا من أن تمشي فى الطريق فلا بد من أن تفتح عينها لتبصر الطريق فيجوز لها أن تكشف أحدي عينيها لهذه الضرورة والثابت با الضرورة لا يعد وموضوع الضرور.

'নারীদের বাহ্যিক সৌন্দর্যের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া বৈধ। তবে অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য দেখা বৈধ নয়। কারণ, মহান আল্লাহ্ বলেন 'নারীরা তাদের সৌন্দর্যকে প্রকাশ করবে না। তবে 'শরীরের' ওই অংশ যা খোলা থাকে।' আলি রা. ও আবদুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস রা. বলেন, ما ظهر منها দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, সুরমা ও আংটি। আয়শা রা. বলেন, ما ظهر منها দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, এক চোখ। আবদুল্লাহ্ ইবনু মাসউদ রা. বলেন ما ظهر منها দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মোজা ও চাদর। তিনি এর স্বপক্ষে দলিল হিসেবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদিস বর্ণনা করেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন— 'নারীরা শয়তানের ফাঁদ। সে এই ফাঁদ দিয়ে পুরুষকে শিকার করে।'

দ্বিতীয় কারণ হলো, দেখা হারাম, যেহেতু এর দ্বারাই ফিতনার জন্ম হয়। আর নারীদের সৌন্দর্যের মূল স্থানই চেহারা। নারীদের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখার তুলনায় চেহারা দেখার মাঝে ফিতনার আশংকাই বেশি। আয়শা রা.-ও এ হাদিস দলিল হিসেবে তুলে ধরেছেন। তবে নারীদের রাস্তায় বের হতে কোনো বিধি-নিষেধ নেই বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। রাস্তা দেখার জন্য চোখ খোলা রাখা জরুরি। আর প্রয়োজন পূরণের জন্য এক চোখ খোলা রাখা জায়েজ। আর যে বিষয়টি 'প্রয়োজন' হিসেবে সাব্যস্ত হয় তা প্রয়োজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। সীমালঙ্ঘন করা যাবে না।[৪৮]

এরপর ইমাম সারাখসি রহ. বলেন—

ولكنا نأخذ بقول على وابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقد جائت الأخبار فى الرخصة بالنظر إلى وجهها وكفها، من ذلك ما روي أن امرأة عرضت نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى وجهها فلم ير فيها رغبة ولما قال عمر رضي الله تعالى عنه في خطبته : إلا لا تغالوا في في أصدقة النساء، فقالت امرأة سفعاء الخدين : أنت تقوله برأيك

[৪৮] মাবসুত লি সারাখসি, খণ্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ১৫২।

أم سمعتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإنا نجد في كتاب الله تعالى بخلاف ما تقول ...... فذكر الراوي أنها كانت سفعاء الخدين، وفي هذا بيان انها كانت مسفرة عن وجهها، وراي رسول الله عليه وسلم كف امرأة غير مخضوب فقال : أكف رجل هذا؟ ولما ناولت فاطمة رضي الله تعالى عنهما أحد ولديها بلالا أو أنسا رضي الله تعالى عنهم قال أنس : رأيت كفها كأنها فلقة قمر، فدل على انه لا بأس بالنظر إلى وجه الوجه والكف ، فالوجه موضع الكحل والكف موضع الخاتم.

'তবে আমরা আলি রা. ও আবদুল্লাহ্ ইবনু আব্বাস রা.-এর সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করবো। কারণ, চেহারা ও হাতের তালু দেখা জায়েজ হওয়ার ব্যাপারে অনেকগুলো হাদিস রয়েছে। এসব বর্ণনার মধ্য থেকে একটি হাদিস হলো, 'একজন নারী নিজেকে স্বর্বস্ব দিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অর্পণ করে। তখন তিনি ওই নারীর চেহারার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন কিন্তু এর মাধ্যমে তিনি কোনো আকর্ষণ অনুভব করেননি।

দ্বিতীয় বর্ণনা হলো, উমর ইবনু খাত্তাব রা. একবার খুতবার বয়ানে বলেন, সাবধান! নারীদের মোহর বেশি ধার্য করো না। এ কথা শুনে লালকৃষ্ণকায় মুখবিশিষ্ট এক নারী দাঁড়িয়ে বলেন, এই মন্তব্য কি আপনার নিজের পক্ষ থেকে বলছেন, না রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছেন। কারণ, আপনি যা বলেছেন আমরা পবিত্র কুরআনে এর বিপরীত দেখতে পাই। হাদিস বর্ণনাকারী 'লালকৃষ্ণকায় মুখবিশিষ্ট' কথাটি তার বর্ণনায় উল্লেখ করার দ্বারা বোঝা যায়, ওই নারীর চেহারা খোলা ছিলো।

একবার মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক নারীর মেহেদি ছাড়া হাত দেখে বলেছিলেন, এটি কি কোনো পুরুষের হাত?

একবার ফাতেমা রা. নিজের দুই সন্তানের একজনকে বেলাল রা. কিংবা আনাস রা.-এর কাছে অর্পণ করেন। আনাস রা. বলেন, আমি ফাতেমা রা.-এর হাত দেখেছি। মনে হলো, তা যেন ছিলো চাঁদের একটি খণ্ড। বর্ণিত হাদিসগুলো এ কথাই স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, চেহারা ও হাতের তালুতে দৃষ্টিপাত করায় কোনো সমস্যা নেই। সুতরাং চেহারা হলো সুরমা লাগানোর স্থান আর হাত আংটি পরিধান করার স্থান।

ইমাম সারাখসি রহ. আরও অগ্রসর হয়ে বলেন—

ثم لا شك أنه يباح النظر إلى ثيابها ولا يعتبر خوف الفتنة في ذلك، فكذلك إلى وجهها وكفها، وروي الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يباح النظر إلى قدمها أيضا وهكذا الطحاوي، لأنها كما تبتلي بابداء وجهها فى المعاملة مع الرجال وبابداء كفها فى الأخذ والإعطاء، تببلي بابداء قدميها إذا مشت حافية أو متنعلة وربما لا تجد الخف في كل وقت، وذكر في جامع البرامكة عن أبي يوسف أنه يباح النظر إلى ذراعيها أيضا، لأنها فى الخبز وغسل الثياب تبتلي بابداء ذراعيها أيضا، قيل وكذلك يباح النظر إلي ثناياها أيضا لأن ذلك يبدو منها عند التحدث مع الرجال.

'তাতে কোনো সন্দেহ নেই যে, কাপড়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করা বৈধ। এর মাঝে ফিতনায় জড়িয়ে যাওয়ার যে আশংকা রয়েছে তা গ্রহণযোগ্য নয়। এমনিভাবে নারীর চেহারা ও হাতের তালু দেখাও বৈধ। হাসান ইবনু জিয়াদ রহ. ইমাম আবু হানিফা রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নারীদের পা দেখাও বৈধ। ইমাম তহাবি রহ.-ও একই মত ব্যক্ত করেছেন। কেননা, পুরুষের সঙ্গে লেন-দেনের সময় নারীর মুখ খোলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এবং আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে হাত খোলার প্রয়োজন হয়। তেমনিভাবে খালি পা কিংবা জুতো পরিহিত অবস্থায় চলতে গিয়ে দুই পা খোলার প্রয়োজন হয়। কারণ, সবসময় মোজা রাখা কঠিন ও অসম্ভব একটি বিষয়।

'জামিউল বারাকিমাহ' গ্রন্থে ইমাম আবু ইউসুফ রহ. থেকে বর্ণিত আছে যে, নারীদের বাহুর প্রতি দৃষ্টি দেওয়াও বৈধ। কারণ, রুটি বানানোর সময় এবং কাপড় ধোয়ার সময় তার বাহু খোলার প্রয়োজন হয়। এটিও বলা হয়েছে যে, নারীদের সামনের দিকের দাঁত দেখাও বৈধ। কারণ, পুরুষের সঙ্গে কথা বলার সময় তা প্রকাশ হয়ে থাকে।'

ইমাম সারাখসি রহ. আরেকটু অগ্রসর হয়ে বলেন—

وهذا كله إذا لم يكن النظر عن شهوة، فإن كان يعلم أنه إن نظر إشتهي، لم يحل له النظر الي شئ منها، لقوله صلى الله عليه وسلم من نظر إلى محاسن أجنبية عن شهوة في عينيه الآنك يوم القيامة، وقال لعلي رضي الله تعالى عنه : لا تتبع النظرة بعد النظرة، فإن الاولي لك

والاخري عليك يعني بالأخري أن يقصدها عن شهوة...... وكذلك إن كان اكبر رأية أنه إن نظر إشتهي، لأن أكبر الرأي فيما لا يوقف على حقيقته كاليقين.

'বর্ণিত আলোচনা ওই সময় প্রযোজ্য হবে যখন নারীর প্রতি পুরুষের দৃষ্টি কামনাবাসনাহীন হবে। তবে যদি পুরুষ মনে করে, আমি যদি কোনো নারীর প্রতি দৃষ্টি দিই তাহলে কামোদ্দীপনার সৃষ্টি হবে তাহলে ওই পুরুষের জন্য নারীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কোনোটিই দেখা জায়েজ হবে না। কারণ, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো পরিচিত নারীর সৌন্দর্যের প্রতি কামোদ্দীপনার সঙ্গে দেখবে কেয়ামতের দিন তার চোখে (গরম) শীষা ঢেলে দেওয়া হবে।

অন্য হাদিসে এসেছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলি রা.-কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, একবার দৃষ্টি দেওয়ার পর দ্বিতীয়বার তাকাবে না। কারণ, (অনিচ্ছাবশত) একবার তাকানোর সুযোগ রয়েছে। তবে দ্বিতীয়বার তাকানো বিপর্যয়ের কারণ। অর্থাৎ, দ্বিতীয়বারের দৃষ্টি কামোদ্দীপনার সঙ্গে হলে। একই বিধান ওই অবস্থাতেও যখন কোনো পুরুষের দৃঢ় ধারনা হবে যে, যদি দ্বিতীয়বার দৃষ্টিপাত করা হয়, তাহলে তার অন্তর ওই নারীর প্রতি আকর্ষিত হবে। কারণ, যে ব্যাপারে চূড়ান্ত ফলাফল অজানা থাকে সে ক্ষেত্রে প্রবল ধারণাই নিশ্চিত অবস্থার স্থলাভিসিক্ত হবে।

মালিকি মাজহাব :

এ বিষয়ে মালিকি মাজহাবের সারমর্ম ইমাম খারাসি রহ. তার বিখ্যাত 'মুখতাসারুল খলিল' কিতাবের টীকায় উদ্ধৃত করেছেন। নিচে সেই ভাষ্য তুলে ধরা হলো—

عورة الحرة مع الرجل الأجنبي جميع بدنها حتى دلاليها وقصتها ماعدا الوجه والكفين ظاهر هما وباطنهما فيجوز النظر لهما بلا لذة ولا خشية فتنة من غير عذر ولو شابة، وقال مالك : تأكل المرأة مع غير ذي رحم ومع غلامها وقد تأكل مع جوزها وغيره ممن يواكله، ابن القطان : وفيه إباحة ابداء المرأة وجهها ويديها للاجنبي، إذ لا يتصور الأكل إلا هكذا.

'স্বাধীন নারীর পুরো শরীর অপরিচিত পুরুষের জন্য 'সতর'। এমনকি নারীর চিন্তা-ভাবনা ও কথা-বার্তাও। তবে চেহারা ও হাতের নিচের অংশ ছাড়া। কারণ, এই দুই অঙ্গের প্রতি কামোদ্দীপনা ও ফিতনার আশংকা ছাড়া দৃষ্টি দেওয়া জায়েজ আছে। ওই নারী যুবতী হলেও। ইমাম মালিক রহ. বলেন, নারী তার সাক্ষাৎ-হারাম ব্যক্তি ও নিজ দাসের সঙ্গে খাবার খেতে পারবে। কারণ, অনেক সময় স্ত্রীকে স্বামীর সঙ্গে খাবার খেতে হয় অথচ ওই সময় স্বামীর সঙ্গে অন্য পুরুষও খাবার খেতে বসে থাকে। ইবনু কাত্তান রহ. বলেন, এ থেকে বোঝা যায়, নারীর চেহারা ও হাত খোলার অনুমতি রয়েছে। কেননা, এই দুই অঙ্গ খোলা ছাড়া খাবার খাওয়া সম্ভব নয়। 'শরহুল মাউওয়াক' গ্রন্থে এই আলোচনাটিই অতিরিক্ত সংযোজনসহ বর্ণিত হয়েছে।'[৪৯]

শায়খ উলাইশ রহ. 'মানহুল জালিল' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন—

فيجوز لها كشفهما (أي الوجه والكفين) للأجنبي وله نظرهما إن لم تخش الفتنة، فإن خيفت الفتنة به فقال مرزوق ، مشهور المذهب وجوب سترهما.

'সুতরাং নারীর জন্য অপরিচিত পুরুষের সামনে চেহারা ও হাতের তালু খোলা জায়েজ এবং পুরুষের জন্যও ওই দুই অঙ্গের প্রতি তাকানো জায়েজ। তবে শর্ত হলো, ফিতনার আশংকামুক্ত থাকতে হবে। কিন্তু যদি ফিতনার আশংকা থাকে তবে এ ব্যাপারে ইবনু মারজুক রহ. বলেন, এ অবস্থায় প্রসিদ্ধ মাজহাব হলো, নারীর জন্য তা ঢেকে রাখা ওয়াজিব।'[৫০]

শাফিয়ি মাজহাব :

এ বিষয়ে শাফিয়ি মাজহাবের অভিমত ইমাম নববি রহ. 'মানহাজ' গ্রন্থে বিয়ের অধ্যায়ে নকল করেছেন। তিনি বলেন—

ويحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية وكذا وجهها وكفيها عند خوف فتنة وكذا عند الأمن على الصحيح.

[৪৯] শরহুল মাউওয়াক, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৯৯।

[৫০] মানহুল জালিল, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৩৩, মাওয়াহিবুল জালিল, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৪৯৯-৫০০।

‘প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষের জন্য অপরিচিত প্রাপ্তবয়স্কা নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা হারাম। এমনিভাবে ফিতনার আশংকা থাকলে চেহারা ও হাতের তালুর দিকেও দৃষ্টি দেওয়া হারাম। বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী ফিতনামুক্ত অবস্থায়ও একই হুকুম।

খতিব শিরবিনি রহ. বলেন—

قوله : على الصحيح، ووجهه الإمام بإتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه، وبأن النظر مظنة الفتنة ومحرك للشهوة.... والثاني (أي قول الثاني) لا يحرم، ونسبه الإمام للجمهور والشيخان للأكثرين، وقال فى المهمات : أنه الصواب لكون الأكثرين عليه، وقال البلقيني :الترجيح بقوة المدرك والفتوي على ما فى المنهاج.... وما نقله الإمام من الإتفاق على منع النساء أي منع الولاة لهن معارض بما حكاه القاضي عياض عن العلماء أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها، وإنما ذلك سنة وعلي الرجال غض البصر عنهن للآية، وحكاه المصنف (أي النووي) في شرح مسلم وأقره عليه، وقال بعض المتأخرين : أنه لا تعارض في ذلك بل منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في ذاته، بل لأن فيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروة، أه، وظاهر الكلام الشيخين أن الستر واجب لذاتو فلا يتأتي هذا الجمع وكلام القاضي ضعيف.

ইমাম নববি রহ. এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, সব মুসলিম এ ব্যাপারে একমত, চেহারা খুলে বাইরে বের হওয়া থেকে নারীদের বিরত রাখা হবে। কারণ, ফিতনায় জড়িয়ে যাওয়ার প্রধাণ ভূমিকা পালন করে ‘দৃষ্টি’। দ্বিতীয় অভিমত হলো, পুরুষের জন্য নারীদের দেখা হারাম নয়। ইমাম নববি রহ. দ্বিতীয় অভিমতটিকে অধিকাংশ ফকিহের অভিমত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আর শাইখাইন (ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আবু ইউসুফ রহ.) এই অভিমতকে অধিকাংশ শাফিয়ির অভিমত বলে উল্লেখ করেছেন। ‘মুহিম্মাত’ গ্রন্থে শাইখাইনের অভিমতটিকে বেশি নির্ভরযোগ্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, শাফিয়ি মাজহাবের অধিকাংশ অনুসারী এর ওপর আমল করে থাকেন।

ইমাম বুলকিনি রহ. বলেন, الترجيح بقوة المدرك ফতোয়া ‘মিনহাজ’ গ্রন্থে বর্ণনাকৃত

অভিমতের ওপর। ইমাম নববি রহ. মুসলিম শরিফের ব্যাখ্যাগ্রন্থে এ বিষয়ে সহমতের কথা নকল করেছেন যে, নারীদের অভিভাবকদের উচিত, নারীদের চেহারা খুলে বাইরে বের হতে নিষেধ করা। তাঁর এই অভিমতটি কাজি ইয়াজ রহ.-এর অভিমতের বিপরীত। কারণ, তিনি এ বিষয়ে আলেমগণের ঐকমত্যের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, রাস্তায় বের হওয়ার সময় নারীদের চেহারা ঢেকে বের হওয়া ওয়াজিব নয় বরং তা সুন্নত। উল্লেখ্য, পবিত্র কুরআনের নির্দেশের কারণে পুরুষদের জন্য নারীদের থেকে দৃষ্টি অবনত রাখা ওয়াজিব।

ইমাম নববি রহ. মুসলিম শরিফের ব্যাখ্যাগ্রন্থে এই অভিমতটি নকল করেছেন এবং এটিকেই চূড়ান্ত বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তবে কোনো কোনো মুতাআখখিরিন আলেম বর্ণনা করেন, এই দুই অভিমতের মাঝে কোনো বৈপরিত্য নেই। বরং যেখানে মুখ খুলে নারীদের বাইরে বের হওয়া নিষেধ করেছেন; তা এজন্য নয় যে, প্রকৃতভাবেই নারীদের মুখ ঢেকে বের হওয়া ওয়াজিব, বরং তা নিষেধ করা হয়েছে সার্বিক বিবেচনায়। কারণ, তা বর্জন করা দ্বারা মানবতার মাঝে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়।

শাইখাইন রহ.-এর বাহ্যিক কথার দ্বারা প্রমাণ হয়, প্রকৃত অর্থেই চেহারা ঢেকে রাখা ওয়াজিব। সুতরাং উভয়টি একসঙ্গে একত্র হতে পারে না। আর কাজি ইয়াজ রহ.-এর মতটি দুর্বল।[৫১]

হাম্বালি মাজহাব :

ইবনু কুদামা রহ. 'আল-মুগনি গ্রন্থের নেকাহ অধ্যায়ে হাম্বালি মাজহাবের অভিমত উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন—

> فأما نظر الرجل إلى الاجنبية من غير سبب فإنه محرم إلى جميعهافي ظاهر كلام أحمد، وقال للقاضي : يحرم عليه النظر إلى ماعدا الوجه والكفين لأنه عورة ويباح له النظر إليها مع الكراهة إذا أمنالفتنة ونظر لغير شهوة وهذا مذهب الشافعي... ولنا قول الله تعالي............ وأما حديث أسماء إن صح فيحتمل أنه كان قبل نزول الحجاب، فنحمله عليه.

'কোনো কারণ ছাড়াই অপরিচিত নারীর প্রতি তাকানোর ব্যাপারে

[৫১] মুগনিল মুহতাজ, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১২৮-১২৯, নিহায়াতুল মুহতাজ, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ১৮৪-১৮৫

ইমাম আহমাদ রহ.-এর বাহ্যিক অভিমত হলো, নারীর পুরো শরীরের দিকে 'নজর' (দৃষ্টিপাত করা) করা হারাম। কাজি রহ.-এর অভিমত হলো, চেহারা ও হাতের তালু ছাড়া অন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দিকে তাকানো হারাম। কারণ, সেই অঙ্গ 'সতরের' অন্তর্ভুক্ত। তবে যদি ফিতনায় জড়িয়ে যাওয়ার আশংকামুক্ত হয় এবং কামনা-বাসনা না থাকে, তাহলে অন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দিকে দৃষ্টিপাত করলে মাকরুহ হবে। ঠিক একই অভিমত ইমাম শাফিয়ি রহ.-এর। আমাদের দলিল 'মহান আল্লাহর এই বাণী—

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ.

'তোমরা তাঁর স্ত্রীদের কাছে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে'

আর আসমা রা. থেকে বর্ণিত হাদিসের বিষয়টিতে বলা হয়েছে, তা যদি সহিহও হয় তবু তাতে এই সম্ভাবনাও রয়েছে যে, ওই হাদিসটি পর্দার বিধান নাজিলের আগের হাদিস। সুতরাং আমরা এটিকে ওই অবস্থার ওপরই গণ্য করবো।[৫২]

চার মাজহাবের অভিমতগুলো বিশ্লেষণ করলে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সব মাজহাব এ বিষয়ে একমত যে নিজের কামনা-বাসনা জাগার অথবা ফিতনায় জড়িয়ে যাওয়ার আশংকা থাকা অবস্থায় নারীদের মুখমন্ডলের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হারাম। এ ক্ষেত্রে শাফিয়ি ও হাম্বালি মাজহাবের উত্তম অভিমত হলো, ফিতনায় জড়িয়ে যাওয়ার শংকামুক্ত অবস্থায়ও নারীদের চেহারার প্রতি দৃষ্টিপাত করা হারাম। তবে হানাফি ও মালিকি মাজহাবে ফিতনায় জড়িয়ে যাওয়ার শংকামুক্ত ও কামনা বাসনাহীন অবস্থায় নারীদের চেহারার দিকে দৃষ্টিপাত করার অনুমতি রয়েছে। কিন্তু এ শর্তটুকু বাস্তবে পাওয়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। বিশেষ করে বর্তমানে চারিত্রিক অধপতনের এ যুগে যখন চতুর্দিকে ফিতনা-ফাসাদের ছড়াছড়ি তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ শর্ত পাওয়া যায় না। তাই হানাফি মাজহাবের মুতাআখখিরিন আলেমগণ সাধারণভাবে নারীর চেহারার দিকে তাকানো নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। যেমন : দুররুল মুখতারে বর্ণিত হয়েছে—

فإن خاف الشهوة أو شك إمتنع نظره إلى وجهها فحل النظر مقيد

[৫২] আল-মুগনি, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৫৫৯।

بعدم الشهوة وإلا فحرام، وهذا في زمانهم، أما في زمانها فمنع من الشابة، قهستناني وغيره، إلا النظر لحاجة كقاض وشاهد يحكم ويشهد عليها الخ.

'যদি কামনা-বাসনার ভয় হয় কিংবা কামনা-বাসনা জাগ্রত হওয়ার আশংকা থাকে তাহলে নারীর চেহারার দিকে তাকানো নিষিদ্ধ। অতএব, কামনা-বাসনাহীন অবস্থায় নারীর চেহারার দিকে তাকানো হালাল। অন্যথায় হারাম। এই নির্দেশটি তৎকালীন ফকিহগণের। কিন্তু বর্তমান যুগের ফকিহগণের অভিমত হলো, কোনো যুবতী নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা নিষিদ্ধ। এই অভিমত কুহেস্তানি রহ. ও অন্যা আলেমগণের। অবশ্য প্রয়োজনের সময় দেখা জায়েজ। যেমন : বিচারকের বিচারকাজ শুনানির সময় দৃষ্টিপাত করা কিংবা সাক্ষীর সাক্ষ্য দেওয়ার সময়।

শামি রহ. 'নামাজের অধ্যায়ে' উল্লেখ করেছেন—

وتمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين رجال، لأنه عورة، بل لخوف الفتن.

'যুবতী নারীদেরকে পুরুষের সামনে চেহারা খোলা রাখা থেকে বিরত রাখা হবে। এই নির্দেশ এজন্য নয় যে, নারীর চেহারা 'সতরের' অন্তর্ভুক্ত। বরং তা নিষেধ করা হয়েছে, ফিতনায় জড়িয়ে যাওয়ার আশংকায়।

শামি রহ. 'তাজির' অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন—

يعزر المولي عبده والزوج زوجته على تركها الزينة (الي قوله) أو كشفت وجهها لغير محرم.

'মনিব তার দাসকে, স্বামী তার স্ত্রীকে সৌন্দর্য প্রদর্শন থেকে বিরত রাখার জন্য কিংবা নিজের চেহারা অপরিচিতদের সামনে খোলার জন্য 'তাজির' (শাস্তি প্রদান) করতে পারবে।'

ইমাম আবু বকর জাস্‌সাস রহ. তাঁর 'আহকামুল কুরআন' গ্রন্থে يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ (তারা নিজেদের চেহারা চাদর দ্বারা ঢেকে নেবে) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন—

في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مامورة بستر وجهها عن الأجنبيين وإظهار الستر والخفاف عند الخروج، لئلا يطمع أهل الريب فيهن.

'এ আয়াত এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করছে যে, যুবতী নারীদের ক্ষেত্রে নির্দেশ হলো, তারা ঘর থেকে বের হওয়ার সময় অপরিচিত পুরুষের সামনে নিজের চেহারা গোপন রাখবে। পর্দা আর মোজা দৃশ্যমান রাখবে। যেন সন্দেহভাজন লোকেরা লোভাতুর না হয়ে পড়ে।'[৫৩]

মুফতি শফি রহ. তাঁর বিখ্যাত আহকামুল কুরআন গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন—

وبهذا الذي قلنا تجتمع النصوص والروايات المتضادة بظاهرها، فإنك قد عرفت مماسر دنا لك من الايات والروايات أن بعضها يجوز كشف الوجه والكفين، إما على الجزم واليقين كحديث فضل بن عباس عند البخاري وحديث أسماء بنت أبي بكر فى السنن وحديث الواهبة نفسها عند البخاري وامثالها وبعضها يجوز على إحتمال الإختلاف وقع بين لصحابة رضي الله تعالى عنهم في تفسير قوله تعالى : إلا ما ظهر منها، على ما مر تفصيله.

'ইতোপূর্বে আমরা যা কিছু বলে এসেছি, তার পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ধৃত সব বর্ণনা ও শরিয়তের প্রমাণাদি, যেগুলো বাহ্যত পরস্পর বিপরীতমুখী পরিলক্ষিত হচ্ছিলো, মূলত সেগুলোর মাঝে মৌলিক কোনো বিরোধ নেই। কারণ, ইতোপূর্বে আমরা যেসব আয়াত ও হাদিস উল্লেখ করেছি সেসব বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, এসবের মাঝে কিছু বর্ণনায় নিশ্চিতভাবে চেহারা ও হাতের তালু খুলে রাখা জায়েজ সাব্যস্ত করা হয়েছে। যেমন : সহিহ বুখারিতে ফজল ইবনু আব্বাস রা.-এর বর্ণনা। সুনানের গ্রন্থে আসমা বিনতু আবু বকর রা.-এর বর্ণনা এবং বুখারি শরিফে বর্ণিত ওই নারীর ঘটনা, যে নিজেকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সোপর্দ করেছিলো, ইত্যাদি। আর কোনো কোনো বর্ণনায় সংশয়ের সঙ্গে চেহারা ও হাতের তালু দেখা জায়েজ সাব্যস্ত করা হয়েছে। কেননা, পবিত্র কুরআনের আয়াত— إلا ما ظهر

[৫৩] আহকামুল কুরআন, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৪৫৮।

منها.-এর ব্যাখ্যায় সাহাবিগণের মতপার্থক্য রয়েছে। যার বিস্তারিত বিবরণ ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।[৫৪]

মুফতি শফি রহ. আরও বলেন—

وبعضها يحرم كشف الوجه والكفين والنظر اليهما من الاجانب كقوله تعالى :وقرن في بيوتكن..... وقوله تعالى :فاسئلوهن من وراء حجاب .....وقوله تعالي: يدنين من جلابيبهن، على تفسير الجمهور من الصحابة، ولقوله تعالي: إلا ما ظهر منها على تفسير ابن مسعود رضي الله تعالى عنه..... فهذه نصوص الكتاب وروايات السنة ظاهرها التعارض والتضاد، وفيما ذكرنا لك بعون الله تعالى :غنية عن هذا الإشكال، فإنك إذا حققت ماقلنا عرفت أن هذه النصوص كلها متوافقة المعني متساقة الأحكام، وكلها محكمة غير منسوخة غير أن الحكم مشروط بشروط فحيث وجدت الشروط أجيز وحيث لا فلا.....

'শরিয়তের কোনো কোনো প্রমাণ চেহারা ও হাতের তালু খোলা এবং অপরিচিত পুরুষদের দৃষ্টিপাতকে হারাম ঘোষণা করেছে। যেমন : আল্লাহর এই বাণী وقرن في بيوتكن এবং 'মহান আল্লাহর এই বাণী فاسئلوهن من وراء حجاب এবং অধিকাংশ সাহাবির বর্ণনাকৃত এ আয়াতের তাফসির يدنين من جلابيبهن এবং আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা.-এর তাফসির অনুযায়ী মহান আল্লাহর এই বাণী إلا ما ظهر منها। পবিত্র কুরআনের এসব আয়াত ও হাদিসের মাঝে বাহ্যত বিরোধ এবং বিপরীত অবস্থান পরিলক্ষিত হলেও ইতোপূর্বে আমরা যে আলোচনা করেছি; ফলে আলহামদুলিল্লাহ, এতে আর কোনো প্রকার আপত্তি অবশিষ্ট থাকে না। সব প্রমাণ ও বর্ণনা নিজ নিজ স্থানে যথার্থ হিসেবেই বিবেচিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এসবের কোনোটি রহিত হয়ে গিয়েছে এমন বলার কোনো প্রয়োজন নেই। তবে শুধু এতটুকু মানতে হবে যে, এই নির্দেশগুলো কিছু শর্তের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এখন যেখানেই শর্ত পাওয়া যাবে সেখানে চেহারা খোলার অনুমতি পাওয়া যাবে আর যেখানে শর্ত পাওয়া যাবে না সেখানে চেহারা খোলার অনুমতি পাওয়া যাবে না।

---

[৫৪] আহকামুল কুরআন, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৮৬৯।

মুফতি শফি রহ. এরপর আরও উল্লেখ করেন—

وهذا كله على تسليم حقيقة الإختلاف بين تفسير ابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم، وقال شيخنا أشرف المشائخ نور الله مرقده في جزء افرده في هذا الحديث المسمي، بالقاء السكينة في تحقيق إبداء الزينة، أنه لا إختلاف بين تفسير هما عند التعمق وإمعان النظر، فإن لفظة «ما ظهر» وإن فسر بالوجه والكفين لكن المذكور في الإستثنا هو صيغة الظهور لا الإظهار وهو يشير إشارة واضحة إلى أن الغرض إستثنا ما لا يستطاع سترة بل بحيث يظهر عند الكسب والعمل من دون قصد الأظهار بأن يلحقهن ضرر بستره عند الكسب والعمل، فكان المستثني على تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنه أيضا هو ظهور الوجه ولكفين عند الإضطرار اليه، وهو لا ينافي قول ابن عباس رضي الله عنه، قلت : ويؤيد هذا المعني ما قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى : ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها : أي لا يظهرن شيئا من الزينة من الأجانب إلا ما لا يمكن إخفاءه.

'উপরে আমরা যে আলোচনা তুলে ধরেছি তার ভিত্তি ছিলো, যখন আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. এবং আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা.-এর উভয় তাফসিরের মাঝে ইখতেলাফের হাকিকতকে মেনে নেওয়া হবে। কিন্তু আমাদের শায়খ মাওলানা আশরাফ আলি থানবি রহ. এ বিষয়ে إلقاء السكينة في تحقيق إبداء الزينة নামে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। ওই গ্রন্থে তিনি লেখেন, গভীর দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে—উভয় তাফসিরের মাঝে বাস্তবে কোনো বিরোধ নেই। কারণ, 'ما ظهر' শব্দের তাফসির যদিও চেহারা হাতের তালু দ্বারা করা হয়ে থাকে, কিন্তু ব্যবহারের 'ظهور' শব্দটি 'لازم صيغة' ব্যবহার করা হয়েছে। 'إظهار' অর্থাৎ, متعدي صيغة ব্যবহার করা হয়নি। আর 'لازم صيغة ' টি ওই দিকেই ইঙ্গিত করছে যে, যেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গোপন রাখা সাধ্যের বাইরে, অনিচ্ছাকৃতভাবে যা প্রকাশ পেয়ে যায়; যা ঢেকে রাখা মুশকিল ব্যাপার—এ আয়াতে মূলত এমন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বাদ দেওয়াই উদ্দেশ্য। তাই আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা.-এর তাফসির অনুযায়ী অপারগতার সময় চেহারা ও হাতের তালু ঢেকে রাখার নির্দেশের আওতা-বহির্ভূত। এই তাফসির আবদুল্লাহ ইবনু

মাসউদ রা.-এর অভিমতের বিরোধী নয়। আমি বলতে চাই, এই অর্থের স্বপক্ষে পবিত্র কুরআনের এ আয়াতের ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها তাফসির, যা ইবনু কাসির রহ. করেছেন—নারীরা অপরিচিত কোনো পুরুষের সামনে নিজেদের সৌন্দর্য প্রদর্শন করবে না, তবে যদি এমন হয়, যা ঢেকে রাখা প্রায় অসম্ভব তাহলে সেটি ভিন্ন ব্যাপার।

সারমর্ম

উপর্যুক্ত এই বিস্তারি আলোচনার সারমর্ম হলো, পবিত্র কুরআন নারীদেরকে এই নির্দেশ দিয়েছে, তারা যেন নিজেদের ঘরে অবস্থান করে। প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের না হয়। আর যদি কোনো প্রয়োজনে বের হয় তাহলে শরিয়তের নির্দেশ হলো, বোরকা বা চাদর দিয়ে নিজের পুরো শরীর ঢেকে নেবে। এমনকি চেহারাও খোলা রাখবে না। তবে দুই অবস্থায় কিছুটা শিথিলতা রয়েছে। প্রথমত, যদি চেহারা খোলার এমন তীব্র প্রয়োজন থাকে যে, যদি খোলা না হয়, তাহলে ক্ষতির আশংকা রয়েছে। যেমন : ভিড়ের মাঝে চলতে গিয়ে কিংবা অন্য কোনো কঠিন প্রয়োজনের সময়, যেমন : সাক্ষ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে। দ্বিতীয়ত, জরুরি কাজ করতে গিয়ে অনিচ্ছাকৃত মুখ খুলে গেলে। উভয় অবস্থায় পুরুষের প্রতি নির্দেশ হলো, নিজের দৃষ্টি নত রাখবে। মহান আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।[৫৫]

ইসলামে ছবি-ভাস্কর্যের বিধান

শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি

‘ইসলামে ছবি-ভাস্কর্যের বিধান’—এ প্রবন্ধটিও শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি (হাফিজাহুল্লাহ) ‘تكملة فتح الملهم ‘ফাতহুল মুলহিমের সম্পূরক গ্রন্থে مسئلة التصوير فى الإسلام ‘ইসলামে ছবি-ভাস্কর্যের বিধান’ শিরোনামে উল্লেখ করেছেন। বিষয়টি সর্বসাধারণের জন্য প্রয়োজনীয় বোধ করায় উপকারার্থে উর্দু ভাষায় এর তরজমা পেশ করলাম।

—আবদুল্লাহ মায়মান

ইসলামে ছবি-ভাস্কর্যের বিধান

বর্তমান যুগে সর্বত্রই ছবি বা ফটোর ব্যাপক প্রচলন পরিলক্ষিত হচ্ছে। তাই আমরা বক্ষমান নিবন্ধে উল্লিখিত বিষয়টির ওপর বিস্তারিত আলোচনা করবো। এখানে আমরা সর্বপ্রথম ওইসব হাদিস উপস্থাপন করবো যাতে ছবি তোলার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। তারপর এ বিষয়ে ফকিহগণের অভিমত ও মাজহাব সম্পর্কে আলোচনা করবো।

ছবির নিষেধাজ্ঞা-সম্বলিত হাদিসসমূহ

এক.

عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم : أحيوا ما خلقتم.

'আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যারা ছবি বানায়, কেয়ামতের দিন তাদের শাস্তি দেওয়া হবে এবং তাদের সম্বোধন করে বলা হবে, তোমরাযা বানিয়েছো তা জীবিত করো।'[৫৬]

[৫৬] সহিহ বুখারি ও মুসলিম : ৫৯৫১ ও ৫৬৫৭।

দুই.

عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون.

'আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যারা ছবি বানাবে তাদের কেয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠিন শাস্তি হবে।'[৫৭]

তিন.

قال أبو زرعة : دخلت مع أبي هريرة في دار مروان فرأي فيها التصاوير فقال : سمعت رسول الله عليه وسلم يقول : قال الله عز وجل : ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا ذرة وليخلقوا حبة وليخلقوا شعيرة.

'আবু জুরআ রা. বলেন, একবার আমি আবু হুরায়রা রা.-এর সঙ্গে খলিফা মারওয়ানের ঘরে প্রবেশ করি। ঘরে অনেক ছবি দেখতে পেলাম। আবু হুরায়রা রা. ঘরে ছবি দেখতে পেয়ে বললেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, 'মহান আল্লাহ বলেছেন, ওই ব্যক্তির চেয়ে বড়ো জালেম আর কে হতে পারে যে আমার সৃষ্টিতুল্য সৃষ্টি করে? সুতরাং তার উচিত, সে যেন অনু সৃষ্টি করে দেখায় এবং একটি শস্যদানা এবং একটি জব সৃষ্টি করে দেখায়।'[৫৮]

চার.

عن أبي طلحة رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة

'আবু তলহা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, যে ঘরে কুকুর এবং ছবি রয়েছে সেই ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করেন না।'[৫৯]

---

[৫৭] সহিহ বুখারি ও মুসলিম : ৫৯৫০ ও ৫৬৫৯।

[৫৮] সহিহ বুখারি ও মুসলিম : ৭৫৫৯ ও ৫৬৬৫ ।

[৫৯] সহিহ মুসলিম : ৫৬৩৬।

পাঁচ.

عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثير أو تصاوير.

'আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ঘরে ছবি বা মূর্তি স্থাপিত রয়েছে সেই ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করেন না।'[৬০]

ছয়.

قَالَ ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنه سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ ».

'আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি দুনিয়ায় কোনো ছবি বানাবে কেয়ামতের দিন তাকে বলা হবে, এতে জীবন দান করো। কিন্তু সে তাতে জীবনদানে অক্ষম হবে।[৬১]

সাত.

قال سعيد بن أبي الحسن : كنت عند ابن عباس إذ جاءه رجل فقال : يا ابن عباس! إني رجل إنما معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير، فقال ابن عباس : لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول : من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح، وليس ينافخ فيها ابدا، فربا الرجل ربوة شديدة وأصفر وجهه، فقال ويحك إن ابيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر، كل شيئ ليس فيه روح.

'সাইদ ইবনু আবুল হাসান রহ. বলেন, একবার আমি আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা.-এর কাছে বসা ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, হে ইবনু আব্বাস! আমার জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম হলো আমার হস্তশিল্প। আমি এসব ছবি এঁকে থাকি। আবদুল্লাহ

[৬০] সহিহ মুসলিম : ৫৬৬৭।

[৬১] সহিহ মুসলিম : ৫৬৬৩।

ইবনু আব্বাস রা. বলেন, আমি তোমার কাছে ওই কথা বর্ণনা করছি যা আমি নিজে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো ছবি বানায়, 'মহান আল্লাহ তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত শাস্তি দিতে থাকবেন যতক্ষণ না সে তাতে জীবন দিতে সক্ষম হবে। আর সে কখনোই তাতে জীবন দিতে সক্ষম হবে না। তা শুনে ওই ব্যক্তি দীর্ঘশ্বাস নিলো এবং তার চেহারা মলিন হয়ে গেলো। আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. বলেন, আরে ভাই! তুমি যদি ছবি অঙ্কন করতেই চাও তাহলে এই গাছের ছবি কিংবা প্রাণহীন কোনো বস্তুর ছবি অঙ্কন করো।'[৬২]

আট.

عن ابي حذيفة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نهي عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن أكل الربوا وموكله والواشمة والمشتوشمة والمصور.

'আবু হুজায়ফা রা. বর্ণনা করে বলেন, রাসুল সালল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রক্তের মূল্য নেওয়া, কুকুরের মূল্য নেওয়া এবং অপকর্মকারিণীর উপার্জন থেকে নিষেধ করেছেন।'[৬৩]

নয়.

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رأه رسول الله صلى الله على وسلم هتكه وقال : أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، قالت : فقطعناه فجعلناه وسادة أو وسادتين.

'আয়শা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফর থেকে ফিরে আসেন। তখন আমি বাতির ওপর হালকা ছবিযুক্ত পর্দা টানিয়ে দিলাম। তা দেখে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিঁড়ে ফেললেন এবং বললেন, কেয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠিন শাস্তি হবে ওই ব্যক্তির, যে আল্লাহর সৃষ্টির সঙ্গে সাদৃশ্য অবলম্বন

[৬২] সহিহ বুখারি : ২২২৫।

[৬৩] সহিহ বুখারি : ২২৩৮।

করে। তারপর আয়শা রা. বলেন, আমি ওই পর্দাটি কেটে একটি বা দুটি বালিশ বানিয়ে নিই।'[৬৪]

দশ.

عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال : وعد جبرئيل النبي صلى الله عليه وسلم فراث عليه حتى إشتد على النبي صلى الله عليه وسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه فشكا إليه ما وجد فقال : إنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب.

'আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা. বলেন, একবার জিবরাইল আ. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে (নির্দিষ্ট সময়ে সাক্ষাতের) ওয়াদা করলেন। কিন্তু ওয়াদা অনুযায়ী জিবরাইল আ.-এর আগমন বিলম্বিত হলো। বিষয়টি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বেশ পীড়াদায়ক মনে হলো। (বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর) রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘর থেকে বের হলেন। বের হওয়া-মাত্রই জিবরাইল আ.-এর সঙ্গে দেখা হলো। অপেক্ষার কারণে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে কষ্ট হলো সেই অভিযোগ তিনি জিবরাইল আ.-এর কাছে করলেন। জিবরাইল আ. বলেন, আমরা এমন ঘরে প্রবেশ করি না যে ঘরে ছবি বা কুকুর থাকে।[৬৫]

এগারো.

عن جابر رضي الله عنه قال : نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت ونهي أن يصنع ذلك.

জাবির রা. বর্ণনা করেন, মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে ছবি রাখতে এবং ছবি বানাতে নিষেধ করেছেন।

বারো.

عن على رضي الله تعالى عنه أنه قال لأبي الهياج الأسدي : إلا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته.

---

[৬৪] সহিহ বুখারি : ৫৯৫৪।

[৬৫] সহিহ বুখারি : ৫৯৬০।

'আলি রা. থেকে বর্ণিত। তিনি আবুল হাইয়্যাজ আসাদিকে উদ্দেশ্য করে বলেন,আমি কি আপনাকে এমন কাজে উৎসাহিত করবো না? যা করতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে উৎসাহিত করেছেন। আর তা হলো, কোনো ছবি না মিটিয়ে তা হাতছাড়া করবে না এবং উঁচু কবরকে সমতল না করে ছাড়বে না।'[৬৬]

তেরো.

عن عبد الله بن نجي الحضرمي عن أبيه عن على رضي الله عنهم في حديث طويل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنع ذكر عن جبرئيل عليه السلام أنه قال : أنها ثلاث لن يلج ملك ما داموا فيها أبدا، واحد منها كلب أو جنابة أو صورة روح، أخرجه أحمد في مسنده كما في فتح الباري :ج . ١٧-ص ٢٧٩-وأخرجه أيضا النسائي وابن ماجه مختصرا وسنده جيد كما في فتح الرباني.

'আবদুল্লাহ ইবনু নাজ্জি হাজরামি রহ. নিজের পিতা থেকে এবং আলি রা. থেকে একটি দীর্ঘ হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা নকল করেছেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জিবরাইল আ. বলেছেন, তিনটি জিনিস এমন আছে, যতক্ষণ পর্যন্ত সেগুলো কোনো স্থানে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত সেখানে কোনো ফেরেশতা প্রবেশ করে না—

১. কুকুর;
২. নাপাক ব্যক্তি;
৩. প্রাণীর ছবি।[৬৭]

চৌদ্দ.

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : لما إشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة يقال لها مارية وكانت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله تعالى عنهما أتنا أرض الحبشية فذكرنا من حسنها وتصاوير فيها فرفع رأسه فقال : أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح

[৬৬] সহিহ মুসলিম, তিরমিজি , হাদিস : ১০৪৯, আবু দাউদ, হাদিস : ৩২১৮।

[৬৭] মুসনাদে আহমাদ, সূত্র : ফাতহুল বারি : খণ্ড : ১৭, পৃষ্ঠা : ২৭৯, সুনানে নাসায়ি, সুনানে ইবনু মাজাহ, সূত্র : আল-ফাতহুর রব্বানি।

بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار خلق الله.

'আয়শা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন নবিজি অসুস্থ হয়ে পড়লেন, তখন কোনো কোনো স্ত্রী খ্রিস্টানদের [كنيسة] উপাসনালয় সম্পর্কে আলোচনা করলেন যাকে [مارية] 'মারিয়া' বলা হয়। উম্মে সালমা ও উম্মে হাবিবা রা. উভয়ে ছিলেন হাবশার অধিবাসী। তাই তাঁরা সেই উপাসনালয়ের সৌন্দর্য এবং ভেতরে স্থাপিত ছবির বিষয়টিও আলোচনায় আনলেন। এমন সময় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের মাথা মোবারক উঁচু করে বললেন, তারা তো ওইসব লোকের অন্তর্ভুক্ত, যারা কোনো নেককার লোক মারা গেলে, তার কবরে মসজিদ নির্মাণ করে। তারপর সেই মসজিদে ছবি টানিয়ে রাখে। এসব লোক আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট সৃষ্টি।[৬৮]

বর্ণিত সবগুলো হাদিসই [مرفوع] 'মারফু'। সবগুলো হাদিস থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, ছবি নিষিদ্ধ। এ ব্যাপারে কোনো তারতম্য নেই যে, ছবিটি কি দেহবিশিষ্ট (ভাস্কর্য), না কাপড়, কাগজ বা অন্য কোনো উপায়ে প্রস্তুত করা হয়েছে? অর্থাৎ, সব ধরণের ছবি-ভাস্কর্যের প্রতি শরিয়তের নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে।

ছবি সম্পর্কে সাহাবিগণের অভিমত ও তাঁদের কর্মপন্থা

সাহাবিগণ ও তাবেয়িনদের থেকে অসংখ্য [آثار] 'আসার' বা বর্ণনা রয়েছে। তাঁদের এসব অভিমত থেকেও স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ছবি তোলা, ছবি অঙ্কন করা সবই হারাম। তাদের সেসব বর্ণনার কিছু বর্ণনা নিচে তুলে ধরা হলো।

এক.

عن عمر رضي الله تعالى عنه قال للنصاري : إنا لا ندخل كنائسكم من أجلِ التماثيل التي فيها الصور.

'উমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি খ্রিস্টানদের সম্বোধন করে বলেছেন,

[৬৮] সহিহ বুখারি : ১৩৪১, সহিহ মুসলিম : ৫২৮।

আমরা তোমাদের উপাসনালয়ে ওইসব প্রতিমার কারণে প্রবেশ করি না, যা মূলত ছবি।[৬৯]

মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক এই বর্ণনাটি উমর রা.-এর গোলাম আসলাম-এর সূত্রে এভাবে নকল করেছেন—

لما قدم عمر الشام صنع له رجل من النصاري طعاما وكان عظمائهم وقال : أحب أن تجيئي وتكرمني فقال له عمر : إنا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور التي فيها يعني التماثيل.

'যখন উমর রা. শামে (সিরিয়া) আগমন করেন, তখন খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি তার জন্য খাবার তৈরি করলো। সে ছিলো অভিজাত শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। লোকটি উমর রা.-এর কাছে আবেদন করলো, আপনি আমার এখানে এসে আমাকে ধন্য করবেন। উমর রা. তাকে বললেন, আমরা তোমাদের ইবাদতখানায় ওইসব ছবি অর্থাৎ, মূর্তির—যেগুলো সেখানে স্থাপিত রয়েছে—কারণে প্রবেশ করি না, ।

দুই.

عن على رضي الله تعالى عنه أنه قال لأبي الهياج الأسدي : إلا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته.

'আলি রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি আবুল হাইয়্যাজ আসাদিকে উদ্দেশ্য করে বলেন,আমি কি আপনাকে এমন কাজে উৎসাহিত করবো না? যা করতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে উৎসাহিত করেছেন। আর তা হলো, কোনো ছবি না মিটিয়ে তা হাতছাড়া করবে না এবং উঁচু কবরকে সমতল না করে ছাড়বে না।'[৭০]

তিন.

عن إبي مسعود رضي الله تعالى عنه أنه رأي صورة فى البيت فرجع،

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি কোনো এক ঘরে ছবি দেখতে পেয়ে ফেরত চলে আসেন।[৭১] (তিনি ঘরে প্রবেশ করেননি)

---

[৬৯] সহিহ বুখারি।

[৭০] সহিহ মুসলিম, তিরমিজি , হাদিস : ১০৪৯, আবু দাউদ, হাদিস : ৩২১৮।

[৭১] সহিহ বুখারি।

চার.

عن مسعود الانصاري رضي الله تعال عنه أن رجلا صنع له طعاما فدعاه فقال : أفي البيت صورة؟ قال : نعم! فأبي أن يدخل حتى كسر الصورة ثم دخل.

'আবু মাসউদ আনসারি রা. থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি খাবার তৈরি করে তাঁকে দাওয়াত করলেন। আবু মাসউদ রা. জানতে চাইলেন, তোমার ঘরে কি কোনো ছবি আছে? আমন্ত্রক জানালেন, হ্যাঁ। তিনি সেই ঘরে প্রবেশ করতে অস্বীকৃতি জানালেন। অবশেষে ওই ব্যক্তি ছবিটি ভেঙ্গে ফেলার পর তিনি তার ঘরে প্রবেশ করেন।'[৭২]

পাঁচ.

عن ابي هريرة رضي الله تعال عنه أنه رأي فرسا من رقاع في يد جارية فقال : إلا تري هذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما يعمل هذا من لا خلاق له يوم القيامة.

'আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি একটি শিশু মেয়ের হাতে কাপড় দ্বারা বানানো ঘোড়ার প্রতিকৃতি দেখে বললেন, তুমি কি এটিকে দেখতে পাচ্ছো না? কেননা, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এমন জিনিস সে-ই বানাতে পারে, কেয়ামতের দিন যার কোনো অংশ থাকবে না। অর্থাৎ, কোনো সওয়াব পাবে না।[৭৩]

ছয়.

عن شعبة مولي ابن عباس رضي الله تعال عنهما أن المسور ابن مخرمة دخل على عبد الله بن عباس يعوده، فرأي عليه ثوب إستبرق، فقال : يا ابن عباس! ما هذا الثوب؟ قال ابن عباس : وما هو؟ قال الإستبرق قال : إنما كره ذلك لمن يتكبر فيه، قال : ما هذه التصاوير فى الكانون؟ فقال لا جرم، ألم تر كيف أحرقها بالنار؟ فلما خرج قال : إنزعوا هذا الثوب عني وأقطعوا رؤس هذه التصاوير التي فى الكانون فقطعها.

'ইবনু আব্বাস রা.-এর খাদেম শুবা রা. বর্ণনা করেন, একবার সেবা

[৭২] সুনানে বায়হাকি : খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ২৬৮।

[৭৩] মুসনাদে আহমাদ : খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৮৯।

করার উদ্দেশ্যে মিসওয়ার ইবনু মাখরামা রা. আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা.-এর কাছে আসেন। এসে ইবনু আব্বাস রা.-এর গায়ে মোটা রেশমের কাপড় দেখতে পান। তিনি ইবনু আব্বাস রা.-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে ইবনু আব্বাস! আপনার গায়ে রেশমের কাপড় এটি কী? ইবনু আব্বাস রা. বললেন, এতে সমস্যা কী? তিনি বললেন, এটি তো রেশমের কাপড় দেখছি। ইবনু আব্বাস রা. বললেন, এটি ওইসব লোকের জন্য পরিধান করা মাকরুহ, যারা তা পরিধান করে, অহংকার করে। এরপর তিনি (মিসওয়ার ইবনু মাখরামা রা.) বললেন, আংটিতে যে ছবি থাকে এটি কেমন? ইবনু আব্বাস রা. বললেন, এতেও কোনো গুনাহ নেই। তুমি কি দেখতে পাচ্ছো না, আগুন এটিকে কীভাবে জ্বালিয়ে দিয়েছে? যখন মিসওয়ার ইবনু মাখরামা রা. ফিরে গেলেন তখন ইবনু আব্বাস রা. বললেন, এই কাপড় আমার ওপর থেকে সরিয়ে ফেলো এবং আংটিতে যে ছবি আছে তার মাথা কেটে দাও। এরপর তা কেটে দেওয়া হলো।[৭৪]

সাত.

عن قتادة أن كعبا رضي الله تعالى عنه قال : وأما من أذي الله فالذين يعملون الصور فيقال لهم : أحيوا ما خلقتم.

'কাতাদা রা. বর্ণনা করেন, কাব রা. বর্ণনা করেছেন , যারা 'মহান আল্লাহ-কে কষ্ট দিয়েছে তারা হলো ওইসব লোক, যারা ছবি বানায়। কেয়ামতের দিন তাদেরকে বলা হবে, তোমরা যা বানিয়েছো তাতে জীবন দান করো।[৭৫]

عن قتادة : يكره من التماثيل ما فيه الروح فأما الشجر فلا بأس به.

'কাতাদা রা. বর্ণনা করেন, প্রাণবিশিষ্ট কোনো বস্তুর প্রতিমা বানানো মাকরুহ (নিষিদ্ধ)। তবে গাছের প্রতিমা বানাতে কোনো সমস্যা নেই।[৭৬]

---

[৭৪] মুসনাদে বায়হাকি, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ২৭০, মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৫৩।

[৭৫] মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক, খণ্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ৪০০, হাদিস : ১৯৪৯২।

[৭৬] মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক, খণ্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ৪০০, হাদিস : ১৯৪৯৩।

নয়.

أخرج ابن سعد في طبقاته أن سعيد بن المسيب كان لا يأذن لإبنته في اللعب ببنات العاج.

'ইবনু সাদ রহ. 'তাবাকাত'-এ উল্লেখ করেছেন, সাইদ ইবনু মুসাইয়িব রহ. নিজের কন্যাকে হাতির দাঁত দিয়ে তৈরি পুতুলের মাধ্যমে খেলাধুলা করতে অনুমতি দেননি।[৭৭]

ফকিহগণের মাজহাব

উপরে বর্ণিত হাদিস সাহাবিগণ ও তাবেয়িনদের উদ্ধৃতির কারণে অধিকাংশ ফকিহ ছবি তোলা ও ঘরে রাখা হারাম ঘোষণা করেছেন। সেগুলো ছবি ভাস্কর্য বা চিত্রের আকৃতিতে হোক অথবা ভাস্কর্যহীন কিংবা চিত্রহীন যে-কোনো আকৃতিতেই হোক না কেন।

ইতোপূর্বে আবু তলহা রা.-এর সূত্রে বর্ণিত চতুর্থ হাদিসটি যা মুসলিম শরিফের উদ্ধৃতিতে দলিল হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। মুসলিম শরিফের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাকার নববি রহ. শরহু মুসলিম গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন—

قال أصحابنا وغيرهم من العلماء، تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الاحاديث وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره فصنعته حرام بكل حال، لأنه فيه مضاهاة لخلق الله تعالي...... وأما إتخاذ المصورفيه صورة حيوان فإن كان معلقا على حائط أو ثوبا ملبوسا أو عمامة ونحو ذلك مما لا يعد ممتهنا فهو حرام، وإن كان في بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها يمتهن فليس بحرام، ولا فرق في هذا كله بين ماله وما لا ظل له، هذا تخليص مذهبنا في المسئلة، وبمعناه قال جماهيرالعلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وهو مذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة وغيرهم.

---

[৭৭] তাবাকাতে ইবনু সাদ, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ১৩৪।

'আমাদের সাথীবর্গ ও অন্য আলেমগণের অভিমত হলো, প্রাণীর ছবি বানানো চূড়ান্ত পর্যায়ের একটি কঠিন হারাম। এটি গুনাহে কবিরার অন্তর্ভুক্ত। কারণ, এ বিষয়ে হাদিসে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় নিষেধাজ্ঞা ও সতর্কবাণী বর্ণিত হয়েছে। সেটি কোনো তুচ্ছ-নগণ্য বস্তু দ্বারা বানানো হোক কিংবা অতি মূল্যবান কোনো বস্তু দ্বারাই তৈরি করা হোক না কেন। সর্বাবস্থায় এর চিত্রায়ণ করা হারাম। কারণ, এর দ্বারা 'মহান আল্লাহর কাজের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে যায়। কোনো জিনিসে ছবি বানানো থাকলে সেটির বিধান হলো, যদি ছবিটি এমন জিনিসের ওপর চিত্রিত থাকে যা কোনো দেওয়ালে টানিয়ে দেওয়া হয়, কিংবা কোনো কাপড়ে চিত্রিত থাকে যা পরিধান করা হয়, অথবা পাগড়িতে চিত্রিত থাকে, যাকে নিকৃষ্ট ভাবা হয় না, তাহলে এ জাতীয় জিনিস রাখা হারাম। আর ছবি যদি এমন কোনো বিছানার ওপর চিত্রিত থাকে, যা পদদলিত করা হয়, কিংবা ছোটো বড়ো কোনো বালিশের ওপর থাকে যা সাধারণ মনে করা হয়, তাহলে এ জাতীয় ফটো রাখা হারাম নয়। অবশ্য এই হিসাবে হালাল-হারাম নির্নিত হয় না যে, এটি চিত্রিত কিংবা এটি চিত্রহীন। এ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণই আমাদের মাজহাবের সারকথা। অধিকাংশ সাহাবি, অধিকাংশ তাবেয়িন এবং পরবর্তীকালের আলেমগণের অভিমতও অনুরূপ। ইমাম মালিক রহ., ইমাম সাওরি রহ. ও ইমাম আবু হানিফা রহ.-সহ অন্য আলেমগণেরও মাজহাব এটিই। আল্লামা আইনি রহ. উমদাতুল কারি গ্রন্থে এমনই অভিমতের কথা উল্লেখ করেছেন।[৭৮]

এ আলোচনার মাধ্যমেই হানাফি ও শাফিয়ি মাজহাবের অভিমত স্পষ্ট হয়ে যায়। আর হাম্বালি মাজহাবেরও একই অভিমত। যেমন : মুরদাবি রহ. উল্লেখ করেছেন—

يحرم تصوير ما فيه روح ولا يحرم تصوير الشجر ونحوه، والتمثال مما لا يشابه ما فيه روح، على الصحيح من المذهب........ ويحرم تعليق ما فيه صورة حيوان وستر الجدار به وتصويره على الصحيح من المذهب.

'মাজহাবের বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী কোনো জীবের ছবি বানানো হারাম। তবে যদি গাছ বা এ জাতীয় কোনো জড়বস্তুর ভাস্কর্য নির্মাণ করে

[৭৮] উমদাতুল কারি : খণ্ড : ১০, পৃষ্ঠা : ৩০৯।

তাহলে তা হারাম হবে না। বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী কোনো প্রাণীর ছবি টানানো কিংবা তা দ্বারা দেওয়ালে পর্দা হিসেবে ব্যবহার করা সম্পূর্ণ নিষেধ। কিংবা কোনো জীবের ছবি চিত্রায়ণ করা সম্পূর্ণ হারাম।[৭৯]

ইবনু কুদামা রহ. 'আল-মুগনি' গ্রন্থের সপ্তম খণ্ডের ৭ নং পৃষ্ঠায় এ অভিমতের কথাই উল্লেখ করেছেন।

ছবি বিষয়ে ইমাম মালিক রহ. থেকে বিভিন্ন মত পাওয়া যাওয়ার কারণে মালিকি মাজহাব অনুসারী আলেমদের মাঝেও এ বিষয়ে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। অবশ্য মালিকি মাজহাবের সকল বর্ণনা ও অভিমতেই ভাস্কর্যকে হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। কিন্তু কাগজ বা কাপড়ের ওপর চিত্রিত ছবি হারাম হওয়ার ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে। এ ব্যাপারে উবাই রহ. মুসলিম শরিফের ব্যাখ্যাগ্রন্থে উল্লেখ করেছেন—

واختلف في تصوير مالا ظل له فكرهه ابن شهاب في أي شيئ صور من حائط أو ثوب أو غيرهما وأجاز ابن القاسم تصويره فى الثياب لقوله فى الحديث الاتي، إلا رقما في ثوب.

'ছায়াহীন ছবির ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। ইবনু শিহাব রহ. 'মাকরুহ' বলেছেন। সেই ছবি দেওয়ালে টানানো হোক কিংবা কাপড়ের ওপর হোক বা অন্য কোনো জিনিসের ওপরই হোক। তবে ইবনু কাসেম রহ. শুধু ওই ছবিকে জায়েজ বলেছেন যা কোনো কাপড়ের ওপর চিত্রিত। কারণ, হাদিসের বর্ণনায় [إلا رقما في ثوب] এ জাতীয় ছবির অনুমতি পাওয়া যায়।[৮০]

এমনিভাবে মুআউওয়াক রহ. ইবনু আরাফা রহ. থেকে ছবি হারামের হুকুম শুধু ভাস্কর্য জাতীয় প্রতিকৃতির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হিসেবে বর্ণনা করেছেন।[৮১]

দারদির রহ. বলেন—

والحاصل أن تصاوير الحيوانات تحرم إجماعا إن كانت كاملة لها ظل مما يطول إستمراره، بخلاف ناقص عضو لا يعيش به لو كان حيوانا،

---

[৭৯] আল-ইনসাফ : মুরদাবি রচিত : খণ্ড : ১ পৃষ্ঠা : ৪৭৪।

[৮০] আল্লাম উবাই রহ. রচিত শরহু মুসলিম : খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৩৯৪।

[৮১] আত তাজুল ইকলিল : খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৪।

وبخلاف ما لا ظل له كنقش في ورق أو جدار، وفيما لا يطول إستمراره (كما لو كانت من نحو قشر بطيخ) خلاف، والصحييح حرمته.

'সারকথা হলো, যদি প্রাণীর ছবি পূর্ণাঙ্গ ও ছায়াযুক্ত (ভাস্কর্য) হয় তাহলে তা সর্বসম্মতভাবে হারাম। তবে এর বিপরীত হুকুম—ছবি যদি এমন অসম্পূর্ণ হয়, যদি তা বাস্তবেই প্রাণী হতো তাহলে অসম্পূর্ণতার কারণে জীবিত থাকা অসম্ভব হতো। এবং ছবি যদি এমন ছায়াহীন হয় যেমন কাগজ বা দেওয়ালের ওপর কোনো প্রাণীর নকশা (আঁকা চিত্র)। অবশ্যই ওই ছবি যা স্থায়ী নয় (যেমন : তরমুজের বাকল দ্বারা বানানো ছবি কিংবা মরুভূমির বালু দ্বারা বানানো ছবি), এমন ছবির ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। তবে সঠিক অভিমত হলো, এ ধরনের ছবিও হারাম।[৮২]

মালিকি মাজহাবের গ্রন্থাবলির বিশ্লেষণ করলে এ কথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মাণ হয় যে, তাদের অধিকাংশ আলেম ছবি নিষিদ্ধ হওয়ার পক্ষে। যদিও তা ছায়াহীন হয়।

এ প্রসঙ্গে ইমাম খারাসি রহ. লেখেন—

قال في التوضيح : التمثال إذا كان لغير حيوان كالشجر حائز وإن كان لحيوان فماله ظل ويقيم فهو حرام باجماع، وكذا يحرم وإن لم يقم كالعجين خلافا لأصبغ وما لا ظل له إن كن غير ممتهين فهو مكروه، وإن كان ممتهن فهو مكروه وإن كان ممتهنا فتركه أولي.

'ইমাম খারাসি রহ. 'তাওজিহ' গ্রন্থে বলেন, যদি কোনো প্রাণহীন বস্তুর ছবি হয়। যেমন : গাছ, তাহলে তা জায়েজ। আর যদি প্রাণীর প্রতিকৃতি হয় তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে তা হারাম। তবে যদি অস্থায়ী কোনো বস্তু দ্বারা বানানো হয়। যেমন : আটার খামিরা তবুও তা হারাম। আসবাগ রহ. এ ক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। আর যদি ছায়াহীন কোনো প্রতিকৃতি হয় এবং কোনো নিকৃষ্ট স্থানে না হয় তাহলে তা মাকরুহ। আর যদি তা কোনো নিকৃষ্ট স্থানে হয় তাহলে সেটি পরিহার করা উত্তম।[৮৩]

দারদির রহ. 'শরহুল কাবির গ্রন্থে এমনটিই উল্লেখ করেছেন।[৮৪]

---

[৮২] শরহু সগির গ্রন্থের সাবি রহ. কৃত টিকা, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৫০১।

[৮৩] খারাসি আলা মুখতাসিরিল খালিল : খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৩০৩।

[৮৪] দুসুকি, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৩৮, আজ-জারকানি আলা মুখতাসিরিল খালিল, খণ্ড :

সারকথা হলো, দেহবিশিষ্ট (ভাস্কর্য) ছবি বানানো চার ইমামের মতে সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। আর যদি দেহবিশিষ্ট না হয়, তাহলে তিন ইমামের এক অভিমত অনুযায়ী তা হারাম। অবশ্য অধিকাংশ মালিকি মাজহাবের অনুসারী আলেমদের উত্তম ও গ্রহণযোগ্য অভিমত হলো, এমন ছবিও মাকরুহ। কিন্তু কতিপয় মালিকি আলেমের কাছে তা জায়েজ।

যেমন : ফকিহগণ দেহহীন প্রতিকৃতি জায়েজ হওয়ার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তাদের দলিল হলো, বুসর ইবনু সাইদ রহ.-এর এ হাদিসটি—

أن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني حدثه ومع بسر عبيد الله الخولاني، أن أبا طلحة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، قال بسر : فمرض زيد بن خالد فعدناه فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير فقلت لعبيد الله الخولاني ، ألم يحدثنا فى التصاوير؟ قال أنه قال : إلا رقما في ثوب الم تسع؟ قلت: لا، قال : بلي قد ذكر ذلك.

'বুসর ইবনু সাইদ রহ. বর্ণনা করেন, জায়েদ ইবনু খালিদ জুহানি রহ. বর্ণনা করেন এবং বুসর এর সঙ্গে ওবাইদুল্লাহ খাওলানি রহ.-ও ছিলেন। আবু তলহা রা. বর্ণনা করেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ওই ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না যে ঘরে ছবি থাকে। বুসর ইবনু সাইদ রহ. বলেন, একবার খালিদ জুহানি রহ. অসুস্থ হয়ে গেলেন। আমরা তার সেবা করার জন্য তার কাছে হাজির হই। আমরা যে ঘরে ছিলাম সে ঘরে ছবিযুক্ত একটি পর্দা টানানো ছিলো। আমি ওবাইদুল্লাহ খাওলানি রহ.-কে বল্লাম, তিনি কি ছবি সংক্রান্ত হাদিস বর্ণনা করেননি? উবাইদুল্লাহ খাওলানি রহ. বলেন, তিনি এ কথাও বর্ণনা করেছেন—

إلا رقما في ثوب আপনি কি এই শব্দগুলো শোনেননি? আমি বল্লাম, না। তিনি বললেন, আপনি কেন শোনেননি, তিনিতো এ শব্দগুলো বলেছিলেন।[৮৫]

তিরমিজি শরিফেও এ হাদিসটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে—

৪, পৃষ্ঠা : ৫৩।

[৮৫] সহিহ মুসলিম : ৫৬৪০।

عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة انه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده، قال : فوجدت عنده سهل بن حنيف، قال : فدعا أبو طلحة إنسانا ينزع نمطا تحته فقال له سهل : لم تنزعه؟. قال : لأن في التصاوير وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما قد علمت، قال سهل : أولم يقل! إلا ما كان رقما فيه ثوب؟ فقال : بلي ولكنه أطيب لنفسي.

'ওবাইদুল্লাহ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু উতবা রহ. বর্ণনা করেন, তিনি আবু তলহা আনসারি রা.-এর সেবা-শুশ্রূষার জন্য তার কাছে যান। তিনি বলেন, সেখানে আমি সাহল ইবনু হানিফ রা.-কেও উপস্থিত পেলাম। তিনি বলেন, এসময় আবু তলহা আনসারি রা. কোনো এক ব্যক্তিকে ডেকে তাঁর নিচের চাদরটি বের করার জন্য বলেন। সাহল রা. তাকে বললেন, আপনি কেন তা বের করছেন? আবু তলহা রা. বলেন, তাতে ছবি রয়েছে। আর ছবির ব্যাপারে মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন তা অবশ্যই আপনি জানেন। সাহল রা. বলেন, নবিজি কি এ কথা বলেননি إلا رقما في ثوب? আবু তলহা রা. বলেন, নিশ্চয়ই বলেছেন। কিন্তু এটিকে বের করে দেওয়াটিই আমার কাছে উত্তম মনে হচ্ছে।[৮৬]

যেসব ফকিহ দেহহীন ছবি জায়েজ হওয়ার পক্ষে, তারা এ হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করে থাকেন যে, এ দুটি হাদিস দ্বারা এ কথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে গেলো যে, কাপড়ের ওপর চিত্রিত ছবি হারামের অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং এমন ছবি জায়েজ।

অধিকাংশ ফকিহ এই দুটি হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন—إلا رقما في ثوب-এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, কোনো গাছ বা প্রাণহীন বস্তুর ছবি। এ ব্যাখ্যার পক্ষে দলিল হলো—

دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه هتكه وتلون وجهه وقال يا عائشة! أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله.

'আয়শা রা. বর্ণনা করেন, একদিন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

[৮৬] তিরমিজি : হাদিস : ১৭৫০।

ওয়াসাল্লাম আমার ঘরে এলেন তখন আমার তাকটি একটি ছবিযুক্ত পর্দা দিয়ে ঢেকে রেখেছিলাম। যখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই পর্দা দেখতে পেলেন তখন তিনি তা ছিড়ে ফেলেন। তার চেহারা মোবারক বিবর্ণ হয়ে গেলো। তিনি বললেন, হে আয়শা! কেয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠিন শাস্তি ওই ব্যক্তির হবে যে আল্লাহর সৃষ্টির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ আচরণ করে।'

এ হাদিস দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়—কাপড়ের ওপর প্রাণীর ছবি যদি জায়েজই হতো তাহলে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই পর্দা ছিঁড়ে ফেলতেন না এবং আয়শা রা.-কে এত কঠিন ভাষায় তিরস্কার করতেন না। অথচ এটিও তো কাপড়েরই পর্দা ছিলো।

বর্তমান যুগের কিছু আধুনিক লোক এ দাবিও করে থাকে যে, ছবির নিষেধাজ্ঞা ইসলামের শুরুর যুগে ছিলো। কেননা, সেই যুগটি ছিলো জাহেলিয়াত ও মূর্তিপূজার যুগের একেবারেই নিকটবর্তী। মানুষের অন্তরে তখনো তাওহিদের বিষয়টি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কিন্তু মানুষের অন্তরে তাওহিদের আকিদা-বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে গেলো, তখন ছবি হারাম হওয়ার বিষয়টি রহিত হয়ে যায়। আধুনিক দাবিদারদের স্বপক্ষে কুরআন-সুন্নাহ-এর কোনো দলিল বিদ্যমান নেই। ছবির হুকুমটি যদি রহিত হয়ে যেতো তাহলে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিস্কারভাবে এ বিষয়ে ঘোষণা দিয়ে যেতেন এবং সাহাবিগণকে ছবির বিষয়ে নিষেধ করতেন না। ফকিহ সাহাবিগণ এমন ঘরে প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন, যে ঘরে ছবি রয়েছে। এসব ঘটনা সংঘটিত হয়েছে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর। এটিই অকাট্য প্রমাণ যে, ছবির ব্যাপারে এখনো হারাম হওয়ার ঘোষণা বহাল রয়েছে। কোনোভাবেই এই বিধানটি রহিত হয়নি। কীভাবেই বা এই হুকুমটি রহিত হতে পারে? যেখানে স্বয়ং আল্লাহর নবি এর কারণ উল্লেখ করে বলেছেন যে, এতে আল্লাহর সৃষ্টি-কার্যক্রমের সঙ্গে সাদৃশ্য অবলম্বন করা হয়। এই কারণটি তো এমন যা কোনো যুগের সঙ্গে নির্দিষ্ট নয় যে, এই যুগে তা পাওয়া যাবে আর ওই যুগে তা পাওয়া যাবে না।

ইবনু দাকিকুল ইদ রহ. উল্লেখ করেছেন—

ولقد أبعد غاية البعد من قال : إن ذلك محمول على الكراهة وأن التشديد كان في ذلك الزمان لقرب عهد الناس بعبادة الاوثان،

وهذا الزمان حيث انتشر وتمهدت قواعده فلا سياوربه في هذا التشديد...... وهذا القول عندنا باطل قطعا لأنه قد ورد فى الأحاديث ولأخبار عن أمر الاخرة بعذاب الموصورين وانهم يقال لهم : إحيوا ما خلقتم، وهذه علة مخالفة لما قاله هذا القائل، وقد صرح بذلك في قوله عليه السلام، المشبهون بخلق الله وهذه علة عامة مستقبلة مناسبة ولا تخص زمانا دون زمان، وليس لنا ان نتبصرف فى النصوص المتظاهرة المتضافرة بمعني خيالي.

'যারা ছবি 'হারাম' হওয়ার বিষয়টিকে 'মাকরুহ'-এর কাতারে এনে হালকা হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং যুক্তি হিসেবে এ কথা বলেছেন যে, হারাম হওয়ার বিষয়টি তৎকালীন যুগের জন্যে ছিলো, যখন ইসলামের সূচনাকাল ছিলো। কেননা, তৎকালীন যুগটি ছিলো মূর্তিপূজার একেবারেই কাছাকাছি যুগ। (তাই এ থেকে বিরত রাখার জন্য মূর্তি বা এ জাতীয় যা আছে সবগুলোর ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে)। আর এখন ইসলামের প্রচার-প্রসার ব্যাপক হয়েছে এবং ইসলামের বিধিবিধানও সহজ হয়েছে। তাই এখন আর সেই কঠোরতার কারণ অবশিষ্ট নেই।'

আমরা বলবো, তারা মূলত এই খোঁড়াযুক্তি দাঁড় করিয়ে ইসলামের বিধান সহজায়নে সাহায্য করছে। অথচ তা বাস্তবতা থেকে বহুদূরে অবস্থান করছে। আর আমাদের কাছে এই অভিমত চূড়ান্তভাবে বাতিল হিসেবে পরিগণিত হবে। কারণ, হাদিস ও বিভিন্ন বর্ণনায় ছবি নির্মাতাদের ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে। কেয়ামতের দিন ছবি নির্মাতাদের সবচেয়ে কঠিন শাস্তি হবে। ছবি নির্মাতাদের উদ্দেশ্যে বলা হবে, তোমরা যা বানিয়েছো তাতে জীবন দান করো। সুতরাং আধুনিকতার দাবিদারদের সঙ্গে এই কারণটি একেবারেই বিপরীত বলে মনে হয়। এছাড়া যে হাদিসে স্পষ্টভাষায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উল্লেখ করেছেন المشبهون بخلق الله 'ছবি নির্মাতা আল্লাহর সঙ্গে সাদৃশ্য অবলম্ব করে'। এই কারণটি ব্যাপক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এটি স্বতন্ত্র এবং যথাযথ একটি কারণ। কেননা, এটি একটি স্পষ্ট কারণ।[৮৭]

ইবনু দাকিকুল ইদ রহ.-এর উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আহমাদ শাকের

[৮৭] শরহুল উমদাহ : খণ্ড : ১ পৃষ্ঠা : ১৭৬।

রহ. বলেন—

هذا ما قاله ابن دقيق العيد منذ أكثر من ٦٧٠ سنة، يرد على قوم تلاعبوا بهذه النصوص في عصره أو قبل عصره، ثم يأتي هؤلاء المفتون المضلون واتباعهم المقلدون الجاهلون أو الملحدون الهدامون، يعيدونها جزعة ويلعبون بنصوص الاحاديث كما لعب اولئك من قبل، ثم كان من أثر هذه الفتاوي الجاهلة إن ملئت بلادنا بمظاهر الوثنية كاملة فنصبت التماثيل وملئت بها البلاد تكريما لذكري من نسبت إليه وتعظيما........ وكان من أثر هذه الفتاوي الجاهلة ان صنعت الدولة وهي تزعم أنها دولة إسلامية في أمة إسلامية ما سمته مدرسة الفنون الجميلة أو كلية الفنون الجميلة صنعت معهدا للفجور الكامل الواضح، ويكفي للدلالة على ذلك أن يدخله الشبان الماجنون من الذكور والاناث إباحيين مختلطين، لا يرودهم دين ولا عفاف ولا غيرة، يصورون فيه الفواجر من الغائيات اللاتي لا يستحيين ان يقفن عرايا ويجلس عرايا ويضطجعن عرايا....... ثم يقولون لنا هذا فن، لعنهم الله ولعن من رضي هذا منهم أو سكت عليه.

‘এ আলোচনাটি—যা ইবনু দাকিকুল ইদ ৬৭০ বছরেরও বহু আগে করেছেন—মূলত তিনি এর মাধ্যমে এমন একটি দলের বিরূদ্ধে এমন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন, যারা তার যুগে অথবা তারও আগের যুগে রাসুল সা. এর ভাস্কর্য বিষয়ক হাদিস নিয়ে খেল-তামাশায় লিপ্ত হয়েছিলো। তারপর ওই সকল পথভ্রষ্ট-ফতোয়াবাজ মুফতিরা—যাদের অনুসরণ করে ধ্বংসাত্মক নাস্তিকেরা অথবা অজ্ঞ অনুসারীরা—তারা এসে আগের লোকদের মতোই একই কাজের পুনরাবৃত্তি করলো এবং ভাস্কর্য বিষয়ক হাদিস নিয়ে খেল-তামাশায় লিপ্ত হলো যেভাবে লিপ্ত হয়েছিলো তাদের পূর্বের বিভ্রান্ত লোকেরা। এরপর এই মূর্খতাপূর্ণ ফতোয়াগুলোর প্রভাবে আমাদের দেশ পৌত্তলিকতার প্রকাশস্থলে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিলো এবং এর ফলে বহু মূর্তি স্থাপন করা হয়। এবং দেশের বহু জায়গায় তাদের স্মরণে ও সম্মান প্রকাশের লক্ষ্যে এসব মূর্তি স্থাপন করা হয়। এই অজ্ঞতাপূর্ণ ফতোয়ার প্রভাবে, তথাকথিত ইসলামি রাষ্ট্র (যেগুলোকে মুসলিম উম্মার জন্য ইসলামি রাষ্ট্র মনে করা হয়) স্কুল অফ ফাইন আর্টস বা চারুকলা কলেজ নামে প্রতিষ্ঠান তৈরি

করেছিলো, যেটি মূলত সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট অনৈতিকতার জন্যই তৈরি করা হয়েছিলো। এর জন্য এতটুকু প্রমাণই যথেষ্ট যে তাতে উন্মাদ যুবক-যুবতীরা একসঙ্গে অনায়াসে প্রবেশ করতে পারতো। যারা দীন-ধর্ম ও সতিত্বকে প্রাধান্য দিতো না। তারা তাতে এমন অসৎ নারীদের চিত্র অঙ্কন করতো যারা উলঙ্গ হয়ে দাঁড়াতে, বসতে, শুতে লজ্জাবোধ করতো না। তারপর তারা আমাদেরকে বলতো এটি একটি শিল্প। মহান আল্লাহ্ তাদেরকে অভিশাপ দিন এবং যারা তাদের এমন কৃতকর্মে সন্তুষ্ট থাকে অথবা চুপ থাকে তাদেরও অভিশাপ দিন।'

'কিছু আধুনিকতার দাবিদার ছবি জায়েজ হওয়ার ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের এ আয়াত দ্বারা দলিল দিয়ে থাকেন। যা সুলাইমান আ. এর ঘটনা প্রসঙ্গে নাজিল হয়েছে—

﴿يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ﴾

'তিনি যা চাইতেন, জিন জাতি তার জন্য তাই তৈরি করে দিতো। সুরম্য প্রাসাদ, (নানান রকমের) ভাস্কর্য, (বড়ো বড়ো) পুকুরের মতো থালা এবং চুলোর ওপর স্থাপন করার জন্য বৃহদাকারের ডেগ।'[৮৮]

আধুনিকতার দাবিদাররা এ আয়াত দিয়ে দলিল পেশ করে বলে থাকেন যে, এ আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, জিনেরা সুলাইমান আ.-এর জন্য মূর্তি তৈরি করতো। মহান আল্লাহ্ এ বিষয়টিকে পরোক্ষভাবে নেয়ামত হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মূর্তি বানানো হারাম নয়।

প্রকৃতপক্ষে তাদের এই দলিল দু-কারণে সঠিক ও গ্রহণযোগ্য নয়। প্রথম কারণ হলো, অভিধানে تَمَاثِيلَ প্রত্যেক ওই ছবিকে বলা হয় যা অন্য কোনো বস্তুর আকৃতিতে নির্মিত হয়। যেমন : লিসানুল আরবসহ অন্যান্য অভিধানে স্পষ্ট ভাষায় এ কথাটি উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং এমনটির সম্ভাবনাও রয়েছে যে, ওইসব تَمَاثِيلَ ছবি বা ভাস্কর্য যা জিনেরা সুলাইমান আ. এর জন্য তৈরি করতো তা মূলত প্রাণহীন বস্তুর ছবি ছিলো।

যেমন : আল্লামা জামাখশারি রহ. রচিত 'তাফসিরে কাশশাফ' গ্রন্থে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন—

---

[৮৮] সুরা সাবা : আয়াত : ১৩।

ويجوز أن يكون غير صور الحيوان كصور الاشجار وغيرها، لأن التمثال كل ما صور على مثل صورة غيرهمن حيوان أو غير حيوان.

'এই সম্ভাবনাও রয়েছে যে, জিনেরা সুলাইমান আলাইহিস সালামের জন্য যে ছবি বা ভাস্কর্য বানাতো তা ছিলো প্রাণহীন বস্তু। যেমন : গাছ, ইত্যাদির ছবি। কারণ, যা অন্য কোনো বস্তুর আকৃতিতে নির্মাণ করা হয়, এমন যে-কোনো ছবিকে তামাসিল বলা হয়। সেটি প্রাণীর আকৃতিতে হোক কিংবা প্রাণহীন কোনো বস্তুর আকৃতিতে নির্মাণ করা হোক। আর এর স্বপক্ষে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থ 'তাওরাত' থেকেও উদ্ধৃতি পাওয়া যায়। সেখানেও প্রাণী ভাস্কর্যকে হারাম বলা হয়েছে। এমনকি বর্তমানে আমাদের হাতে বিকৃত তাওরাত রয়েছে, তাতেও এই হুকুমটিই বিদ্যমান রয়েছে। 'সফরুল খুরুজ' গ্রন্থে যেমন বলা হয়েছে—

لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما مما فى السماء من فوق وما فى الارض من تحت وما فى الأرض من تحت الارض.

'আপনার জন্য কোনো অংকিত ছবি-ভাস্কর্য বানানো হবে না। এমন কোনো বস্তুরও নয়, যার অবস্থান আকাশের উপরে। এমন কোনো বস্তুরও নয়, যার অবস্থান জমিনের তলদেশে। পানিতে।

এ প্রসঙ্গে 'সফরুত তাসনিয়া' গ্রন্থের ভাষ্য হলো—

لئلا تفسدوا وتعملوا لأنفسكم تمثالا منحوتا صورة مثال ما شبه ذكر أو أنثي، شبه بهيمة ما مما فى الأرض، شبه طيرا ما ذي جناح مما يطير فى السماء شبه ديب ما على الأرض، شبه سمك ما مما فى الماء من تحت الارض.

'যেন তোমরা ঝগড়া-ফাসাদ সৃষ্টি না করো, (এভাবে যে) তোমরা নিজের জন্য এমন ছবি-ভাস্কর্য নির্মাণ করো, যা কোনো পুংলিঙ্গ বা স্ত্রীলিঙ্গের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। কিংবা এমন চতুষ্পদ জন্তুর সঙ্গে যা জমিনের ওপর বসবাস করে। অথবা এমন পাখির সঙ্গে যা ডানা-বিশিষ্ট হয় এবং আকাশে বিচরণ করে। কিংবা জমিনের ওপর বিচরণ করে কিংবা জমিনের নিচে পানিতে সাঁতার কাটে, যা মাছের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়।[৮৯]

[৮৯] সফরুত তাসনিয়া : খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ১৮৬।

এটি প্রসিদ্ধ কথা যে, সুলাইমান আ. তাওরাতের অনুসারী ছিলেন। তাই এ কথা স্বীকার করা কষ্টকর যে, সুলাইমান আ. এমন ছবি বানানোর নির্দেশ দেবেন যা তাওরাতে হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। সুতরাং এটি দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, সুলাইমান আ. জিনদেরকে যে ছবি বানানোর নির্দেশ দিয়েছেন তা মূলত প্রাণহীন বস্তুর ছবি। যেমন : গাছ, ফুল, মনোরম দৃশ্য, ইত্যাদির ছবি।

উল্লিখিত আয়াত থেকে তাদের দলিল সঠিক না হওয়ার দ্বিতীয় কারণ হলো, যদি এ কথা মেনেও নেওয়া হয় যে, সুলাইমান আ. জিনদেরকে প্রাণীর ছবি বানানোর অনুমতি দিয়েছেন। তবুও এ ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো, পূর্ব-শরিয়ত দ্বারা এমন জিনিসের প্রমাণ উত্থাপন করা সঠিক নয়, যে ব্যাপারে আমাদের শরিয়ত তার বিপরীত নির্দেশ প্রদান করে। আপনারা ইতোপূর্বে অবশ্যই জেনেছেন, মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছবি-ভাস্কর্যের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। আর তা আমাদের জন্য দলিল বা হুজ্জত। ‘মহান আল্লাহ বলেন—

﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾

‘তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আমি বিশেষ শরিয়ত এবং বিশেষ পথ ও পদ্ধতি নির্দিষ্ট করে দিয়েছি।’[৯০]

ক্যামেরার ছবি বা ফটোগ্রাফির বিধান

ক্যামেরার ছবি যাকে বর্তমান পরিভাষায় ফটোগ্রাফিও বলা হয়। এ জাতীয় ছবির কী বিধান? হাতে বানানো ছবির মতোই কি ফটোগ্রাফি ছবির বিধান? না তার ভিন্ন কোনো বিধান রয়েছে? এ বিষয়ে সমকালীন আলেমগণের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন : মিশরের প্রখ্যাত মুফতি শায়খ বুখাইত রহ. ‘আলজাওয়াবুশ শাফি ফি ইবাহাতিত তাসবিরিল ফুতুগ্রাফি’ নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। সেই গ্রন্থে তিনি বলেন, ফটোগ্রাফি মূলত ছায়া ধারণ ও সংরক্ষণের একটি বিশেষ পদ্ধতি। এ পেশায় যারা বিশেষজ্ঞ তারা বিশেষ পদ্ধতিতে ছায়া ধারণের একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। এটি মূলত ওই ছবির অন্তর্ভুক্ত নয়, যা শরিয়ত নিষেধ করেছে। কারণ, নিষেধাজ্ঞা তো সেই ছবির ক্ষেত্রে যা ইতোপূর্বে ছিলো না। বাস্তবে যে ছবির ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, তাতে কোনো প্রাণীর সাদৃশ্য

[৯০] সুরা মায়িদা : আয়াত ৪৮।

থাকবে। যাকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। আর এ বিষয়টি ফটোগ্রাফিতে বিদ্যমান নেই। তবে আরব-বিশ্বের অসংখ্য আলেম এবং হিন্দুস্তানের আলেমগণ কিংবা তাদের বিশাল একটি অংশ এই ফতোয়া দিয়েছেন যে, ক্যামেরা ও হাতে বানানো ছবির মাঝে কোনো পার্থক্য নেই।

আরব-বিশ্বের বর্তমান সময়ের কোনো কোনো আলেমের উদ্ধৃতি থেকে এ বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে যাবে। তাই এখানে বেশকিছু আলেমের উদ্ধৃতি তুলে ধরা হলো। শায়খ মোস্তফা আল-হাম্মামি রহ. তার 'আননাহদাতুল ইসলাহিয়া' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন—

وإني أحب أن تجرم الجزم كله أن التصوير بآلة التصوير (الفوتوغراف) كالتصوير باليد تماما فيحرم على المؤمن تسليطها للتصوير ويحرم عليه تمكين مسلطا لالتقاط صورته بها، لأنه هذا التمكين يعين على فعل محرم غليظ وليس من الصواب في شيئ ما ذهب اليه أحد علماء عصرنا هذا من استباحة التصوير بتلك الآلة تحجة أن التصوير ما كان باليد والتصوير بهذه الآلة لا دخل لليد فيه فلا يكون حراما! وهذا عند أشبه بمن يرسل أسدا مفترسا فيقتل من يقتل أو يفتح تيارا كهربائيا بعدم كل من مر به أو يضع سما في طعام فيهلك كل من تناول من ذلك الطعام فإذا وجه اليه إتهام بالقتل قال : أنا لم أقتل، إنما قتل السم والكهرباء والأسد.

'আমি এ বিষয়টি পছন্দ করি যে, সবাই এর ওপর নিশ্চিত হয়ে যাক যে, ক্যামেরার মাধ্যমে তোলা ছবি, একেবারে হাতে অঙ্কন করা ছবির মতো। সুতরাং ছবি তোলার জন্য কোনো মুমিনের জন্য এটি ব্যবহার করা একেবারে হারাম। এমনিভাবে অন্যকে নিজের ছবি তোলার সুযোগ দেওয়াও হারাম। কারণ, ছবি তোলার সুযোগ দেওয়া একটি চূড়ান্ত হারাম কাজে সহযোগিতার অন্তর্ভুক্ত। বর্তমান যুগে কোনো কোনো আলেম ক্যামেরার মাধ্যমে ছবি তোলা জায়েজ হওয়ার পক্ষে যে দলিল পেশ করে থাকেন যে, 'ছবি তাকেই বলা হয়, যা হাতের মাধ্যমে অঙ্কন করা হয়। আর যে ছবি যন্ত্রের সাহায্যে তোলা হয় তাতে হাতের কোনো দখলদারত্ব থাকে না। সুতরাং তা হারাম নয়।'ওই আলেমের এই দাবি কোনোভাবেই সঠিক ও গ্রহণযোগ্য নয়। আমার কাছে এই খোড়া

যুক্তির উদাহরণ এমন মনে হয় যে, কোনো ব্যক্তি ক্ষুধার্ত বাঘ ছেড়ে দিলো। আর সেই বাঘ ছাড়া পেয়ে কাউকে হত্যা করলো। কিংবা কোনো ব্যক্তি সংযোগসহ বিদ্যুতের তার চলাচলের পথে ফেলে রাখলো, সেই তারের স্পর্শে কেউ মারা গেলো। কিংবা কোনো ব্যক্তি খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দিলো। আর সেই খাবার খেয়ে কোনো লোক মারা গেলো। পরবর্তীকালে যখন ওই মানুষ হত্যার দায়ে তাকে অভিযুক্ত করা হলো, তখন সে বললো, আমি তো হত্যা করিনি। বরং তাকে তো হত্যা করেছে বাঘ, বিদ্যুৎ কিংবা বিষ।'[৯১]

শায়খ নাসিরুদ্দিন আলবানি রহ. তাঁর [آداب الزفاف] 'আদাবুজ জুফাফ' গ্রন্থে লেখেন—

وقريب من هذا تفريق بعضهم بين الرسم وبين تصوير الشمسي، يزعم أنه ليس من عمل الإنسان! وليس من علمه فيه إلا إمساك الظل فقط كذا زعموا، أما ذلك الجهد الجبار الذي صرفه المخترع لهذه الآلة حتى استطاع أن يصورفي لحظة ما لا يستطيعه بدونها في ساعات، فليس من عمل الانسان عند هؤلاء! وكذلك توجيه المصور للآلة وتسديدها نحو الهدف المراد تصويره، وقيل ذلك ما يسمونه بالفلم ثم بعد ذلك تحميضه وغير ذلك مما لا أعرفه فهذا أيضا ليس من عمل الانسان عند اولئك أيضا...... وثمرة التفريق عندهم أنه يجوز تعليق صورة رجل مثلا فى البيت إذا كانت مصورة بالتصوير الشمسي، ولا يجوز إذا كانت مصورة باليد! اما أنا فلم ار له مثلا إلا جمود بعض اهل الظاهر قديما مثل قول أحدهم في حديث : نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول فى الماء الراكد، قال : فالنهي عنه هو البول فى الماء مباشرة أما لو بال في إناء ثم أراقه فى الماء فليس منهيا عنه.

'কেউ কেউ (উপরে) বর্ণিত পার্থক্যের কাছাকাছিই হাতে অঙ্কিত ছবি এবং ফটোগ্রাফির পার্থক্য উল্লেখ করেছেন। তাদের ধারণা হলো, ক্যামেরার মাধ্যমে তোলা ছবি তথা ফটোগ্রাফিতে মানুষের কোনো হস্তক্ষেপ নেই। এতে শুধু মানুষের কাজ এটুকু যে, সে একটি ছায়াকে

[৯১] আননাহদাতুল ইসলাহিয়া, পৃষ্ঠা : ২৬৪-২৬৫।

আটকে দিয়েছে। এত গেলো তাদের ধারণা। অন্যথায় আবিষ্কারক ক্যামেরা আবিষ্কারে কতো মেধা শ্রম ও চেষ্টা প্রচেষ্টা চালিয়েছে। যার ফলশ্রুতিতেই মানুষ মুহূর্তের মধ্যে ফটো ওঠাতে সক্ষম হচ্ছে। অথচ ক্যামেরা ছাড়া কয়েক ঘন্টা চেষ্টা করেও তা সম্ভব ছিলো না। এত কিছুর পরও ওই ব্যক্তির এ দাবি করা যে, এতে মানুষের কোনো হস্তক্ষেপ নেই। কোন্ যুক্তিতে কেউ এমন দাবি করতে পারে তা আমার কাছে বোধগম্য নয়। ছবি তোলার ক্ষেত্রে ফটোগ্রাফারের ভূমিকা অধিক—প্রস্তুতি, যার ফটো তোলা হবে তার দিকে যথাযথভাবে তাক করা, ক্যামেরার ভেতর ফিল্ম লাগানো, ইত্যাদি। তাছাড়া আরও এমন কাজ রয়েছে যা আমার জানা নেই, সেই কাজগুলো কি এসব ব্যক্তির কাছে কোনো মানুষের কার্যক্রম হিসেবে বিবেচ্য নয়? তাদের কাছে এই দুই ধরনের ছবির পার্থক্যের ফলাফল এই হবে যে, কোনো মানুষের ক্যামেরাবন্দি ছবি ঘরে টানানো জায়েজ হবে কিন্তু হাত দিয়ে বানানো ছবি টানানো জায়েজ হবে না। আমি তো তাদের এই চিন্তাধারাকে প্রাচীন যুগের 'আহলে জাহের'-এর চিন্তাধারার সমতুল্য মনে করি। যেসব আহলে জাহের বলে যে, হাদিস শরিফে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্থির পানিতে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন। নির্দেশটি মূলত সরাসরি পানির ভেতরে পেশাব করতে নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং কোনো ব্যক্তি যদি কোনো পাত্রে পেশাব করে এবং পাত্রে সংরক্ষিত পেশাব পানিতে প্রবাহিত করে দেয়, তাহলে ওই বিষয়টি তো হাদিসে নিষিদ্ধ নয়।'[৯২]

শায়খ মুহাম্মাদ আলি আসসাবুনি রহ. তার حكم الاسلام فى التصوير কিতাবে লেখেন—

إن التصوير الشمسي لا يخرج عن كونه نوعا من أنواع التصوير فما يخرج بالآلة يسمي صورة والشخص مصورا فهو وإن كان لا يشمله النص الصريح لأنه ليس تصويرا باليد وليس فيه مضاهاة لخلق الله إلا أنه لا يخرج عن كونه ضربا من ضرب التصوير، فينبغي أن يقتصر في الإباحة على حد الضرورة.

'ছবির প্রকারসমূহের মাঝে ফটোগ্রাফিও এক প্রকারের ছবি। এজন্যই

[৯২] আদাবুজ জুফাফ : আলবানি রচিত।

তো ক্যামেরার মাধ্যমে যে ছবি তোলা হয় তাকেও ছবি বলা হয়। আর যিনি ছবি তোলেন তাকে ‘ফটোগ্রাফার’ বলা হয়। সুতরাং শরিয়তের সুনির্দিষ্ট দলিলের মাধ্যমে যদিও এটি হাতে অঙ্কিত ছবির মধ্যে গণ্য নয়, এবং তাতে মহান আল্লাহর সৃষ্টির সঙ্গে সাদৃশ্যতার অনুপস্থিতিও থাকে তবুও এটিকে ছবির প্রকার থেকে বাদ দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। সুতরাং একান্ত প্রয়োজনের ভিত্তিতে এটিকে বৈধ বলা যেতে পারে।’

শায়খ সাইদ রমাদান আলবুতি রহ. তার فقه السيرة গ্রন্থে উল্লেখ করেন—

والحق أنا لا ينبغي تكلف أي فرق بين أنواع التصوير المختلفة حيطة في الأمر ونظرا لإطلاق الحديث هذا فيما يتعلق بالتصوير، أما الإتخاذ فلا فرق بين الفوتو غرافي وغيره.

‘বিশুদ্ধ কথা হলো, হাদিসের শব্দের ব্যাপকতার প্রতি লক্ষ্য করে এবং হুকুমকে ব্যাপকতর করার লক্ষ্যে ছবিকে বিভিন্ন প্রকারে পার্থক্যের অপচেষ্টা করা উচিত হবে না। শরিয়তের এই হুকুম সব ছবির ক্ষেত্রেই। আর চিত্র গ্রহণের বিষয়টি হতে পারে ক্যামেরাবন্দি করার মাধ্যমে কিংবা হাতে অঙ্কন করার মাধ্যমে। তাতে পার্থক্য সৃষ্টির কোনো সুযোগ নেই।’[১৩]

প্রকৃত সত্য হলো, চিত্রণ ও অঙ্কনের মাধ্যমে নির্মিত ছবি এবং ক্যামেরার মাধ্যমে তোলা ছবির মাঝে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। আর যেটুকু পার্থক্য রয়েছে তার মজবুত কোনো ভিত্তি নেই। শরিয়তের মূলনীতি হলো, যে জিনিস মৌলিকভাবে হারাম এবং শরিয়ত অসমর্থিত, তা যন্ত্র কিংবা মাধ্যম পরিবর্তনের কারণে তার হুকুম পরিবর্তন হয় না। যেমন : শরাব (মদ) হারাম। হতে পারে সেটি হাতে প্রস্তুত করা হয়েছে। কিংবা এমনও হতে পারে যে, এটি আধুনিক মেশিনের সাহায্যে প্রস্তুত করা হয়েছে। অথবা হত্যা করা হারাম। এই হত্যা চাকু বা ছুরির সাহায্যে সংঘটিত হতে পারে আবার বন্দুকের গুলির সাহায্যেও সংঘটিত হতে পারে। সবক্ষেত্রেই এগুলো হারাম। ছবির বিষয়টি ঠিক এমনই। শরিয়ত ছবি তৈরি করা অথবা সংরক্ষণ করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। সুতরাং ছবির নির্মাতা এই ছবি তুলির সাহায্যে করুক কিংবা ক্যামেরার মাধ্যমে তৈরি করুক তাতে হুকুমে কোনো তারতম্য হবে না। মহান আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

---

[১৩] ফিকহুস সিরাত : পৃষ্ঠা : ৩৮০।

প্রয়োজনের সময় ছবি তোলা

ইসলামি শরিয়তে ছবির প্রকৃত বিধান কী? এ বিষয়ে আমরা ইতোপূর্বে বিশদ আলোচনা করেছি। কিন্তু বিশেষ কোনো প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ছবি তোলা। যেমন : পাসপোর্টের জন্য বা ভিসা লাভের জন্য অথবা ন্যাশনাল পরিচিতি কার্ড সংগ্রহের ক্ষেত্রে কিংবা এমন কোনো প্রয়োজনে যেখানে মুখমণ্ডল সনাক্ত করার প্রয়োজন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এ জাতীয় নিতান্ত প্রয়োজনে ছবি তোলার অনুমতি দেওয়া উচিত বলেই মনে হয়। কারণ, ফকিহ্গণও প্রয়োজনের সময় হারাম হওয়ার হুকুমটি শিথিল হিসেবে গণ্য করেছেন। এ প্রসঙ্গে ইমাম মুহাম্মাদ রহ. 'সিয়ারুল কাবির' গ্রন্থে লেখেন—

وإن تحققت الحاجة له إلى إستعمال السلاح الذي فيه تمثال فال بأس بإستعماله.

'কারও যদি এমন কোনো বস্তু ব্যবহারের প্রয়োজন হয় যাতে কোনো ছবি অঙ্কিত আছে তাহলে তা ব্যবহারে কোনো সমস্যা নেই।'

ইমাম সারাখসি রহ. এই ভাষ্যের প্রেক্ষিতে তার ব্যাখ্যাগ্রন্থে লেখেন—

لأن مواضع الضرورة مستثناة من الحرمة كما في تناول الميتة.

'কারণ, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে 'হারাম'-এর হুকুম রহিত হয়ে যায়। যেমন : প্রয়োজনের সময় মৃতপ্রাণী আহার করা।'[৯৪]

ইমাম সারাখসি রহ. এটিও বলেছেন—

إن المسلمين يتبايعون بدراهم الأعاجم فيها التماثيل بالتيحان ولا يمنع أحد عن المعالمة بذلك.

'নিশ্চয়ই অনারবি মুসলিম এমন টাকা-পয়সার মাধ্যমে কেনা-বেচা করে থাকে, যেসব টাকা-পয়সায় মুকুট পরিহিত রাজা-বাদশাহ্-এর ছবি অঙ্কিত থাকে। এসব টাকা-পয়সার মাধ্যমে লেনদেন করাকে কেউ নিষেধ করে না।[৯৫]

অন্য এক স্থানে তিনি আরও লেখেন—

---

[৯৪] শরহুস সারাখসি : খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৭৮।

[৯৫] শরহুস সারাখসি : খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৭৮।

ولا بأس يحمل الرجل في حال الصلاة دراهم العجم وإن كان فيها تمثال الملك على سريره وعلي تاجه.

'মানুষের জন্য আজমিদের (অনারবিদের) টাকা-পয়সা সঙ্গে নিয়ে নামাজ আদায়ে কোনো সমস্যা নেই। যদিও সেই টাকা-পয়সায় সিংহাসনে আরোহিত কোনো বাদশাহ-এর ছবি থাকে।'[৯৬]

সহিহ্ হাদিসের মাধ্যমে এ কথা প্রমাণিত যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়শা রা.-কে কাপড়ের পুতুল দিয়ে খেলাধুলার অনুমতি দিয়েছেন। এছাড়া ফকিহ্গণও সাক্ষ্য দেওয়ার সময় নারীদেরকে তাদের চেহারা খোলার অনুমতি দিয়েছেন।

টিভি ও ভিডিও

টিভি ও ভিডিওর ক্ষেত্রে এ কথা নির্দ্বিধায় ও নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, নব আবিষ্কৃত এই দুটির মাধ্যমে অসংখ্য নিষিদ্ধ অপকর্মের প্রচার হচ্ছে এবং নিষিদ্ধ কার্যক্রমের সয়লাব বইয়ে দেওয়া হচ্ছে। বেহায়াপনা, অশ্লীলতা, নারীদের সাজগোজ করিয়ে প্রায় বিবস্ত্র করে উত্থাপন করা হচ্ছে। এছাড়াও সীমাহীন অপসংস্কৃতি ও নোংরামির মাধ্যমে পুরো পৃথিবীর পরিবেশকে চরমভাবে দূষিত করা হচ্ছে। অপকর্ম ও নোংরামির বীজ বপন করা হচ্ছে। এ বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে এ দুটো যন্ত্র ব্যবহার নিঃসন্দেহে হারাম। কিন্তু যন্ত্র দুটো যদি বর্ণিত দোষগুলো থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রেখে কেউ ব্যবহার করে তাহলে কি এ দুটোর মাধ্যমে প্রদর্শিত ছবির ওপর উপর্যুক্ত হুকুমই আরোপ করে এ কথা বলা হবে যে, ছবি হওয়ার কারণে এগুলো দেখা হারাম?

এ বিষয়ে আমার দ্বিধা ও সংশয় রয়েছে। কারণ, ওই ছবি হারাম যা এমনভাবে চিত্রিত-অংকিত অথবা এমনভাবে নির্মিত যা কোনো জিনিসের ওপর স্থির এবং স্থায়ী হয়। আর কাফেররা এ জাতীয় ছবিকে কেন্দ্র করেই পূজা-অর্চনা ও উপাসনা করতো। কিন্তু যে ছবি স্থির ও স্থায়ী নয় এবং যে ছবি কোনো জিনিসের ওপর স্বতন্ত্রভাবে চিত্রিত নয় এ জাতীয় ছবি প্রতিবিম্ব বা ছায়ার সঙ্গেই বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ।

---

[৯৬] শরহুস সারাখসি : খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ২১২।

এ বিষয়টি তো একেবারেই স্পষ্ট যে, টিভি ও ভিডিওর মাধ্যমে প্রদর্শিত ছবি কোনোভাবেই স্থির ও স্থায়ী চিত্র নয়। এসব শুধু ফিল্মের মাধ্যমে সংরক্ষিত থাকে। কারণ, যে অবস্থায় স্ক্রিনে সরাসরি মানুষের ছবি ভেসে ওঠে তখন ওই মানুষটি ক্যামেরার অপরদিকে উপস্থিত থাকে। এ অবস্থায় মানুষের ছবি যেমনিভাবে ক্যামেরায় স্থির ও স্থায়ী থাকে না। তেমনিভাবে তা স্ক্রিনেও স্থায়ী ও স্থির থাকে না। মূলত এগুলো বিদ্যুতের পারমাননিক ক্রিয়ার ফল বিশেষ। যা পর্যায়ক্রমে ক্যামেরা থেকে স্ক্রিনে প্রত্যাবর্তিত হতে থাকে। তারপর সেই মূল সিরিয়াল অনুযায়ী স্ক্রিনে প্রকাশ পায়। আবার সেই পরমাণুগুলো নিজে নিজেই নি:শেষ হয়ে যায়। যেভাবে ছবিগুলোকে ভিডিও ক্যাসেটে সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে, সেভাবে ক্যাসেটের ফিতায় ছবিগুলো অঙ্কিত বা চিত্রিত থাকে না। বরং সেগুলো বিদ্যুতের পারমানিক ক্রিয়া। যাতে কোনো ছবির অস্তিত্ব থাকে না। তবে যখন পরমাণুগুলো স্ক্রিনের ওপর প্রকাশ পেতে থাকে তখন পুনরায় মুল সিরিয়াল অনুযায়ী প্রকাশ হওয়া শুরু হয়। কিন্তু তারপরও সেগুলো স্ক্রিনে স্থির ও স্থায়ী হয় না। বরং একবার প্রকাশ হওয়ার পর আবার শেষ হয়ে যায়। তাই কোনোভাবেই এ কথা বলা যায় না যে, ওই ছবিগুলো কোনো জিনিসের ওপর স্থায়ীভাবে চিত্রিত বা অঙ্কিত হয়ে আছে। সুতরাং এ জাতীয় ছবির ক্ষেত্রে স্থির ও স্থায়ী ছবির হুকুম লাগানো একটি কঠিন বিষয়। মহান আল্লাহ্ সর্বাধিক অবগত।

—মুহাম্মাদ তকি উসমানি

৩ রবিউল আউয়াল ১৪২৫ হি.

৬ মে ২০০৩ খ্রি.

হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসার বিধান

শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি

'হারাম বস্তুর দ্বারা চিকিৎসার বিধান' এ প্রবন্ধটি উস্তাজে মুকাররাম শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি (হাফিজাহুল্লাহ) تكملة فتح الملهم 'ফাতহুল মুলহিমের সম্পূরক গ্রন্থে (খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩০১) এ [مسئلة التداوي بالمحرم] 'হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসার বিধান' শিরোনামের অধীনে উল্লেখ করেছেন। প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করে আমি এর উর্দু তরজমা এখানে পেশ করছি।

—আবদুল্লাহ মায়মান

মাকতাবাতুল ইসলাম মাকতাবাতুল ইসলাম

হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসার বিধান

হামদ ও সালাতের পর—

হাদিসে উরাইনা

> عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أناسا من عرينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فاجتووها فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من البانها وأبوالها.
>
> ‘আনাস ইবনু মালিক রা. থেকে বর্ণিত, উরাইনা গোত্রের কিছু লোক মদিনায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে উপস্থিত হয়। তারা শরীরের জ্বালা-যন্ত্রণা রোগে আক্রান্ত ছিলো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, তোমরা চাইলে মদিনার বাইরে সদকার উটগুলোর কাছে চলে যাও এবং সেগুলোর দুধ ও পেশাব খেয়ে নাও।’[৯৭]

যেসব ফকিহ্ হারাম এবং নাপাক বস্তু দ্বারা চিকিৎসা করা জায়েজ বলেন, তারা এ হাদিস দিয়ে দলিল পেশ করে থাকেন। হারাম এবং নাপাক বস্তু দ্বারা চিকিৎসা করার ক্ষেত্রে ফকিহ্গণের ভেতর মতপার্থক্য রয়েছে।

---

[৯৭] সহিহ মুসলিম : ৪৪৪৫।

হাম্বালি মাজহাব

হাম্বালি মাজহাবের অনুসারী আলেমগণ হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসাগ্রহণ করাকে সম্পূর্ণভাবে নাজায়েজ বলেছেন। যেমন : হাম্বালি মাজহাবের বিশিষ্ট আলেম ইবনু কুদামা রহ. বলেন—

ولا يجوز التداوي بمحرم ولا بشيئ في محرم مثل لبن الاتن ولحم شيئ من المحرمات ولا شرب الخمر للتداوي به لما ذكرنا من الخير.

'হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা জায়েজ নেই এবং এমন বস্তু দ্বারাও চিকিৎসা জায়েজ নেই যাতে হারাম বস্তুর সংমিশ্রণ রয়েছে। যেমন : মাদি গাধার দুধ এবং হারাম প্রাণীর গোশত দ্বারা চিকিৎসা করা। চিকিৎসার জন্য শরাব (মদ) পান করাও জায়েজ নেই। যেমনটি আমরা হাদিস উল্লেখ করে বর্ণনা করেছি।'[৯৮]

শাফিয়ি মাজহাব

শাফিয়ি মাজহাবে এমন নাপাক বস্তু দ্বারা চিকিৎসা করা জায়েজ, যা নেশামুক্ত। তবে শর্ত হলো, এই রোগের চিকিৎসার জন্য বাহ্যত এর বিকল্প না থাকতে হবে। মূলত নেশাযুক্ত বস্তু দ্বারা শাফিয়ি মাজহাবের আলেমগণের কাছেও চিকিৎসা গ্রহণ করা জায়েজ নেই। যেমন : ইমাম নববি রহ. তার 'আল মাজমু শরহুল মুহাজ্জাব' গ্রন্থে লেখেন—

مذهبنا جواز التداوي لجميع النجاسات زسوي المسكر....... دليلنا حديث العرينين وهو فى الصحيحين كما سبق وهو محمول على شربهم الأبوال للتداوي كما هو ظاهر الحديث وحديث لم يجعل شفائكم، محمول على عدم الحاجة إليه بأن يكون هناك ما يغني عنه ويقوم مقامه من الأدوية الطاهرة وقال البيهقي : هذان الحديثان إن صحا حملا على النهي عن التداوي بالمسكر وعلي التداوي بالحرام من غيرضرورة للجمع بينها وبين حديث العرينين.

'আমাদের মাজহাব হলো, নেশাযুক্ত বস্তু ছাড়া যাবতীয় নাপাক বস্তু দ্বারা চিকিৎসা করা জায়েজ। আমাদের দলিল, উরাইনা গোত্রের

[৯৮] আল-মুগনি : খণ্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ৮৩; শরহুল কাবির : খণ্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ১০৮।

হাদিস। এ হাদিসটি বুখারি ও মুসলিম শরিফে বর্ণিত হয়েছে। হাদিসটি নাপাক বস্তু—'পেশাব' দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণের বৈধতাকে প্রমাণ করে। হাদিসের বাহ্যিক অর্থ থেকেও এমনটিই বোঝা যায়। তাছাড়া অন্য হাদিসে এসেছে— لم يجعل الله شفائكم فيما حرم عليكم তোমাদের জন্য যা হারাম করা হয়েছে মহান আল্লাহ ওইসব বস্তুর মাঝে সুস্থতা রাখেননি, যা । হাদিসে এই ভাষ্য সে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যখন চিকিৎসার জন্য হারাম বস্তুর প্রয়োজন না হয়। বরং চিকিৎসার জন্য এর বিকল্প এমন কোনো পবিত্র বস্তু বিদ্যমান থাকে, যার কারণে হারাম বস্তুর প্রয়োজনীয়তাই ফুরিয়ে যায়।

ইমাম বায়হাকি রহ. বলেন, যদি (নিষেধাজ্ঞাসূচক) হাদিসদুটি সহিহ হয় তাহলে নিষেধাজ্ঞাসূচক হাদিসগুলো 'নেশাকর বস্তু দিয়ে চিকিৎসা করা' নিষেধ হওয়ার ওপর প্রযোজ্য হবে এবং বিনা প্রয়োজনে [تداوي بالمحرم] হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসার হুকুমের ওপর প্রযোজ্য হবে। যেন এসব হাদিস এবং হাদিসে উরাইনার মধ্যে সামঞ্জস্য সৃষ্টি হয়।[৯৯]

মালিকি মাজহাব

এ বিষয়ে মালিকি মাজহাব হাম্বালি মাজহাবের অনুরূপ। তাই তাদের মতেও হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণ করা কোনো অবস্থায়ই বৈধ নয়। যেমন : ইমাম কুরতুবি রহ. সুরা বাকারার ২১৩ নাম্বার আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন—

وإن كانت الميتة قائمة بعينها فقد قال سحنون لا يتداوي بها بحال بخترير، لأن منهاعوضا حلالا،بخلاف المجاعة وكذلك الخمر لا يتداوي بها.

'মৃত প্রাণীর ব্যাপারে ইমাম সাহনুন রহ.-এর অভিমত হলো, কোনো অবস্থাতেই তা দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণ করা জায়েজ হবে না এবং শুকর দ্বারাও চিকিৎসা গ্রহণ করা যাবে না।'[১০০]

এমনিভাবে ইমাম মাউওয়াক রহ. তার 'আত-তাজুল ইকলিল' গ্রন্থে এ বিষয়ে লেখেন—

---

[৯৯] আল-মাজমু শারহুল মুহাজজাব : খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ৫২।

[১০০] তাফসিরে কুরতুবি : সুরা বাকারা : আয়াত : ২১৩।

وأما التداوي بها (أي بالخمر) فمشهور المذهب أنه لا يحل، وإذا قلنا: أنه لا يجوز التداوي بها لا يجوز إستعمالها للضرورة، فالفرق أن التداوي لايتقين البشر بها.

'শরাব (মদ) দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ মাজহাব হলো, তা হালাল নয়। আমরা যখন শরাব দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণকে নাজায়েজ বল্লাম, তখন এর অর্থ হলো, প্রয়োজনের সময়ও তা ব্যবহার করা জায়েজ নেই। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, তার দ্বারা চিকিৎসা করলে সুস্থতা অর্জিত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত নয়।'[১০১]

হানাফি মাজহাব

এ বিষয়ে হানাফি মাজহাবের আলেমগণের বিভিন্ন মত পাওয়া যায়। ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর প্রসিদ্ধ অভিমত হলো, [تداوي بالمحرم] 'হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা' জায়েজ নেই। যেমন : ইমাম সারাখসি রহ. বলেন—

وعلي قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى عنه لا يجوز شربه (يعني بول ما يؤكل لحمه) للتداوي وغيره بقوله صلى الله عليه وسلم : إن الله تعالى لم يجعل شفائكم فيما حرم عليكم، وعند محمد رحمه الله تعالى يجوز شربه للتداوي وغيره، لأنه طاهر عنده، وعند أبي يوسف رحمه الله تعال يجوز شربه للتداوي لا غير،عملا بحديث العرينين.

'ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর অভিমত অনুযায়ী চিকিৎসা বা অন্য কোনো প্রয়োজনে কোনো প্রাণীর (অর্থাৎ, যেসব পশুর গোশত খাওয়া হালাল) পেশাবই পান করা জায়েজ নেই। কারণ, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে জিনিস হারাম, তার মাঝে 'মহান আল্লাহ তোমাদের জন্য কোনো সুস্থতা রাখেননি'। ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর কাছে চিকিৎসা বা এ জাতীয় কোনো প্রয়োজনে এমন প্রাণীর (যেসব প্রাণীর গোশত হালাল) পেশাব পান করা জায়েজ। কারণ, তার মতে তা তখন পাক। আর ইমাম আবু ইউসুফ

---

[১০১] আত-তাজুল ইকলিল : খণ্ড : ৩ পৃষ্ঠা : ২৩৩।

রহ.-এর অভিমত অনুযায়ী উরাইনা গোত্রের হাদিসের ওপর আমল করে একমাত্র চিকিৎসা হিসেবে হালাল প্রাণীর পেশাব পান করা জায়েজ। তবে অন্য কোনো উদ্দেশ্যে জায়েজ নেই। যেন হাদিসে উরাইনা অনুযায়ী আমল হয়ে যায়।'

ইবনু নুজাইম রহ. 'আল-বাহ্রুর রায়েক' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন—

وقال أبو يوسف : يجوز للتداوي لأنه لما ورد الحديث به في قصة العرينين جاز التداوي به وإن كان نجسا...... ووجه قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه نجس والتداوي بالطاهر المحرم كلبن الأتان لا يجوز فما ظنك بالنجس، ولأن الحرمة ثابتة فلا يعرض عنها إلا يتقين الشفاء وتأويل ما روي في قصة العرينين أنه عليه السلام عرف شفائهم فيه وجبا ولم يوجد تيقن شفاء غيرهم لأن المرجع فيه الأطباء وقولهم ليس بحجة قطعيه وجاز أن يكون شفاء قوم دون قوم لإختلاف الأمزجة حتى لو تعين الحرام مدفعا للهلاك الان يحل كالميتة والخمر عنه الضرورة.

'ইমাম আবু ইউসুফ রহ. বলেন, হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণ করা জায়েজ। কারণ, হাদিসে উরাইনা থেকে প্রতীয়মাণ হয়, হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা জায়েজ। যদিও তা নাপাক হয়। ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মতে এমন বস্তু দ্বারা চিকিৎসা নাজায়েজ হওয়ার কারণ হলো, তা নাপাক। এমন জিনিস যা পাক, অথচ তা হারাম। যেমন : মাদি গাধার দুধ। তা দ্বারা চিকিৎসা করাই যখন জায়েজ নেই, তখন ওই বস্তু যা হারাম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নাপাকও বটে, সেসব বস্তু দিয়ে চিকিৎসা কীভাবে গ্রহণ করা জায়েজ হতে পারে? এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কী হতে পারে?

দ্বিতীয়ত, তা হারাম হওয়ার বিষয়টি হাদিস দ্বারাই প্রমাণিত। সুতরাং যে বিষয়টির হারাম হওয়াটা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত, তা থেকে ততক্ষণ পর্যন্ত বিমুখ হওয়া যাবে না, যতক্ষণ না তা দ্বারা সুস্থ হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যাবে। আর উরাইনা গোত্রের বর্ণনাটির ব্যাখ্যা করা হবে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহির মাধ্যমে নিশ্চিত হয়েছিলেন, এর দ্বারা তারা সুস্থ হবে। আর অন্যান্য ক্ষেত্রে

যেহেতু সুস্থ হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিতভাবে জানা সম্ভব নয়। কারণ, সুস্থ হওয়ার নিশ্চয়তা ও অনিশ্চয়তার বিষয়ে অভিজ্ঞ হলেন ডাক্তারগণ। আর এ ক্ষেত্রে তাদের অভিমত অকাট্য কোনো দলিল নয়। আবার এমনও হতে পারে, এর দ্বারা কেউ সুস্থতা অর্জন করতে পারে। আবার কেউ সুস্থতা অর্জন নাও করতে পারে। কারণ, আবহাওয়া পরিবর্তনের কারণে এমনটি হয়ে থাকে। সুতরাং কোনো হারাম বস্তু সম্পর্কে যদি এ বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যায় যে, এর মাধ্যমে কোনো অসুস্থ ব্যক্তি চিকিৎসা নিলে সুস্থ হয়ে যাবে, তাহলে তা হালাল হবে। যেমন : প্রয়োজনের সময় মৃত প্রাণী খাওয়া এবং শরাব পান করা জায়েজ হয়ে যায়।'[১০২]

অধিকাংশ হানাফি আলেমের ফতোয়া ও তার দলিল

হানাফি মাজহাবের অধিকাংশ আলেম হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণকে জায়েজ হওয়ার পক্ষে ফতোয়া দিয়েছেন। তবে শর্তারোপ করেছেন। তা হলো, কোনো অভিজ্ঞ ডাক্তারের এই কথা বলতে হবে যে, এই অসুস্থ ব্যক্তির জন্য এই ওষুধ ছাড়া আর কোনো ওষুধ নেই। যেমন : ইবনু নুজাইম রহ. বলেন—

وقد وقع الاختلاف بين مشائخنا في التداوي بالمحرم، ففي النهاية عن الذخيرة الاستشقاء بالحرام يجوز إذا علم أن فيه شفاء، ولم يعلم دواء آخرأه وفي فتاوي قاضيخان معزيا إلى نصر بن سلام، معني قول عليه السلام : إن الله لم يجعل شيفائكم فيما حرم عليكم، إنما قال ذلك في الأشياء التي لا يكون فيها شفاء، فاما إذا كان فيها شفاء فلا بأس به، إلا تري أن العطشان يحل له شراب الخمر للضرورة...... وهذا لان الحرمة ساقطة عند الاستشقاء إلا تري أن العطشان يجووز له شراب الخمر والجائع يحل له أكل الميتة.

'আমাদের মাশায়েখে কেরামের মাঝে [تداوي بالمحرم] 'হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসার ব্যাপারে মতপার্থক্য দেখা যায়। যেমন : এ প্রসঙ্গে জখিরা' গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে 'নিহায়া' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে,

---

[১০২] আল-বাহরুর রায়েক : খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১১৫।

হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণ করা তখনই জায়েজ আছে, যখন নিশ্চিতভাবে জানা যাবে যে, এর মাধ্যমে সুস্থতা অর্জিত হবে এবং এই রোগের দ্বিতীয় আর কোনো বিকল্প ওষুধ নেই।'

'ফাতাওয়ায়ে কাজিখানে' নসর ইবনু সালামের একটি বর্ণনা পাওয়া যায়, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

إن الله لم يجعل شفائكم فيما حرم عليكم.

'মহান আল্লাহ ওইসব বস্তুর মাঝে তোমাদের আরোগ্য রাখেননি, যেসব বস্তু তোমাদের জন্য হারাম।'

এই 'বাণী' ওইসব বস্তুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যাতে সুস্থতা নেই। তবে যদি কোনো বস্তুর মাঝে সুস্থতা থাকে, তাহলে তা (ওষুধ হিসেবে) ব্যবহারে কোনো সমস্যা নেই। আপনার কি জানা নেই যে, প্রচণ্ড পিপাসার্ত ব্যক্তির জন্য প্রয়োজনের সময় শরাব (মদ) পান করা জায়েজ এবং প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত ব্যক্তির জন্য মৃত প্রাণী আহার করা জায়েজ।

এমনিভাবে হেদায়া গ্রন্থকার 'তাফনিসের' এটিকেই গ্রহণ করেছেন। কারণ হলো, যখন তা সুস্থ হওয়ার ওষুধ হিসেবে বিবেচনা করা হবে তখন হারাম হওয়ার হুকুর রহিত হয়ে যাবে। আপনার কি জানা নেই যে, পিপাসার সময় শরাব পান করা এবং ক্ষুধার্ত ব্যক্তির জন্য মৃত প্রাণী খাওয়া জায়েজ আছে।[১০৩]

উপর্যুক্ত আলোচনার সারকথা হলো, হানাফি মাজহাবের মাশায়েখে কেরাম 'হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা' জায়েজ হওয়ার ব্যাপারে ইমাম আবু ইউসুফ রহ.-এর অভিমতের ওপর ফতোয়া দিয়েছেন। অবশ্য এটি তখনই প্রযোজ্য যখন অভিজ্ঞ কোনো ডাক্তার এই রোগের আর কোনো ওষুধ জানা নেই বলে অভিমত দেবেন। তবে এই কথা আমি কোথাও পাইনি যে, ইমাম আবু ইউসুফ রহ. তার এই অভিমতের সঙ্গে এই শর্তারোপ করেছেন যে, ডাক্তারের এই অভিমত দিতে হবে যে, 'এই রোগের আর কোনো ওষুধ জানা নেই'। এ ধরনের শর্তারোপ তিনি করেননি।

ইমাম সারাখসি রহ. ও ইবনু নুজাইম রহ.-এর উদ্ধৃতি থেকে এ কথা স্পষ্ট হয় যে, তাদের কাছে কোনোরূপ শর্তারোপ ছাড়াই 'হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা'

[১০৩] আল-বাহরুর রায়েক : খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১১৬।

গ্রহণ করা জায়েজ। তবে হানাফি মাজহাবের আলেমগণ তাঁর এ অভিমত শুধু বিশেষ অবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন। অর্থাৎ, অভিজ্ঞ ডাক্তারের এই অভিমত দিতে হবে যে, এ রোগের এই ওষুধ ছাড়া বিকল্প আর কোনো হালাল ওষুধ জানা নেই।'[১০৪]

হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা নাজায়েজ হওয়ার দলিল

যেসব ফকিহ [تداوي بالمحرم] 'হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা' নাজায়েজ সাব্যস্ত করে থাকেন তারা মূলত এসব হাদিস দ্বারা দলিল পেশ করে থাকেন—

এক.

> عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء ودواء فتداووا ولا تداووا بالحرام.
>
> 'আবু দারদা রা. থেকে বর্ণিত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মহান আল্লাহ রোগ এবং ওষুধ উভয়টিই দান করেছেন এবং প্রত্যেক রোগের জন্য ওষুধ দিয়েছেন। সুতরাং চিকিৎসা গ্রহণ করো তবে হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণ করো না।'[১০৫]

দুই.

> عن عبد الرحمن بن عثمان رضي الله عنه أن طبيبا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها.
>
> 'আবদুর রহমান ইবনু উসমান রা. থেকে বর্ণিত। এক ডাক্তার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ব্যাঙ সম্পর্কে জানতে চায়। আমি কি তা ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করতে পারি? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তা হত্যা করতে নিষেধ করেছেন।'[১০৬]

---

[১০৪] আল-বাহরুর রায়েক : খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১১৬।

[১০৫] আবু দাউদ : ৩৮৭৬।

[১০৬] আবু দাউদ : ৫২৭১।

তিন.

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث.

'আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাপাক ওষুধ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।'[১০৭]

চার.

عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه : ذكر طارق بن سويد أو سويد بن طارق، سئل النبي صلى الله عليه عن الخمرة فنهاه ثم سئله فنهاه فقال له : يا نبي الله! أنها دواء، قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا ولكنها داء.

'ওয়ায়েল ইবনু হাজর রা. থেকে বর্ণিত। তারেক ইবনু সুআইদ কিংবা সুআইদ ইবনু তারেক রা. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শরাব (মদ) ব্যবহারের ব্যাপারে প্রশ্ন করেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা ব্যবহার করতে নিষেধ করেন। তারপর ওই সাহাবি আবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! তা তো একটি ওষুধ। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না বরং এটি একটি রোগ।[১০৮]

পাঁচ.

أخبرنا أحمد بن على بي المثني حدثنا جرير عن الشيباني عن حسان بن مخارق قال : قالت أم سلمة : إشتكت إبنة لي فنبذت لها في كوز فدخل رسول الله عليه وسلم وهو يغلي فقال : ما هذا؟ فقلت ان ابنتي اشتكت فنبذت لها هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله لم يجعل شفائكم في حرام.

'উম্মে সালামা রা. বর্ণনা করে বলেন, আমার মেয়ে অসুস্থ হয়ে যায়। আমি একটি মাটির পাত্রে নাবিজ বানাচ্ছিলাম। এমন সময় রাসুল

[১০৭] আবু দাউদ : ৩৮৭২।

[১০৮] আবু দাউদ : ৩৮৭৫, ইবনু মাজাহ : হাদিস : ৩৫০০, দারামি, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৮, হাদিস : ২১০২।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এলেন। তখন (চুলোর ওপর ফুটন্ত) নাবিজ উথলিয়ে উঠছিলো। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, এটি কী? আমি বল্লাম, আমার মেয়ে অসুস্থ তাই আমি তার জন্য নাবিজ বানাচ্ছি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'মহান আল্লাহ হারাম বস্তুর মাঝে তোমাদের জন্য আরোগ্য রাখেননি।'[১০৯]

ছয়.

ইমাম তহাবি রহ. 'শরহু মাআনিল আসার' গ্রন্থে 'যে প্রাণীর গোশত খাওয়া যায়' অধ্যায়ে আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা.-এর এ উক্তি বর্ণনা করেছে—

ما كان الله ليجعل في رجس أو فيما حرم شفاء.

''মহান আল্লাহ নাপাক ও হারাম বস্তুর মাঝে আরোগ্য রাখেননি।

অন্য আরেকটি বর্ণনায় আবু ওয়ায়েল রা. থেকে বর্ণনা করেন—

إشتكي رجل منا فنعت له السكر فأتينا عبد الله فسئلناه فقال : إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم.

'আমাদের মধ্যে কোনো একজন একবার অসুস্থ হয়ে পড়ে। তার চিকিৎসার ব্যাপারে নেশাকর বস্তুর কথা বলা হলো। তখন আমরা এর সমাধানের জন্য আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা.-এর কাছে এলাম এবং এ সম্পর্কে জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, 'মহান আল্লাহ তোমাদের জন্য ওই বস্তুর মাঝে সুস্থতা রাখেননি, যা তোমাদের জন্য হারাম।

ইমাম বুখারি রহ. এ বর্ণনাটি সম্পূরক হিসেবে বুখারি শরিফের [كتاب الأشربة] 'পান সংক্রান্ত অধ্যায়ে' উল্লেখ করেছেন।

সাত.

عن عطاء قال : قالت عائشة رضي الله تعالى عنها : اللّٰهُمَّ لا تشف من استشفي بالخمر.

'আতা রহ. বর্ণনা করেন। আয়শা রা. এ দোয়া করতেন। হে আল্লাহ! ওই ব্যক্তিকে সুস্থতা দিয়ো না, যে শরাব (মদ) দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণ করে।[১১০]

---

[১০৯] ইবনু হাব্বান, পৃষ্ঠা : ৩৩৯, হাদিস : ৩৯৭।

[১১০] শরহু মাআনিল আসার : ৬১৪।

হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা জায়েজ দাবিদার ফকিহগণের পক্ষ থেকে জবাব

যেসব ফকিহ [تداوي بالمحرم] হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা' জায়েজ দাবি করেন, তারা উপর্যুক্ত হাদিসের এই জবাব দিয়ে থাকেন যে, এসব হাদিস ও বর্ণনা حالت إختيار-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। حالت إختيار-এর অর্থ হলো, এই রোগের অন্য ওষুধও রয়েছে। আইনি রহ. 'উমদাতুল কারি' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ২৯০ পৃষ্ঠায়, আনোয়ার শাহ কাশ্মিরি রহ. 'ফয়জুল বারি' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ৩২৯ পৃষ্ঠায়, খলিল আহমাদ সাহারানপুরি রহ. 'বাজলুল মাজহুদ' গ্রন্থের ১৬তম খণ্ডের ১৯৯ পৃষ্ঠায়, ইউসুফ বিন্নুরি রহ. 'মাআরিফুস সুনান' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ২৮৮ পৃষ্ঠায় এই জবাবের কথা উল্লেখ করেছেন এবং তা গ্রহণও করেছেন। আর শায়খ মুহাম্মাদ ইউসুফ কান্ধলবি রহ. 'আমানিয়ুল আহবার' গ্রন্থে এসব হাদিসের উত্তরে এই জবাবই দিয়েছেন। তিনি ইবনু হাজম রহ.-এর উদ্ধৃতিতে অতিরিক্ত এ কথাও বলেছেন——

> جاء اليقين بإباحة الميتة والخنزير عن خوف الهلاك من الجوع، فقد جعل تعالى شفاءنا من الجوع والمهلك فيا حرم علينا في تلك الحال وتقول: نعم ان الشيئ ما دام حراما علينا فلا شفاء لنا فيه فإذا إضطررنا اليه فلم يحرم علينا حينئذ بل هو حلال فهو لنا حينئذ شفاءن، وهذا ظاهر الخبر.

> 'যদি ক্ষুধার জ্বালায় মারা যাওয়ার উপক্রম হওয়ার আশঙ্কা হয়, তাহলে ওই সময় মৃতপ্রাণী এবং শুকর বৈধ হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত। এ থেকে প্রতীয়মান হয়, 'মহান আল্লাহ ক্ষুধার জ্বালায় মারা যাওয়ার উপক্রমের সময় এমন বস্তুর মাঝে আমাদের জন্য সুস্থতা রেখেছেন যা ওই অবস্থায় আমাদের জন্য হারাম ছিলো।

> আমরা বলি, ঠিক আছে, যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো বস্তু আমাদের ওপর হারাম থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত ওই বস্তুতে আমাদের জন্য আরোগ্য থাকবে না। হ্যাঁ তবে ওই বস্তু ব্যবহারে আমরা যখন বাধ্য হবো, তখন আর ওই হারাম বস্তু আমাদের জন্য হারাম থাকবে না। বরং হালাল হয়ে যাবে। কারণ, ওই সময় আমাদের জন্য তা আরোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবে। এ বিষয়টি একেবারেই স্পষ্ট ও পরিস্কার।' মহান আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

পশু জবাইয়ের বিধান

শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি

'পশু জবাইয়ের বিধান' এ প্রবন্ধটি উস্তাজে মুকাররাম শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি (হাফিজাহুল্লাহ) أحكام الذبائح واللحوم المستورة নামক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন। প্রবন্ধটি بحوث في قضايا فقهية معاصرة পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। সর্বসাধারণের উপকারার্থে অধম এটিরও (উর্দু) তরজমা পেশ করলাম।

—আবদুল্লাহ্ মায়মান

মাকতাবাতুল ইসলাম
মাকতাবাতুল ইসলাম

পশু জবাইয়ের বিধান

মহান আল্লাহ্ মুসলিমদের জন্য হালাল প্রাণীর গোশত খাওয়া এবং তার অন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা উপকৃত হওয়াকে হালাল করেছেন। তবে সেটি নিঃশর্তভাবে নয় বরং কিছু বিধিবিধানের অনুবর্তী হয়ে এ বৈধতা দেওয়া হয়েছে। এসব বিধি-নিষেধ কুরআন-সুন্নাহ্-এ স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এসব বিধিবিধান দেখার পর স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, পশুরাও মানবজাতির মতো। যেমনিভাবে মানুষের আত্মা ও অনুভূতি রয়েছে তেমনিভাবে পশুপ্রাণীর মাঝেও এসব শক্তি বিদ্যমান। যেমনিভাবে মানুষ সুখ-দুঃখ অনুভব করতে পারে ঠিক তেমনিভাবে এসব পশুপ্রাণীও সুখ-দুঃখ অনুভব করতে পারে। এরই ভিত্তিতে মানুষের জন্য পশুপ্রাণী জবাই করা ও তা খাওয়া এবং এর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা উপকৃত হওয়া অনুচিত ছিলো।

কিন্তু অপরদিকে 'মহান আল্লাহ্ মানুষকে 'আশরাফুল মাখলুকাত' তথা সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টিজগতে অন্যসব সৃষ্টিকে বানিয়েছেন তাদের সেবক হিসেবে এবং মানবজাতির কল্যাণ ও উপকারের জন্য। তাইতো পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে—

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا﴾

'জমিনের ওপর যা কিছু আছে মহান আল্লাহ্ তার সবই তোমাদের উপকারের জন্য সৃষ্টি করেছেন।'[১১১]

---

[১১১] সুরা বাকারা : ২৯।

তাই মানবজাতির জন্য পশু জবাই করে খাওয়া নীতি-বিরুদ্ধ কাজ হওয়া সত্ত্বেও 'মহান আল্লাহ তার ইহসান ও অনুগ্রহে মানুষের জন্য তা হালাল করেছেন। কিন্তু এই বৈধতাকে কঠোর বিধি-নিষেধের আওতাধীন করে দিয়েছেন। এখন মানুষ সেই বিধি-নিষেধের ওপর আমল করার অর্থ হলো, এ কথার স্বীকারোক্তি দেওয়া যে, মানবজাতির জন্য পশু হালাল করাটা একমাত্র আল্লাহর ইহসান ও অনুগ্রহ।

সুতরাং মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত পশুপ্রাণী থেকে উপকৃত হতে পারবে না যতক্ষণ না সে 'মহান আল্লাহর এই ইহসান ও অনুগ্রহের স্বীকৃতি প্রদান করবে এবং যতক্ষণ না ওইসব বিধিবিধান বাস্তবায়ন ও প্রতিপালন করবে। যা 'মহান আল্লাহ পশু জবাইয়ের ক্ষেত্রে তার ওপর আরোপ করেছেন।

ইসলামি শরিয়ত পশু জবাইয়ের বিশেষ ও সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি ও নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। যা অন্যান্য ধর্ম থেকে একেবারে স্বতন্ত্র। তাই পশু জবাই কোনো সাধারণ বিষয় নয় যে, মানুষ নিজের প্রয়োজন ও সুবিধা অনুযায়ী যেনতেনভাবে কোনো রকম সেরে নেবে। নিয়ম-নীতির কোনো তোয়াক্কা করা হবে না। বরং এটি নিরেট ইবাদতের একটি বিষয়। যে ব্যাপারে কুরআন-হাদিসে বর্ণিত বিধি-নিষেধের অনুসরণ করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অবশ্য কর্তব্য।

সুতরাং পশু জবাইয়ের ক্ষেত্রে মুফতি মুহাম্মাদ আবদিহি এবং তাঁর শিষ্য শায়খ রশিদ রেজার যে অভিমত তা হলো, 'এটি একটি স্বাভাবিক কাজ হিসেবে গণ্য। ইবাদত কেন্দ্রিক কোনো বিষয় নয়। মানুষ যেভাবে খুশি তা করে নিতে পারে। তাদের এমন দৃষ্টতাপূর্ণ অভিমত পরিস্কার ভ্রান্ত এবং স্পষ্ট কুরআন-হাদিসের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। কেননা, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন—

> من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله ورسوله.
>
> 'যে ব্যক্তি আমাদের মতো নামাজ আদায় করে, আমাদের কেবলার দিকে মুখ করে এবং আমাদের জবাইকৃত পশু খায়, এমন ব্যক্তি মুসলিম। আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জিম্মাদার।'

এর চেয়ে আরও স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে—

> أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله، فإذا قالواها وصلوا

صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها.

'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আমি যেন মানুষের সঙ্গে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাই যতক্ষণ তারা কালিমায়ে তাইয়্যেবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ না পড়বে। যখন তারা কালেমা পড়ে নেবে, আমাদের মতো নামাজ আদায় করবে, আমাদের কেবলামুখী হবে এবং আমাদের পদ্ধতি অনুযায়ী পশু জবাই করবে; ওই সময় তার জান-মাল আমাদের জন্য হারাম হয়ে যাবে।'[১১২]

এ হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পশু জবাইকে নামাজ এবং কেবলামুখী-এর সঙ্গে মিলিয়ে বর্ণনা করেছেন এবং তাকে ইসলামি শরিয়তের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসেবে গণ্য করেছেন। যা দ্বারা মুসলিম এবং অমুসলিমের মাঝে পার্থক্য হয়ে যায়। এ বিষয়টি ইসলামের ওইসব বৈশিষ্ট্য ও নিদর্শনাবলির অন্তর্ভুক্ত, যার মাধ্যমে এ বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যায় যে, এই ব্যক্তি মুসলিম। যে কারণে সে তার জীবন ও সম্পদ অন্য মুসলিম থেকে নিরাপদ করে নিতে সক্ষম হয়। আর যেখানে স্বয়ং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, শরয়ি পদ্ধতিতে পশু জবাই করা ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত এবং তা দীনের এমন নিদর্শনাবলির অন্তর্ভুক্ত যার ওপর আমলকারী মুসলিম হওয়ার প্রমাণ বহন করে। সেখানে অন্য কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজন পড়ে? এ প্রসঙ্গে ইবনু হাজার আসকালানি রহ. 'ফাতহুল বারি' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন—

وفيه أن أمور الناس محمولة على الظاهر فمن أظهر شعار الدين أجريت عليه أحكام أهله ما لم يظهر منه خلاف ذلك.

'এ হাদিস এদিকে ইঙ্গিত করছে যে, মানুষের কার্যক্রম বাহ্যিকের ওপর প্রযোজ্য। তাই যে ব্যক্তি দীনের নিদর্শন প্রকাশ করবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তার থেকে এর বিপরীত কোনো কিছু প্রকাশ না পাবে ততক্ষণ সে দীনের অনুসারী হিসেবে বিবেচিত হবে।'[১১৩]

সুতরাং 'পশু জবাইয়ে' যদি বিশেষ নিয়ম-নীতির অনুসরণ করা না হতো তাহলে

---

[১১২] সহিহ বুখারি, হাদিস : ৩৯১-৩৯২, আনাস ইবনু মালিক রা.-এর সূত্রে বর্ণিত।

[১১৩] ফাতহুল বারি, খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ৪৯৭।

মুসলিমের জন্য সব প্রাণীই খাওয়া জায়েজ হতো। সেই প্রাণী অগ্নিপূজারী জবাই করুক কিংবা কোনো মূর্তিপূজারী অথবা কোনো নাস্তিক ব্যক্তি করে থাকুক। শুধু মুসলিম কিংবা আহলে কিতাবের জবাইয়ের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকতো না।

এ কথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, পশুপ্রাণী ছাড়া অন্য যেসব খাবার ও উদ্ভিদ রয়েছে সেসবের ব্যাপারে ইসলাম এমন শর্তারোপ করেনি যে, এর প্রস্তুতকারক মুসলিম কিংবা আহলে কিতাব হতে হবে। বরং এসব খাদ্যসামগ্রীর বিষয়ে দীনধর্মের কোনো ভ্রুক্ষেপ না করেই সরাসরি জায়েজ বলা হয়েছে। পশু জবাইয়ের বিষয়টি যদি স্বাভাবিক ও সাধারণ কোনো কাজের অন্তর্ভুক্ত হতো এবং শরিয়তের কোনো বাধ্যবাধকতা না থাকতো তাহলে তো ওই অবস্থাতে জবাইকারীর ধর্মীয় অবস্থার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে তা খাওয়া জায়েজ হতো। (অথচ বিষয়টি এমন নয়)। সুতরাং এটিই প্রমাণ করে যে, ইসলামি শরিয়তে প্রাণীজাতীয় খাদ্যে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যে, তা খাওয়া বৈধ হওয়ার জন্য আবশ্যক হলো এ সকল প্রাণীর শিকার অথবা জবাই কিতাব ও সুন্নাহ-এ বর্ণিত শরয়ি জবাই সম্পর্কিত নিয়ম-নীতি অনুযায়ী হতে হবে।

আর একারণেই 'শিকার ও জবাই'-এর বিধান ইসলামি আইনশাস্ত্রের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত। ফকিহগণ এর বিধিবিধান কুরআন-সুন্নাহ, সাহাবিগণ ও তাবেয়িনদের অভিমতের আলোকে বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। আর ফেকাহশাস্ত্রের এমন কোনো কিতাব নেই যাতে كتاب الصيد والذبائح (শিকার ও জবাই) সংক্রান্ত অধ্যায়টি নেই। উল্লেখ্য, এই প্রবন্ধে এসব বিধিবিধানের চুলচেরা বিশ্লেষণ আমাদের উদ্দেশ্য নয়। বরং জবাইয়ের মৌলিক নীতিমালা বর্ণনা করা এবং সেইসব নীতিমালাগুলোকে বর্তমান যুগের প্রেক্ষিতে প্রয়োগের বিষয়টি নিশ্চিত করাই আমাদের এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাই এ প্রবন্ধটি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুর মাঝে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে—

১. শরিয়তসম্মত পদ্ধতিতে জবাই এবং তার শর্তাবলি;
২. পশুর প্রাণ বের করার পদ্ধতি;
৩. জবাইয়ের সময় 'বিসমিল্লাহ' পড়া;
৪. জবাইকারী মুসলিম কিংবা আহলে কিতাব হওয়া;
৫. বর্তমান যুগের জবাইখানায় জবাইয়ের পদ্ধতি;
৬. জবাইকারী অজ্ঞাত থাকলে ওই পশুর হুকুম;
৭. আমদানীকৃত গোশতের হুকুম।

এ বিষয়ে মহান আল্লাহ্ সঠিক কথাগুলো লেখার তাওফিক দান করুন এবং তার সন্তুষ্টি অনুযায়ী আমাদের চলার তাওফিক দান করুন। আমিন!

এক. শরিয়তসম্মত জবাই এবং তার শর্তাবলি

تذكية এবং ذكاة শব্দের আভিধানিক অর্থ 'পূর্ণ করা'। একারণেই ذكاة শব্দটি বয়স ও বিবেক (-এর জন্য যদি ব্যবহার করা হয়, তাহলে এর অর্থ বয়স ও বিবেক) পরিপূর্ণ হওয়ার অর্থে আসে।[১১৪]

আর জবাইয়ের শরিয়তসম্মত পদ্ধতিকে এজন্য ذكاة বলা হয় যে, তাতে ওই শর্তসমূহ বিদ্যমান থাকে যার কারণে পশু হালাল বলে বিবেচিত হয়। যেমন : ইমাম কুরতুবি রহ. সুরা মায়েদার إلا ما ذكيتم-এর তাফসিরে লিখেছেন, أي ادركتم ذكاته على التمام অর্থাৎ, তোমরা পরিপূর্ণভাবে তার জবাই সম্পন্ন করবে।[১১৫]

কোনো কোনো আলেম বলেছেন, শরিয়তসম্মত জবাই, تذكية অর্থাৎ, تطييب (সুগন্ধযুক্ত করা) থেকে নেওয়া হয়েছে। যেমন : আরবি ভাষাবিদগণ বলে থাকেন, 'رائحة طيبة' (উত্তম সুগন্ধি)। অনুরূপভাবে পশুর রক্ত যখন প্রবাহিত করে দেওয়া হয় তখন তার সুগন্ধিও উত্তম হয়ে যায়।

এটি তো ছিলো তার আভিধানিক অর্থ। ইমাম কুরতবি রহ. تذكية-এর পারিভাষিক অর্থ লিখেছেন—

> أنه عبارة عن إنهار الدم وفري الاوداج في المذبوح، والنحر في المنحور، والعقر في غير المقدور عليه مقرونا بينة القصد لله تعالى وذكره عليه.
>
> تذكية-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা হলো, 'রক্ত প্রবাহিত করা। পশুটি যদি জবাইযোগ্য হয় তাহলে নির্দিষ্ট রগগুলো কর্তন করা, আর যদি নহরযোগ্য হয় (যেমন : উট) তাহলে নহর করা। তা না হলে হালাল করার নিয়তে আল্লাহর নামে আহত করা।[১১৬]

যেহেতু ইমাম কুরতুবি রহ.-এর تذكية সম্পর্কিত এই পারিভাষিক সংজ্ঞার কোনো

---

[১১৪] ইবনু মনজুর রচিত লিসানুল আরব, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ২৮৮।

[১১৫] তাফসিরে কুরতুবি, খণ্ড : ৬; পৃ৫২-৫৩।

[১১৬] তাফসিরে কুরতুবি, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৫২-৫৩।

কোনো শর্ত মতভেদপূর্ণ। এজন্য تذكية-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা এভাবে করা উত্তম হবে—

إزهاق روح الحيوان بالطريق المشروع الذي يجعل لحمه حلالا للمسلم.

'শরিয়তসম্মতভাবে পশুর প্রাণ এমনভাবে বের করা, যার ফলে সেই পশুর গোশত মুসলিমদের জন্য হালাল হয়ে যায়।

'শরিয়তসম্মত জবাই'-এর জন্য ফকিহগণ যেসব শর্ত উল্লেখ করেছেন তা মৌলিকভাবে তিনটি বিষয়ের সমন্বয়—

১. প্রাণ বের করার সঠিক পদ্ধতি
২. জবাই করার সময় (বিসমিল্লাহ) আল্লাহর নাম নেওয়া;
৩. জবাইকারী জবাইয়ের যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়া। (অর্থাৎ, আহলে কিতাব কিংবা মুসলিম হওয়া)। এ পর্যায়ে আমরা এ তিনটি বিষয়ে বিশদ আলোচনা করবো। 'মহান আল্লাহ সর্বোত্তম সাহায্যকারী।

পশুর প্রাণ বের করার পদ্ধতি

পশুর প্রাণ বের করার পদ্ধতি যা ইসলামি শরিয়তে নির্ভরযোগ্য এবং শরিয়তসম্মত জবাইয়ের সময় আরোপিত শর্তাবলির জন্য পরিপূরক হিসেবে বিবেচিত। তা পশুর পরিবর্তনের কারণে পরিবর্তনশীল। সুতরাং হিংস্র হওয়ার কারণে যদি তা হাতে ধরে জবাই করা না যায়, কিংবা পোষা জন্তু হওয়া সত্ত্বেও নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়ে এবং ছুটোছুটি করতে থাকে তাহলে এই দুই অবস্থায় যে-কোনো ধারালো অস্ত্র দ্বারা পশুটিকে আঘাত করে তার রক্ত প্রবাহিত করে দেওয়া হবে। এইভাবে পশুটির প্রাণ বের হয়ে গেলে তা হালাল হয়ে যাবে। এ জাতীয় পশুর জবাই বা নহর করা শর্তযুক্ত নয়। জবাইয়ের এই পদ্ধতিটিকে ذكاة إضطراري 'অপারগ অবস্থায় জবাই' হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ذكاة إضطراري 'অপারগ অবস্থায় জবাই'-এর বিষয়টি আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। কিন্তু যদি পশু জবাইয়ের ক্ষেত্রে মানুষের সক্ষমতা থাকে, আর এটি একারণে যে, হয় পশুটি পোষা কিংবা পশুটি হিংস্র বটে কিন্তু যে-কোনোভাবে তা মানুষের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে, তাহলে এমন পশুকে জবাইকালে তার রগ-শিরা কেটে রক্ত প্রবাহিত করা অর্থাৎ, নিয়মমতো জবাই করা ওয়াজিব। নিচে তারই দলিল-প্রমাণ পেশ করা হলো—

প্রথম দলিল :

> عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه في حديث طويل أن جده سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أفنذبح بالقصب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما انهر الدم وذكر اسم الله فكل.
>
> 'রাফে ইবনু খাদিজ রা. থেকে একটি দীর্ঘ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, তাঁর দাদা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমরা কি বাঁশের বাকল দিয়ে পশু জবাই করতে পারবো? জবাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে জিনিস পশুর রক্ত প্রবাহিত করে এবং তাতে আল্লাহর নাম নেওয়া হয় তা তোমরা খেয়ে নাও।'[১১৭]

এ হাদিসে রাফে ইবনু খাদিজ রা.-এর দাদা জবাই করা সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। আর জবাই 'রগ কাটা'-কেই বলা হয়। যেমন : আতা রহ. ইমাম বুখারি

রহ.-এর সঙ্গে সুর মিলিয়ে এ হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেছেন।[১১৮] সুতরাং প্রশ্নত্তোরের পুরো প্রেক্ষাপট থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, এভাবে জন্তুর রগ-শিরা কেটে দিলে 'শরিয়তসম্মত জবাই' অর্জন হয়, যার ফলে পশুর রক্ত প্রবাহিত হয়ে যায়।

দ্বিতীয় দলিল :

عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قالا : نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان، وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفري الأوداج تترك حتى تموت.

'আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. এবং আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শয়তানের কর্তন থেকে নিষেধ করেছেন। আর তা হলো পশুকে শুধু তার চামড়া কেটে ছেড়ে দেওয়া এবং রগ-শিরা না কাটা। আর এভাবেই জন্তুর প্রাণ বের হয়ে যাওয়া।'[১১৯]

شريطة শব্দের ব্যাখ্যা ইবনু আসির রহ. বলেছেন—

الشريطة، الناقة ونحوها التي شرطت أي أثر في حلقها أثر يسير كشرطة الحجام من غير قطع الاوداج ولا إجزاء الدم، وكان هذا من فعل الجاهلية يقطعون شيئا يسيرا من حلقها فيكون ذلك تذكيتها عندهم وإنما أضافها إلى الشيطان كأن الشيطان حملهم على ذلك.

'شريطة' বলা হয় উট, ইত্যাদির শ্বাসনালী ও রগ-শিরা কাটা ছাড়া এবং রক্ত প্রবাহিত করা ছাড়াই তার গলদেশের সামান্য চামড়া কেটে ছেড়ে দেওয়া। যেমন : শিঙ্গা লাগানোর সময় সামান্য চামড়া কাটা হয়। আর এ জাতীয় কাজ জাহেলি যুগে প্রচলিত ছিলো। তারা পশুর শ্বাসনালী সামান্য কেটে ছেড়ে দিতো আর এটি ছিলো তাদের কাছে জবাই করা। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কাজকে শয়তানের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন, যেহেতু শয়তানই এ কাজের জন্য তাদের অনুপ্রাণিত করেছিলো।'[১২০]

তৃতীয় দলিল :

---

[১১৮] সহিহ বুখারি, অধ্যায় ২৪।

[১১৯] আবু দাউদ : ২৮২৮।

[১২০] জামউল উসুল, ইবনু আসির রচিত : খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৪৮২, হাদিস : ২৫৭৪।

عن عدي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه قال : قلت : يا رسول الله! أن أحدنا أصاب صيدا وليس معه سكين، أيذبح بالمروة وشقة العصا؟ فقال : أمرر الدم بما شئت واذكر اسم الله عز وجل.

'আদি ইবনু হাতেম রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রাসুল! আমাদের মধ্যে কেউ যদি কোনো শিকারের প্রাণী ধরতে সক্ষম হয়, আর তার কাছে যদি জবাই করার জন্য কোনো ছুরি না থাকে; তাহলে কি ওই ব্যক্তি কাঁচের টুকরো কিংবা বাঁশের বাকল দিয়ে তা জবাই করতে পারবে? জবাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে-কোনো জিনিস দ্বারাই রক্ত প্রবাহিত করে দিতে পারো। আর রক্ত প্রবাহের সময় আল্লাহর নাম নিয়ে নাও।'[১২১]

ইমাম নাসায়ি রহ.-ও তার কিতাবে এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তাঁর ভাষ্য হলো এমন—

إني أرسل كلبي فاخذ الصيد فلا أجد ما أذكيه به فأذبحه بالمروة وبالعصا، قال: أنهر الدم بما شئت واذكر اسم الله عز وجل.

'আদি রা. বলেন, আমি শিকার করার জন্য কুকুর ছেড়ে দিয়ে থাকি। কুকুর পশু শিকার করে নিয়ে আসে। কিন্তু জবাই করার মতো কোনো জিনিস আমার কাছে থাকে না। তাহলে কি আমি শিকার করা পশুটি কাঁচের টুকরো কিংবা বাঁশের বাকল দিয়ে জবাই করতে পারবো? উত্তরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে-কোনো জিনিস দিয়ে রক্ত প্রবাহিত করে নাও এবং জবাই করার সময় আল্লাহর নাম নিয়ে নাও।[১২২]

চতুর্থ দলিল :

عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : ما فري الأوداج فكله.

'আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. বলেন, যে প্রাণীর রগ-শিরা কাটা হয়েছে

---

[১২১] আবু দাউদ : ২৮২৬।

[১২২] সুনানে নাসায়ি, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ২২৫, হাদিস : ৪৪০১।

তা খেয়ে নাও।[১২৩]

উপর্যুক্ত হাদিসসমূহ এবং এমন আরও অনেক হাদিসের ওপর ভিত্তি করে ফকিহগণ শরিয়তসম্মত জবাইয়ের জন্য পশুর রগ-শিরা কাটাকে শর্তারোপ করেছেন। أوداج শব্দটি ودج শব্দের বহুবচন। আর এটি একটি রগ-শিরার নাম। যা পশুর ঘাড়ে বিদ্যমান। মূলত এখানে দুটি রগ রয়েছে। যেমনটি ইবনু মনজুর ইবনু সায়্যিদা থেকে বর্ণনা করেছেন—

الودجان عرقان متصلان من الرأس إلى السحر والجمع أوداج

'ودجان' একসঙ্গে সংযুক্ত দুটি রগ-শিরা। মাথা থেকে পৃষ্ঠদেশ পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। আর ودج শব্দটির বহুবচন أوداج ব্যবহার করা হয়।[১২৪]

জবাইয়ের যন্ত্র

এ ব্যাপারে ফকিহগণ একমত যে, জবাইয়ের যন্ত্র হতে হবে খুব ধারালো। যেন সহজেই পশু কেটে যায় বা ফেড়ে যায়। এমন যেন না হয় যে, যন্ত্রের বোঝা বহনের কারণে কেটেছে বা ফেঁড়েছে। হ্যাঁ! জবাইয়ের জন্য ছুরি বা চাকু হওয়া জরুরি নয়। এবং প্রত্যেক এমন জিনিসের মাধ্যমে জবাই করা বৈধ যা ধারালো। এখন চাই তা লোহা-নির্মিত কিংবা পাথর-নির্মিত কিংবা কাঠ হোক। এর প্রমাণ ওই হাদিস যা বুখারি মুসলিমসহ অন্যান্য কিতাবে বর্ণিত হয়েছে—

عن رافع بن خَديج رضى الله عنه ، قالت :يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ملاقوا العدو غدا وليس معنا مُدى ، أفنذبح بالقصب ، فقال : ما أنهر الدم وذُكر اسم الله فكلوا ليس السن والظُفُر .

'রাফে ইবনু খাদিজ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছি। হে আল্লাহর রাসুল ! আগামীকাল আমরা শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। তখন আমাদের কাছে কোনো ছুরি থাকবে না। আমরা কি তখন বাঁশের বাকল দিয়ে পশু জবাই করতে পারবো? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

[১২৩] মুয়াত্তা ইমাম মালিক, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৪৮৯।

[১২৪] লিসানুল আরব, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৯৭।

ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে জিনিস রক্ত প্রবাহিত করবে এবং যার ওপর আল্লাহর নাম নেওয়া হবে তা তোমরা খেয়ে নাও। তবে শর্ত হলো দাঁত কিংবা নখ দিয়ে সেই পশুটি জবাই না হতে হবে।'[১২৫]

ইতোপূর্বে আদি ইবনু হাতেম রা.-এর বর্ণনাকৃত একটি হাদিসে গিয়েছে। তিনি মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কাঁচ এবং বাঁশের বাকল দ্বারা জবাই প্রসঙ্গে প্রশ্ন করেছিলেন।

জবাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে জিনিস দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হয়। তবে সবগুলো হাদিস এ ব্যাপারে একমত যে, এমন যন্ত্র দ্বারা জবাই করা জরুরি, যা রক্ত প্রবাহিত করে দেয়। আর ওই যন্ত্র ধারালো হওয়ার ব্যাপারেও সকল ফকিহ একমত। তবে দাঁত ও নখ দ্বারা জাবাইয়ের ক্ষেত্রে ফকিহগণ মতবিরোধ করেছেন। হেজাজের ইমামগণ বলেন, এই দুই বস্তু দ্বারা কোনো অবস্থাতেই জবাই করা জায়েজ নেই। চাই সেই দাঁত ও নখ দেহের সঙ্গে লাগানো থাকুক বা না থাকুক। কারণ, রাফে ইবনু খাদিজ রা.-এর হাদিসটিতে ব্যাপকতার অর্থ রয়েছে। আর তাতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাইয়ের যন্ত্র থেকে দাঁত ও নখকে নিষেধাজ্ঞার সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন যা দেহের সঙ্গে লাগানো। কারণ, দেহের সঙ্গে লাগানো অবস্থায় সেই পশুর মৃত্যু গলায় ফাঁস দিয়ে মারার হুকুমে। তবে যে দাঁত ও নখ দেহের সঙ্গে লাগানো না হয় বরং দেহ থেকে আলাদা হয় সে দাঁত ও নখ দিয়ে ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মতে শরয়ি জবাই হবে তবে তা মাকরুহ হিসেবে বিবেচিত হবে।[১২৬]

রগ-শিরা কাটা ছাড়া প্রাণ বের করা

যে প্রাণীকে জবাই করার সাধ্য মানুষের আছে, যদি এমন প্রাণীর রগ-শিরা না কেটে অন্য কোনোভাবে প্রাণ বের করা হয়, তাহলে তা শরিয়তসম্মত জবাই বলে গণ্য হবে না এবং এ জাতীয় পশুর গোশত খাওয়াও জায়েজ হবে না। এ ব্যাপারে ফকিহগণ একমত।

মহান আল্লাহ বলেন—

[১২৫] জামিউল উসুল লি ইবনু আসির, খণ্ড : ৪ পৃষ্ঠা : ৪৮৯।

[১২৬] রদ্দুল মুহতার, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ২০৪।

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾

'তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে, মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের গোশত, আল্লাহ ছাড়া অন্য নামে জবাইকৃত পশু, শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যাওয়া জন্তু, ধারহীন কিছু দিয়ে আঘাত প্রাপ্ত হয়ে মারা যাওয়া জন্তু, ওপর থেকে পড়ে মারা যওয়া জন্তু, শৃঙ্গাঘাতে মারা যাওয়া জন্তু এবং হিংস্র পশুর খাওয়া জন্তু; তবে তোমরা যা জবাই দিয়ে পবিত্র করেছো তা ছাড়া।'[১২৭]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু কাসির রহ. বলেন, مُنْخَنِقَةُ ওই জন্তুকে বলা হয়, যার মৃত্যু হয় শ্বাসরোধে। চাই তা ইচ্ছাকৃতভাবে শ্বাসরোধ করে মারা হোক অথবা ঘটনাচক্রে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যাক। যেমন : কোনো জন্তু নিজের রশির প্যাঁচে জড়িয়ে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা গেলো। এ ধরনের পশু খাওয়া হারাম

'مَوْقُوذَةٌ' ওই জন্তুকে বলা হয়, যাকে ধারহীন ভারি হাতিয়ার দিয়ে আঘাত করার ফলে মারা যায়। যেরুপ আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. এবং অন্য সাহাবিগণ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন; তা এমন জন্তু যাকে লাঠি দিয়ে আঘাত করার ফলে মারা যায়। কাতাদা রহ. বলেন, জাহেলি যুগে মানুষ পশুকে লাঠি দিয়ে আঘাত করতো এর ফলে পশুটি যখন মারা যেতো তখন তাকে তারা খেয়ে নিতো।

আদি ইবনু হাতেম রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম। হে আল্লাহর রাসুল! আমি معراض (এক প্রকার তিরের নাম) শিকারের দিকে নিক্ষেপ করে থাকি। ফলে পশুটি শিকার হয়ে যায়।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, যখন তোমরা معراض দিয়ে প্রাণী শিকার করো এবং ওই معراض ওই পশুকে চিড়ে দেয় তাহলে তা খেয়ে নাও। আর যদি معراض পশুর গায়ে আড়াআড়িভাবে প্রশস্ততার দিক থেকে আঘাত করে তাহলে ওই পশুকে وقيذ প্রহৃত বলা হয়। তাই তাকে খেয়ো না।

বর্ণিত হাদিসে উভয় প্রকার প্রাণীর মাঝে পার্থক্য করা হয়েছে। যে পশুর গায়ে বর্শার ধারালো অংশ আঘাত করে তা খাওয়া বৈধ। আর পশুর গায়ে বর্শা যদি আড়াআড়িভাবে আঘাত করে তবে তা وقيذ এর হুকুমে হারাম হয়ে থাকে।

[১২৭] সুরা মায়িদা : ৩।

আলেমগণ সকলে এ বিষয়ে একমত।

مُتَرَدِّيَةُ ওই প্রাণীকে বলে, যা কোনো উঁচু স্থান থেকে পড়ে মারা যায়। এমন প্রাণীও খাওয়া হালাল নয়। আলি ইবনু আবু তলহা রহ. আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন, مُتَرَدِّيَةُ ওই প্রাণী যা পাহাড় থেকে পড়ে মারা যায়। কাতাদা রহ. বলেন, مُتَرَدِّيَةُ ওই প্রাণীকে বলা হয়, যা কূপের ভেতর পড়ে মারা যায়। সাদি রহ. বলেন, مُتَرَدِّيَةُ হলো ওই প্রাণী যা পাহাড় থেকে পড়ে মারা যায় অথবা কূপের ভেতরে পড়ে মারা যায়।

'نَطِيحَةُ' হলো ওই প্রাণী যা অন্য প্রাণীর শিঙের আঘাতে মারা যায়। এমন প্রাণী খাওয়া হারাম। এমনকি শুধু শিঙের আঘাতে আহত হয়ে রক্ত প্রবাহিত হওয়ার পরও তা খাওয়া হারাম, যদিও সেই রক্ত জবাইয়ের স্থান দিয়ে প্রবাহিত হয়।

'وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ' ওই প্রাণী যাকে বাঘ, চিতা, সিংহ, কুকুর বা অন্যকোনো হিংস্র প্রাণী আক্রমণ করে ওই প্রাণীর কিছু অংশ খেয়ে ফেলে, ফলে প্রাণীটি মারা যায়, এমন প্রাণী খাওয়া হারাম। যদিও ওই হিংস্র প্রাণীগুলো তাকে আঘাত করার কারণে রক্ত প্রবাহিত হয়। এমনকি সেই রক্ত যদি শ্বাসনালী দিয়েও বের হয় তবুও তা হারাম। আর তা হারাম হওয়ার ব্যাপারে ফকিহগণ সবাই একমত।

জাহেলি যুগে হিংস্র জন্তু উট, বকরি শিকার করে কিছু অংশ খেয়ে অবশিষ্ট অংশ ফেলে রাখলে লোকেরা তা খেয়ে নিতো। তাই মহান আল্লাহ মুমিনদের জন্য তা হারাম সাব্যস্ত করেছেন।

'إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ' এই অংশের সম্পর্ক পূর্বের বাক্যের সঙ্গে। অর্থাৎ, ইতোপূর্বে যে পাঁচ প্রকার প্রাণীর আলোচনা করা হয়েছে, তার থেকে কোনো একটির মৃত্যুর কারণ নিশ্চিত হওয়ার পরও যদি 'প্রাণ' অবশিষ্ট থাকে, আর এরই মাঝে শরিয়তসম্মতভাবে জবাই প্রয়োগ সম্ভব হয়, তাহলে শরয়িভাবে জবাই হওয়ার পর তা খাওয়া হালাল হিসেবে বিবেচিত হবে। যেমনটি আলি ইবনু আবু তলহা রহ. 'إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ'-এর ব্যাখ্যা আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন—

الا ما ذبحتم من هؤلاء وفيه روح فكلوه فهو ذكي.

'তবে যদি উপরে বর্ণিত পাঁচ প্রকার প্রাণীর প্রাণ বিদ্যমান থাকা অবস্থায় তোমরা জবাই করে দাও তাহলে তা খেয়ে নাও। কারণ তা পাক ও

পবিত্র।'

সাইদ ইবনু জুবাইর রহ., হাসান বসরি রহ., সুদ্দি রহ. থেকে এমনই ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে। মোটকথা, পবিত্র কুরআনের আয়াত দ্বারা এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, পশু তখনই হালাল হবে, যখন শরিয়তসম্মত জবাইয়ের মাধ্যমে তার প্রাণ বের হবে।

তাই কোনো পশুকে শ্বাসরুদ্ধ করার দ্বারা কিংবা ওজনদার কোনো বস্তু দিয়ে চাঁপা দিয়ে বা অন্য যে-কোনোভাবে পশুর রক্ত প্রবাহিত হওয়ার দ্বারা ওই প্রাণী হালাল হয়ে যাবে না। সুতরাং, যদি কোনো প্রাণীকে অন্যকোনো প্রাণী শিং দিয়ে আঘাত করে কিংবা কোনো প্রাণীকে কোনো হিংস্র প্রাণী শিকার করে নিয়ে আসে এবং এতে যদি কোনোভাবে জবাইয়ের স্থান দিয়ে রক্ত প্রবাহিতও হয় তা সত্ত্বেও পবিত্র কুরআনে পরিস্কারভাবে এ উভয় প্রকার প্রাণীকে হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। এ থেকে দিবালোকের মতোই স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, শুধু জবাইয়ের স্থান থেকে রক্ত প্রবাহিত হওয়ার দ্বারা প্রাণী হালাল হবে না। বরং এমন পদ্ধতিতে রক্ত প্রবাহিত হওয়া জরুরি যে পদ্ধতিকে মহান আল্লাহ্ শরিয়তসম্মত জবাইয়ের জন্য নির্ধারণ করেছেন।

দুই. জবাইয়ের সময় বিসমিল্লাহ্ পড়া

অধিকাংশ ফকিহ্-এর অভিমত হলো, শরয়ি জবাই'-এর জন্য জরুরি হচ্ছে, জবাইকারী জবাইয়ের সময় মহান আল্লাহর নাম নেবে। সুতরাং জবাইকারী যদি ইচ্ছাকৃতভাবে 'বিসমিল্লাহ' ছেড়ে দেয়, তাহলে ইমাম আবু হানিফা রহ., ইমাম মালিক রহ., ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রহ. এবং অধিকাংশ ফকিহ্-এর অভিমত অনুযায়ী ওই পশু খাওয়া হালাল হবে না। হ্যাঁ, যদি ভুলে 'বিসমিল্লাহ' ছেড়ে দেয় তাহলে হানাফি ও মালিকি মাজহাব অনুযায়ী শরয়ি জবাই বলে বিবেচিত হবে এবং তা খাওয়াও হালাল হবে। এসব ফকিহের কাছে 'জবাই-করা পশু' ও 'শিকার-করা' পশুর মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। অবশ্য হাম্বালি মাজহাব অনুযায়ী ইচ্ছাকৃত জবাইয়ের মাঝে ভুলে 'বিসমিল্লাহ' না বললে ক্ষমাযোগ্য। তবে শিকারের পশুর ক্ষেত্রে শিকারী তির চালানোর সময় কিংবা কুকুর ছাড়ার সময় যদি 'বিসমিল্লাহ' না বলে তাহলে ওই জবাই শরয়ি জবাই বলে গণ্য হবে না। এ

ক্ষেত্রে 'বিসমিল্লাহ' ইচ্ছাকৃতভাবে ছাড়া হোক কিংবা ভুলক্রমেই ছাড়া হোক।'[১২৮]

ইমাম শাফিয়ি রহ.-এর প্রসিদ্ধ অভিমত হলো, জবাইয়ের সময় 'বিসমিল্লাহ' পড়া ওয়াজিব নয়, বরং সুন্নত।[১২৯] তাই তার কাছে জবাইকৃত পশু খাওয়া হালাল হবে, যদিও ইচ্ছাকৃতভাবে 'বিসমিল্লাহ' পড়া ছেড়ে দেয়। তবে ইমাম শাফিয়ি রহ.-এর 'কিতাবুল উম্ম' থেকে এ কথা স্পষ্টভাবে পরিস্কার হয় যে, ইচ্ছাকৃতভাবে বিসমিল্লাহ' ছেড়ে দিলে সেই পশু হালাল হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি। হ্যাঁ, এ কথা পরিস্কার করে উল্লেখ আছে যে, ভুলে যদি 'বিসমিল্লাহ' ছেড়ে দেয় তাহলে সেই পশু খাওয়া হালাল। যেমন : কিতাবুল উম্ম এ উল্লেখ করা হয়েছে—

> وإذا أرسل الرجل المسلم كلبه أو طائره المعلمين أحببت له ان يسمي، فان لم يسم ناسيا فقتل أكل، لأنهما إذا كان قتلهما كالذكاة، فهو لو نسي التسمية في الذبيحة أكل، لأن المسلم يذبح على إسم عز وجل وإن نسي.
>
> 'যদি কোনো মুসলিম তার শিকারী কুকুর কিংবা শিকারী পাখিকে শিকারের জন্য ছেড়ে দেয়, তাহলে তার উচিত, 'বিসমিল্লাহ' পড়ে ছাড়া। আর যদি 'বিসমিল্লাহ' পড়তে ভুলে যায়, এমন সময় শিকারী কুকুর কিংবা শিকারী পাখি ওই পশুকে হত্যা করে ফেলে তবুও শিকারকৃত প্রাণীটি খেয়ে নেবে। কারণ, এই দুই প্রশিক্ষিত প্রাণীর হত্যা করাটা শরিয়তসম্মত জবাইয়ের অন্তর্ভুক্ত। যেমন : কেউ জবাইয়ের সময় 'বিসমিল্লাহ' পড়তে ভুলে গেলো তাহলে তা খেয়ে নেবে। কেননা, মুসলিম আল্লাহর নামেই জবাই করে। যদিও সে 'বিসমিল্লাহ' পড়তে ভুলে যায়।[১৩০]

এরপর ইমাম শাফিয়ি রহ. এ কথাটিও স্পষ্ট করেছেন যে, যে ব্যক্তি জবাই করার সময় তুচ্ছজ্ঞান করে 'বিসমিল্লাহ' পড়া ছেড়ে দেয়, তার জবাই হালাল হবে না।

---

[১২৮] হানাফি অভিমত দেখার জন্য : বাদায়েউস সানায়ে, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৪৬। মালিকি মাজহাব দেখার জন্য—কারবাফি রচিত আজ জাখিরা, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ১৩৪, আস-সাবি২পৃষ্ঠা : ১৭১। হাম্বালি মাজহাব দেখার জন্য—ইবনু কুদামা রচিত আল মুগনি, খণ্ড : ১১পৃষ্ঠা : ৪।

[১২৯] কালিদি ও উমাইরা, খণ্ড : ৪ পৃষ্ঠা : ২৪৪।

[১৩০] কিতাবুল উম্ম, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২২৭।

তিনি একটি স্বীকৃত নীতিমালার আলোকে এ কথা বর্ণনা করেছেন—

أن المسلم إذا نسي اسم الله تعالى أكلت ذبيحته وإن تركه إستخفافا لم تؤكل ذبيحته.

'মুসলিম যদি 'বিসমিল্লাহ' বলা ছেড়ে দেয়, তাহলে তার জবাইকৃত পশু খাওয়া যাবে। কিন্তু যদি তুচ্ছজ্ঞান করে 'বিসমিল্লাহ' পড়া ছেড়ে দেয় তাহলে তার জবাইকৃত পশু খাওয়া যাবে না।[১৩১]

কোনো কোনো আলেম এ কথা আরও স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে, উপরিউক্ত মাসআলায় ফকিহগণের সবাই একমত। যেমন : 'তাফসিরে মাজহারি'তে 'শরহুল মুকাদ্দামাতুল মালিকিয়্যা' গ্রন্থে এই ভাষ্য নকল করা হয়েছে—

وكل هذا فى المتهاون وأما المتهاون فلا خلاف أنها لا تؤكل ذبيحته تحريما، قاله ابن الحارث والبشير والمتهاون هو الذي يتكرر منه ذلك كثيرا، والله أعلم.

'বিসমিল্লাহ পড়া এবং ছাড়ার বিষয়টি ওই ব্যক্তির ব্যাপারে যে 'বিসমিল্লাহ' পড়াকে তুচ্ছ মনে না করে। আর যে বিসমিল্লাহকে তুচ্ছ মনে করে তার জবাইকৃত পশু হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই। ইবনুল হারেস রহ. ও বশির রহ. এই অভিমত পেশ করেছেন।

'متهاون' ওই ব্যক্তিকে বলা হয় যে অধিকাংশ সময় বিসমিল্লাহ' পড়া ছেড়ে দেয়।[১৩২] মহান আল্লাহ ভালো জানেন।

উপরে বর্ণিত ভাষ্য থেকে এ কথা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, ইমাম শাফিয়ি রহ.-এর কাছে ইচ্ছাকৃতভাবে 'বিসমিল্লাহ' ছেড়ে দেওয়া সত্ত্বেও ওই জবাইকৃত পশু নিরঙ্কুশ হালাল নয়। বরং তার কাছেও যদি কোনো ব্যক্তি তুচ্ছ মনে করে 'বিসমিল্লাহ' পড়া ছেড়ে দেয় এবং তা অভ্যাসে পরিণত হয় তাহলে তার জবাইকৃত পশু হারাম হিসেবে গণ্য হবে। এ থেকে বোঝা যায়, ইমাম শাফিয়ি রহ.-এর কাছে হালাল হওয়ার হুকুম শুধু ওই অবস্থার মাঝেই সীমাবদ্ধ যখন জবাইকারী এক দুইবার নিকৃষ্ট না ভেবে 'বিসমিল্লাহ' পড়া ভুলে যায়। এই অবস্থাও মাকরুহ থেকে মুক্ত নয়। কারণ, ইমাম শাফিয়ি রহ. এটিও বলেছেন— اجيبت له ان يسمي।

---

[১৩১] কিতাবুল উম্ম, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৩১।

[১৩২] তাফসিরে মাজহারি, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৩১৮।

যে কারণে শাফিয়ি মাজহাবের ফকিহগণ এ কথা স্পষ্ট করেছেন যে, ইচ্ছাকৃত 'বিসমিল্লাহ' ছেড়ে দেওয়া মাকরুহ। এ কারণে 'বিসমিল্লাহ' তরককারী গুনাহগার হবে।[১৩৩]

এই আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, ইচ্ছাকৃতভাবে 'বিসমিল্লাহ' ছেড়ে দেওয়ায় হানাফি, মালিকি এবং হাম্বালিদের মতে ওই পশুটি হারাম হয়ে যাবে। আর ইমাম শাফিয়ি রহ.-এর মতেও শর্তসাপেক্ষে হারাম অর্থাৎ, জবাইকারী যদি তুচ্ছ মনে করে 'বিসমিল্লাহ' ছেড়ে দেয় অথবা 'বিসমিল্লাহ' ছেড়ে দেওয়া জবাইকারীর অভ্যাসে পরিণত হয়। যেসব প্রাণী হারাম হওয়ার ব্যাপারে অন্যসব ফকিহগণ একমত পোষণ করেছেন, যদিও ইমাম শাফিয়ি রহ. সে ক্ষেত্রে হারামের হুকুম আরোপ করেননি, তবুও তার কাছে এ ক্ষেত্রটি মাকরুহ থেকে মুক্ত নয়। আর এই শিথিলতাটি এমন যা কুরআন-সুন্নাহ-এর অকাট্য দলিল দ্বারা শক্তিশালী হয় না। কুরআন-হাদিসে তো 'বিসমিল্লাহ' পড়াকে শরিয়তসম্মত জবাইয়ের একটি রুকন হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে। যেমন : পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে—

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ.

'যাতে আল্লাহর নাম নেওয়া হয়নি তার কিছুই তোমরা আহার করো না। আর এমনটি করা অবশ্যই গুনাহ।

প্রাণী জবাইকালে 'বিসমিল্লাহ' ছেড়ে দিলে তা হারাম হওয়ার ব্যাপারে দলিল হিসেবে উল্লিখিত আয়াত থেকে স্পষ্ট দলিল আর কী হতে পারে? উল্লিখিত আয়াতে অস্পষ্ট বা সংক্ষিপ্ত বলতে কিছু নেই। বরং তাতে পরিষ্কার ভাষায় 'না' সূচক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আর না' সূচক শব্দ হারাম হওয়ার দাবি করে। এর পর পবিত্র কুরআনে শুধু না সূচক শব্দ বলেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং এরপর 'وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ (নিশ্চয় তা গুনাহের কাজ) বাক্য এসেছে। যার দ্বারা সবধরনের সন্দেহ দূর হয়ে যায়। 'বিসমিল্লাহ' শরয়ি জবাই-এর একটি রুকন' হওয়ার ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে শুধু এ একটি আয়াতই দলিল নয়। বরং আরও অনেক আয়াত এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, 'বিসমিল্লাহ' শরয়ি জবাই'-এর একটি রুকন। তন্মধ্যে কয়েকটি আয়াত নিচে তুলে ধরা হলো—

﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ

[১৩৩] রওজাতুত তালেবিন, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ২০৫, রহমাতুল উম্মাহ-১১৮।

﴿عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ﴾[১৩৪]

লোকে তোমাকে প্রশ্ন করে, তাদের জন্য কী কী হালাল করা হয়েছে ? বলুন, 'সমস্ত ভালো জিনিস তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে এবং শিকারী পশু-পাখি যাদেরকে তোমরা শিকার শিক্ষা দিয়েছো যেভাবে আল্লাহ্ তোমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, তারা যা তোমাদের জন্য ধরে আনে তা খাবে এবং তাতে আল্লাহ্র নাম নেবে।'

﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾[১৩৫]

'আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য কুরবানির নিয়ম করে দিয়েছি; তিনি তাদেরকে জীবনোপকরণস্বরূপ যে সকল চতুষ্পদ জন্তু দিয়েছেন, সেগুলোর ওপর যেন তারা আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করে।'

﴿فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ﴾[১৩৬]

'সুতরাং সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান অবস্থায় তাদের ওপর তোমরা আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করো।'

﴿وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا﴾[১৩৭]

"এবং কতক পশু যবেহ্ করার সময় তারা আল্লাহ্র নাম নেয় না।'

﴿وَمَا لَكُمْ إِلا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ﴾[১৩৮]

তোমাদের কী হয়েছে যে, যাতে আল্লাহ্র নাম নেওয়া হয়েছে তোমরা তা থেকে আহার করবে না ?

বর্ণিত আয়াতসমূহ থেকে বিভিন্নভাবে এ কথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, জবাইয়ের সময় আল্লাহর নাম নেওয়া সেসকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত, যার কারণে মুসলিমের জন্য প্রাণীর গোশত খাওয়া হালাল হয়ে যায়। আর পবিত্র কুরআনে

---

[১৩৪] সুরা মায়িদা, আয়াত : ৪।

[১৩৫] সুরা হজ, আয়াত : ৩৪।

[১৩৬] সুরা হজ, আয়াত : ৩৬।

[১৩৭] সুরা আনআম, আয়াত : ১৩৮।

[১৩৮] সুরা আনআম, আয়াত : ১১৯।

এ বিষয়টি শুধু এক বা দুটি আয়াতের মাঝেই সীমাবদ্ধ করা হয়নি; বরং যে স্থানেই জবাইয়ের আলোচনা এসেছে কিংবা শিকার বা কুরবানির কথা বর্ণিত হয়েছে, সেখানেই জবাইয়ের এই গুরুত্বপূর্ণ রুকনটিকে একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে এবং 'বিসমিল্লাহ' বর্জনকারীকে কঠোর ভাষায় অস্বীকার করা হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, এই ধৃষ্টতাকে 'আল্লাহর ওপর মিথ্যে রটনা' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। একইসঙ্গে ওইসব লোকদেরও নিন্দা করা হয়েছে যারা আল্লাহর নাম নেওয়া সত্ত্বেও জবাইকৃত প্রাণীকে হালাল মনে করে না। এসব আলোচনা এ কথাই প্রমাণ করে যে, জবাই করার সময় আল্লাহর নাম নেওয়া 'শরিয়তসম্মত জবাইয়ের শর্তমসূহের মাঝে অন্যতম শর্ত।

এমনিভাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একাধিক হাদিসেও 'বিসমিল্লাহ'-কে সেসব রুকনে গণ্য করা হয়েছে যা জবাই-করা পশু এবং শিকার হালাল হওয়ার জন্য পাওয়া জরুরি। নিচে কিছু হাদিস তুলে ধরা হলো—

এক.

> عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما انهر الدم وذكر اسم الله فكل.
>
> 'রাফে ইবনু খাদিজ রা. থেকে বর্ণিত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে প্রাণী রক্ত প্রবাহিত করে এবং তার ওপর আল্লাহর নাম নেওয়া হয় তা খেয়ে নাও।[১৩৯]

দুই.

> عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل أسفل بلدح وذلك قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سفرة فأبي أن يأكل منها، ثم قال زيد : إني لست أكل مما تذبحون على أنصابكم ولا آكل، إلا ما ذكر إسم الله عليه.
>
> আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, নবিজি ওহি নাজিলের পূর্বে জায়েদ ইবনু আমর ইবনু নুফাইলের সঙ্গে 'বালদাহ' নামক স্থানে সাক্ষাৎ করেন। তখন রাসুল

---

[১৩৯] সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫৪৯৮।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে দস্তরখান বিছানো হয়। সেই সঙ্গে কিছু গোশত সামনে রাখা হয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা থেকে খেতে অস্বীকৃতি জানালেন। তারপর জায়েদ বললেন, আমি এমন প্রাণী আহার করি না যা মূর্তির নামে জবাই করা হয়েছে। আমি শুধু ওই প্রাণীই আহার করি যা আল্লাহর নামে জবাই করা হয়েছে।[১৪০]

এ হাদিস দ্বারা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, 'বিসমিল্লাহ' বর্জন করলে হারাম হওয়াটা ইবরাহিম আলাইহিস সালামের শরিয়তের অংশ ছিলো।

তিন.

عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله تعالى عنه قال : ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحاة ذات يوم، فإذا الناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة، فلما انصرف رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد ذبحوا قبل الصلاة، فقال : من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخري ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله.

জুনদুব ইবনু সুফিয়ান বাজালি রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে কুরবানি করি। কিছু লোক ইদের নামাজের আগেই কুরবানির পশু জবাই করে ফেলে। যখন নবিজি ইদের নামাজ শেষ করে ফিরে আসেন তখন দেখেন যে, কিছু মানুষ ইদের নামাজের আগেই কুরবানির পশু জবাই করে ফেলেছে। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করলেন, যে ব্যক্তি ইদের নামাজের আগে কুরবানি করেছে সে যেন এর স্থলে আরেকটি পশু কুরবানি করে। আর যে নামাজের আগে কুরবানি করেনি সে যেন এখন আল্লাহর নামে কুরবানি করে নেয়।'[১৪১]

চার.

عن عبادة بن رفاعة عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما أنهرالدم وذكر اسم الله فكل.

---

[১৪০] সহিহ বুখারি, হাদিস : ৩৮২৬, জবাইয়ের অধ্যায়ের হাদিস : ৫৪৯৯।

[১৪১] সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫৫০০।

‘ওবাদা ইবনু রিফাআ রা. আপন দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে প্রাণীর রক্ত প্রবাহিত করে দেওয়া হয় এবং যার ওপর আল্লাহর নাম নেওয়া হয় তা খেয়ে নাও।[১৪২]

পাঁচ.

عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أسئلة، فأجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سؤاله في الصيد فقال : فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله وكل وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل.

‘আবু সালাবা আল খুসানি রা. থেকে বর্ণিত। তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কয়েকটি প্রশ্ন করেন। এসময় শিকারী বিষয়ে এক প্রশ্নের জবাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা ধনুক দিয়ে যে শিকার করো, শিকারের সময় আল্লাহর নাম নেবে এবং তা খাবে। এমনিভাবে যে প্রাণীকে তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর দিয়ে শিকার করবে, সে ক্ষেত্রে শিকার ছাড়ার সময় তোমরা আল্লাহর নাম নেবে এবং তারপর তা খাবে।’[১৪৩]

ছয়.

عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكن عليك.

‘আদি ইবনু হাতেম রা. থেকে বর্ণিত। মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন তোমরা তোমাদের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরকে আল্লাহর নাম নিয়ে শিকারের জন্য ছাড়বে। তখন কুকুর তোমাদের জন্য যা রেখে দেবে তা খেয়ে নেবে। (আর কুকুর যদি তা থেকে খায় তাহলে তোমরা তা খাবে না।)’[১৪৪]

---

[১৪২] সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫৫০৩।

[১৪৩] সহিহ বুখারি, হাদিস :-৫৪৭৮।

[১৪৪] সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫৪৮৭।

সাত.

عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال : قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم! إني ارسل كلبي أجد معه كلبا آخر، لا أدري أيهما أخذه؟ فقال : لا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره.

'আদি ইবনু হাতেম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম। হে আল্লাহর রাসুল! আমি শিকারের জন্য আমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর ছেড়ে থাকি। তবে আমার নিজ কুকুরের সঙ্গে আরেকটি কুকুরও দেখতে পাই। আর আমার জানা নেই কোন কুকুরটি শিকার করেছে? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ওই প্রাণীটি খেয়ো না। কারণ, তোমার কুকুর ছাড়ার সময় তুমি 'বিসমিল্লাহ' পড়েছো কিন্তু অপর কুকুরের ক্ষেত্রে তো তুমি 'বিসমিল্লাহ' পড়োনি।'[১৪৫]

আট.

عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه مرفوعا : وإذا خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكن فقتلن فلا تأكل.

আদি ইবনু হাতেম রা. থেকে বর্ণিত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি তোমাদের কুকুরের সঙ্গে শিকার করার ক্ষেত্রে অন্য এমন কোনো কুকুর মিলিত হয় যাকে ছাড়ার সময় আল্লাহর নাম নেওয়া হয়নি। আর উভয়ে মিলে ওই প্রাণীকে হত্যা করে, তাহলে তোমরা সেই প্রাণী খেয়ো না।'[১৪৬]

নয়.

عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال : قلت : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أحدنا أصاب صيدا وليس معه سكين، ايذبح بالمروة وشقة العصا؟ قال : أمرر الدم بما شئت واذكر اسم الله عز وجل.

'আদি ইবনু হাতেম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু

---

[১৪৫] সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫৪৮৬।

[১৪৬] সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫৪৮৪।

আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসুল! আমাদের মাঝে একজন শিকারের জন্তু পাকড়াও করলো। তবে তার কাছে জবাই করার ছুরি নেই। তাহলে কি সে কাঁচ বা লাকড়ির বাকল দিয়ে জবাই করতে পারবে? জবাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাললম বল্লেন, যে-কোনো বস্তু দিয়ে ইচ্ছে রক্ত ঝরাও এবং আল্লাহর নাম নাও।'[১৪৭]

মোটকথা, কুরআন-সুন্নাহ-এর অকাট্য প্রমাণসমূহ জবাইয়ের সময় আল্লাহর নাম নেওয়ার বিষয়টি চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং এ বিষয়ের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে কড়াকড়িভাবে হুকুম দেওয়া হয়েছে উল্লিখিত প্রমাণগুলো থেকে এমনটিই স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে। অথচ উল্লিখিত প্রমাণসমূহ থেকে শুধু একটি প্রমাণই জবাই করার সময় 'বিসমিল্লাহ' পড়াকে রুকন হিসেবে সাব্যস্ত করার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু শরিয়ত-প্রণেতা এ বিষয়টিকে শুধু একবারের ওপর সীমাবদ্ধ করেননি। বরং বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন পদ্ধতিতে এ বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। এটি শুধু উল্লিখিত বিষয়ের চূড়ান্ত পর্যায়ের গুরুত্ব বোঝানোর জন্যই করা হয়েছে যে, প্রাণীর শরিয়তসম্মত জবাইয়ের জন্য 'বিসমিল্লাহ' বলা অপরিহার্য একটি শর্ত।

উল্লেখ্য যে, শুধু এক অবস্থায় 'বিসমিল্লাহ' ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে স্বাতন্ত্র রয়েছে। আর তা হলো ভুলক্রমে 'বিসমিল্লাহ' ছেড়ে দেওয়া। এ প্রসঙ্গে ইমাম জাস্‌সাস রহ. উল্লেখ করেছেন, ভুলক্রমে বিসমিল্লাহ ছেড়ে দেওয়া শরিয়তসম্মত জবাইয়ের জন্য কোনো প্রতিবন্ধক নয়। কারণ মহান আল্লাহ বলেন—

﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه﴾

'যে প্রাণীর জবাইয়ের সময় আল্লাহর নাম নেওয়া হয়নি তোমরা তা খেয়ো না।'

এ আয়াতে কেবল ইচ্ছাকৃত বিসমিল্লাহ তরককারীকে সম্বোধন করা হয়েছে, ভুলক্রমে তরককারীকে নয়। তার প্রমাণ হলো এই যে, এ আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে 'وانه لفسق' (এগুলো গুনাহের কাজ)। আর 'فسق' গুণটি ভুলক্রমে বর্জনকারীর হতে পারে না। (অর্থাৎ, কেউ ভুলক্রমে ছেড়ে দিলে গুনাহগার হতে পারে না)। কারণ, ভুলক্রমে বর্জনকারী ভুল করা অবস্থায় 'বিসমিল্লাহ' পড়ার জন্য শরিয়তের পক্ষ থেকে নির্দেশপ্রাপ্ত নয়। ইমাম আউজায়ি একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন—

---

[১৪৭] আবুদাউদ, হাদিস : ২৮২৪, নাসায়ি, হাদিস : ৪৪০১।

عن عطاء بن أبي رباح عن عبد بن عمير عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تجاوز الله عن أمتي الخطاء والنسيان وما استكرهوا عليه.

'আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার উম্মত থেকে ভুল-ত্রুটি এবং যে কাজে তাকে বাধ্য করা হয় এ ধরনের বিষয়গুলো থেকে মহান আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন।'

সুতরাং উল্লিখিত হাদিস থেকে বোঝা যায়, ভুলক্রমে তরককারী মুকাল্লাফ (শরিয়ত কর্তৃক নির্দেশিত) নয়। তাই তার জবাইকৃত প্রাণী নির্দেশিত পন্থায় আদায় হয়েছে বলে বিবেচিত হবে। তাই বিসমিল্লাহ ছেড়ে দেওয়ার কারণে 'শরয়ি জবাই' নষ্ট হবে না এবং শরয়িভাবে জবাই ছুটে যাওয়ার কারণে এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয়বার জবাই অপরিহার্য করা জায়েজ হবে না। কেননা, জবাই করার সময় 'বিসমিল্লাহ' ভুলে যাওয়া নামাজে 'তাকবিরে তাহরিমা' কিংবা অপবিত্রতার কথা ভুলে যাওয়ার মতো নয়। কারণ, নামাজে তাকবিরে তাহরিমা কিংবা পবিত্রতার কথা ভুলে যাওয়ার বিধান এই যে, ভুলে যাওয়ার পর যখন স্মরণ হবে তখন পুনরায় 'অন্য ফরজ' হিসেবে তা আদায় করতে হবে। এটি ওয়াজিব। কিন্তু জবাইয়ের সময় পুনঃজবাইকে অন্য ফরজ হিসেবে আবশ্যক করা জায়েজ নেই। কেননা, এখানে জবাই করার আর কোনো স্থানই বিদ্যমান নেই।[১৪৮]

'ভুলে যওয়া'-এর মাসআলার পক্ষে এ বর্ণনাটিও দলিল হিসেবে পেশ করা যায়। যা ইমাম দারা কুতনি রহ. এবং ইমাম বায়হাকি রহ. বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাটি হলো—

عن ابن عباس رضي الله تعال عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المسلم يكفيه اسمه فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسم وليذكر اسم الله ثم تأكل.

'আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মুসলিমের জন্য আল্লাহর নামই যথেষ্ট। সুতরাং যদি কেউ জবাই করার সময় 'বিসমিল্লাহ' ভুলে যায় তাহলে

[১৪৮] আহকামুল কুরআন, জাস্সাস রহ. রচিত : ৩পৃষ্ঠা : ৭-৮।

তার জন্য উচিত (যখনই) স্মরণ হবে (তখনই) 'বিসমিল্লাহ' পড়ে নেওয়া। এরপর সেটি খেয়ে নেওয়া।[১৪৯]

হাফেজ ইবনু হাজার আসকালানি রহ. উল্লিখিত হাদিসটিকে তার কিতাবে 'الحبير التخليص'-এ উল্লেখ করে বলেছেন— وقد صححه ابن السكن অর্থাৎ, ইবনু সাকান রহ. হাদিসটিকে সহিহ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। অবশ্য কোনো কোনো মুহাদ্দিস এ বর্ণনাটিকে 'মাকাল ইবনু আবদুল্লাহ এবং মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াজিদ ইবনু সিনান'-এর কারণে 'معلل' (দোষযুক্ত) বলে আখ্যায়িত করেছেন। তবে বিশুদ্ধ অভিমত হলো, মাকাল ইবনু আবদুল্লাহ সহিহ মুসলিমের বর্ণনাকারীদের একজন। আর মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াজিদ ইবনু সিনানকে ইবনু হিব্বান, নুফাইলি এবং মাসলামা 'সিকা' অর্থাৎ, বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।[১৫০]

আব্দ ইবনু হুমাইদ নিচের বর্ণনাটি রাশেদ ইবনু সাদ থেকে বর্ণনা করেন—

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ذبيحة المسلم حلال سمي أو لم يسم ما لم يتعمد والصيد كذلك.

'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মুসলিমের জবাইকৃত প্রাণী হালাল। সে তাতে বিসমিল্লাহ পড়লেও এবং না পড়লেও। হ্যাঁ, তবে যদি ইচ্ছাকৃতভাবে বিসমিল্লাহ না পড়ে তাহলে হালাল হবে না। মুসলিমের শিকারের ক্ষেত্রেও অনুরূপ বিধান।[১৫১]

এ সকল মারফু বর্ণনা ইমাম বুখারি রহ. কর্তৃক আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা.-এর সূত্রে বর্ণিত 'মাওকুফ' হাদিসটিকেও শক্তিশালী করেছে। আর সেটি হলো— من نسي فلا بأس কোনো ব্যক্তি বিসমিল্লাহ ভুলে গেলে তাতে কোনো সমস্যা নেই।

এ বর্ণনাকে ইমাম দারা কুতনি, সাইদ ইবনু মানসুর ও অন্য আলেমগণ 'মাওসুল' তথা সরাসরি রাসুল সা. থেকে বলে বর্ণনা করেছেন। হাফেজ জাহাবি রহ. এ হাদিসের ব্যাপারে বলেছেন— وسنده صحيح অর্থাৎ, এ হাদিসটির সনদ সহিহ।

মোটকথা, এসব অসংখ্য প্রমাণ যা জবাইয়ের সময় 'বিসমিল্লাহ' পড়াকে ওয়াজিব

---

[১৪৯] নাসবুর রায়াহ, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৬১।

[১৫০] বিস্তারিত ইলাউস সুনান : খণ্ড ;১৭, পৃষ্ঠা : ৬৮।

[১৫১] সুয়ুতি রচিত আদ্দুররুল মানসুর, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৪২।

হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে; পক্ষান্তরে ইমাম শাফিয়ি রহ. তার মতের পক্ষে যেসব দলিল পেশ করেছেন তা এসব প্রমাণের কাছাকাছি যেতেও সক্ষম নয়।

যেমন : শাফিয়ি মাজহাবের কোনো কোনো আলেম পবিত্র কুরআনের এ আয়াত 'إلا ما ذكيتم' দ্বারা দলিল দিয়ে থাকেন যে, এ আয়াতে মহান আল্লাহ 'تذكية' (জবাই)-কে মুতলাকভাবে উল্লেখ করেছেন। 'বিসমিল্লাহ'-এর সঙ্গে শর্তযুক্ত করেননি। এ থেকে বোঝা যায়, বিসমিল্লাহ ওয়াজিব নয়। তাদের এই দলিলের জবাব একেবারে স্পষ্ট। তা হলো, শরিয়তে 'تذكية'-এর একটি নির্দিষ্ট অর্থ রয়েছে। ইতোপূর্বে আমরা যেসব প্রমাণ উল্লেখ করে এসেছি, সেগুলো থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, 'تذكية شرعية' শরিয়তসম্মত জবাই' 'বিসমিল্লাহ' ছাড়া হতেই পারে না। সুতরাং 'শরয়ি জবাই'-এর অর্থ হলো, বিসমিল্লাহর সঙ্গে জবাই করা। যেমনিভাবে জবাইয়ের অর্থে রগ-শিরা কর্তন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এজন্য 'মহান আল্লাহ উল্লিখিত আয়াতে জবাই'-কে সার্বিক অর্থে উল্লেখ করেছেন। যাতে ওই সকল শরয়ি রুকনকেও অন্তর্ভুক্ত করে নেয়, যা অন্যান্য প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। আর সে রুকনসমূহ থেকে উল্লেখযোগ্য একটি রুকন হলো 'বিসমিল্লাহ'। সুতরাং মহান আল্লাহর এই বাণী 'إلا ما ذكيتم' এর মাঝে এমনিতেই 'বিসমিল্লাহ' অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

একইভাবে শাফিয়ি মাজহাবের কোনো কোনো আলেম বুখারি শরিফের এ হাদিস দ্বারা প্রমাণ দিয়ে থাকেন। যা আয়শা রা. থেকে বর্ণিত। হাদিসটিতে বলা হয়েছে—

> أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : إن قوما يأتوننا بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال : سموا عليه أنتم وكلوه، قالت وكانو حديثي عهد بالكفر.
>
> 'এক গোত্রের লোকেরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, কোনো কোনো মানুষ আমাদের কাছে গোশত নিয়ে আসে। তবে আমাদের জানা নেই যে, জবাইয়ের সময় তাতে 'বিসমিল্লাহ' বলা হয়েছে কি না। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা তাতে আল্লাহর নাম নিয়ে খেয়ে নাও। আয়শা রা. বলেন, তাদের সময়টি ছিলো কুফুরের যুগের নিকটবর্তী।'[১৫২]

---

[১৫২] সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫৫০৭।

তবে উল্লিখিত হাদিসটি এমন প্রাণী হালাল হওয়ার ব্যাপারে পূর্ণাঙ্গ দলিল নয়, যার ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, জবাইকারী জবাইয়ের সময় ইচ্ছাকৃতভাবে বিসমিল্লাহ ছেড়ে দিয়েছে। এ হাদিস দ্বারা বেশির থেকে বেশি এতটুকু প্রমাণিত হয় যে, মুসলিমের সব কাজ সঠিকতার ওপর প্রয়োগ করতে হবে। সুতরাং কোনো মুসলিম গোশত অথবা খাবার নিয়ে এলে স্বাভাবিকভাবে আমাদের ধরে নিতে হবে তা শরয়িভাবে জবাইকৃত হালাল পশুর গোশত। আর বিষয়টিকে বাহ্যিক অবস্থার ওপরই ছেড়ে দিতে হবে। কারণ, সব মুসলিমের ব্যাপারে সুধারণা পোষণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এজন্য মুসলিমের আনীত গোশতের ব্যাপারে জবাইয়ের পদ্ধতি নিয়ে ঘাঁটাঘাটি করা এবং তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা ওয়াজিব নয়। যতক্ষণ না নিশ্চিতভাবে জানা যাবে যে, সে শরয়ি পদ্ধতিতে জবাই করেনি। যে গোত্রের গোশতের ব্যাপারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিলো ওই গোত্রের লোকেরা মুসলিমই ছিলো। যদিও সেই যুগটি ছিলো কুফুরের নিকটবর্তী। যেমনটি আয়শা রা. বর্ণনায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে দিয়েছেন। এজন্যই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কাজকে বাহ্যিক অবস্থার ওপর প্রয়োগ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর এ ক্ষেত্রে বাহ্যিক অবস্থা এটিই ছিলো যে, তারা মুসলিম হওয়ার সুবাদে জবাইয়ের সময় আল্লাহর নাম নিয়ে থাকবে।

এ হাদিস দ্বারা এ কথাও আবশ্যক হয় না যে, যদি কোনো ব্যক্তি নিশ্চিতভাবে জানে যে, জবাইকারী জবাইয়ের সময় ইচ্ছাকৃতভাবে 'বিসমিল্লাহ' ছেড়ে দিয়েছে। তবুও এ পশুটি হালাল হয়ে যাবে। এটি পরিস্কার বিষয় যে, উল্লিখিত হাদিসে মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ওই বিষয় জানতে চাওয়া হয়েছিলো যে, জবাইয়ের সময় বিসমিল্লাহ পড়েছিলো কি না? যেহেতু বিসমিল্লাহ' পড়া না পড়ার ব্যাপারে নিশ্চিত কোনো জ্ঞান ছিলো না। বর্তমান যুগেও মুসলিমদের বিশাল একটি অংশ এ সমস্যায় ভুগছেন। মুসলিমদের বাজারে যে গোশত বেচা-কেনা হচ্ছে, জবাইয়ের সময় সেগুলোর ক্ষেত্রে 'বিসমিল্লাহ পড়া হয়েছে কি না? কারণ, ক্রেতারা তো আর স্বচক্ষে দেখছে না যে, জবাইকারী জবাইয়ের সময় 'বিসমিল্লাহ' পড়েছে কি না? মূলত, উপরে বর্ণিত হাদিসটি এ প্রেক্ষাপটের ওপর নির্দেশ দিচ্ছে।

কিন্তু অবস্থা যদি এমন হয় যে, আপনি নিশ্চিতভাবে জানেন, জবাইকারী জবাইয়ের সময় ইচ্ছাকৃতভাবে 'বিসমিল্লাহ' ছেড়ে দিয়েছে; তাহলে এ অবস্থার

সঙ্গে উল্লিখিত হাদিসের দূরতম কোনো সম্পর্কও নেই। অতএব, দ্বিতীয় অবস্থাকে প্রথম অবস্থার সঙ্গে তুলনা করার প্রশ্নই আসে না।

শাফিয়ি মাজহাবের কোনো কোনো আলেম, ইমাম আবু দাউদ রহ.-এর একটি বর্ণনা দ্বারা দলিল পেশ করে থাকেন। যা ইমাম আবু দাউদ রহ. নিজের مراسيل এ 'الصلت السدوسي' থেকে নকল করেছেন—

> أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر، ان ذكر لم يذكر اسم الله عليه.
>
> মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুসলিমের জবাইকৃত পশু হালাল। তাতে আল্লাহর নাম নেওয়া হোক বা না হোক।[১৫৩]

এ হাদিসটি 'الصلت السدوسي'-এ বর্ণিত এবং তিনি একজন অজ্ঞাত রাবি। যেমন : ইবনু হাজম রহ. ও ইবনু কাত্তান রহ. বলেছেন এই একটি মাত্র হাদিস ছাড়া আর অন্য কোনো হাদিসের বর্ণনায় তিনি প্রসিদ্ধ নন। তাছাড়া সাওর ইবনু ইয়াজিদ ছাড়া অন্য কেউ তাঁর থেকে কোনো রেওয়ায়েত বর্ণনা করেননি।[১৫৪]তাই হাদিসের সনদটি সার্বিক বিবেচনায় দুর্বল থেকে মুক্ত নয়। আর যদি হাদিসটি বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়েও থাকে, তাহলে এটি সম্ভব যে হাদিসটিকে ভুলক্রমে 'বিসমিল্লাহ' বর্জনকারীর ওপর প্রয়োগ করা হবে। যাতে করে এই রেওয়ায়েতটি আরও অন্য অসংখ্য হাদিসের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে যায়; যেসব হাদিস 'বিসমিল্লাহ' ওয়াজিব হওয়ার ওপর প্রমাণ বহন করে এবং 'বিসমিল্লাহ তরক করা হারাম হওয়ার ওপর ইঙ্গিত করে।

মোটকথা, উপর্যুক্ত শক্তিশালী প্রমাণগুলোর আলোকে শাফিয়ি মাজহাবের কোনো কোনো আলেম অধিকাংশ ফকিহ-এর সিদ্ধান্তকে প্রাধাণ্য দিয়েছেন। যেমন : হাফেজ ইবনু হাজার আসকালানি রহ. বলেন—

> وقواه الغزالي فى الإحياء محتجا بأن ظاهر الآية الإيجاب مطلقا وكذلك الأخبار، وأن الأخبار الدالة على الرخصة تحتمل التعميم وتحتمل الإختصاص بالناسي، فكان حمله عليه اولي لتجري الأدلة

---

[১৫৩] মারাসিলে আবু দাউদ-৪১।

[১৫৪] জায়লায়ি রচিত 'নাসবুর রায়াহ' দেখুন।

كلها على ظاهرها ويعذر الناسي دون العامد.

> 'ইমাম গাজালি রহ. 'ইহয়াউল উলুম' গ্রন্থে অধিকাংশ ফকিহ্-এর সিদ্ধান্তকে শক্তিশালী বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং দলিল হিসেবে পেশ করেছেন যে, এ আয়াতের বাহ্যিক অর্থ 'বিসমিল্লাহ্' বলা ওয়াজিব হওয়া বোঝায় এবং বর্ণিত হাদিসগুলো দ্বারা এ বিষয়টিই স্পষ্ট হচ্ছে। আর যেসব হাদিসে কিছুটা অবকাশ বা সুযোগের বিষয়টি প্রতীয়মান হচ্ছে, সেখানে ব্যাপকতার যেমন সম্ভাবনা রয়েছে তেমনিভাবে অনিচ্ছাকৃত ব্যক্তির সঙ্গে নির্দিষ্ট করে দেওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। তবে উত্তম হলো এ ধরণের হাদিসকে, 'ناسي' 'ভুলক্রমে তরককারী'র ওপর প্রয়োগ করা, যাতে সব প্রমাণাদির বাহ্যিক অর্থ গ্রহণের সুযোগ থাকে। তাছাড়া 'ভুলক্রমে তরককারীকে' অপারগ মনে করা হয়। ইচ্ছাকৃত তরককারীকে অপারগ মনে করা হয় না।[১৫৫]

ইবনু হাজার আসকালানি রহ. ইমাম গাজালি রহ.-এর এই ভাষ্য তুলে ধরার পর কোনো প্রকার আপত্তি উত্থাপন করেননি। ইমাম গাজালি রহ.-এর এই ভাষ্যটি তাঁর কিতাবের 'باب ذبيحة الأعراب'-এর অধীনে উল্লেখ করেছেন।

ইবনু হাজার রহ.-এর এই প্রজ্ঞাপূর্ণ ভূমিকা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তিনি নিজেও জবাইয়ের সময় 'বিসমিল্লাহ্ ওয়াজিব' হওয়ার ব্যাপারে অধিকাংশ ফকিহের মতামতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। এ কারণে হাফেজ ইবনু হাজার আসকালানি রহ. ইমাম গাজালি রহ.-এর অভিমতকে তাঁর আলোচনার শেষে উল্লেখ করেছেন এবং যে হাদিস দ্বারা 'বিসমিল্লাহ্' বর্জন বৈধ হওয়ার ব্যাপারে প্রমাণ দেওয়া হয় ও সে হাদিসটিকে দুর্বল বলেছেন,।[১৫৬]

তিন. জবাইকারীর শর্তসমূহ

'শরিয়তসম্মত জবাই-এর জন্য যেসব গুরুত্বপূর্ণ শর্ত রয়েছে সেসব শর্তের অন্যতম হলো, জবাইকারী মুসলিম বা আহলে কিতাব হওয়া। একইসঙ্গে জবাইকারী আকেল (বিবেকসম্পন্ন) ও বালেগ (প্রাপ্তবয়স্ক) হতে হবে। এজন্য

[১৫৫] ফাতহুল বারি: খণ্ড : ৯; পৃষ্ঠা : ৬২৪।

[১৫৬] ফাতহুল বারি : খণ্ড : ৯; পৃষ্ঠা : ৬৩৪, অধ্যায়-১২।

আহলে কিতাব ছাড়া কাফের মুশরিকদের জবাইকৃত পশু হালাল হবে না। এসব শর্তের ব্যাপারে সকল ফকিহ একমত। আমার জানা মতে ফকিহগণের মাঝে এ বিষয়ে কোনো মতভেদ নেই। এমনকি কোনো কোনো আলেম এ বিষয়ে উম্মতের ইজমার কথা উল্লেখ করেছেন।[১৫৭]

আর কাফেরদের জবাইকৃত পশু হারাম হওয়ার অর্থ হলো, কাফের আহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত নয়; যদিও সে মুসলিমদের রীতিনীতি বজায় রেখে জবাই করে থাকে। তা সত্ত্বেও তার জবাইকৃত পশু হালাল হবে না। ইমাম জাস্‌সাস রহ. বলেন

জবাইয়ের শর্তসমূহ থেকে জানা গেলো যে, মুশরিকরা যদিও জবাইয়ের সময় আল্লাহর নাম নেয়, তবু তাদের জবাইকৃত প্রাণী খাওয়া হালাল হবে না।[১৫৮]

সমকালীন কোনো কোনো আলেম উল্লিখিত বিষয়টিকে বিরল আখ্যায়িত করেছেন। তারা শুধু আহলে আরবদের মূর্তিপুজারীদের জবাইকৃত প্রাণীর হারামের হুকুম আরোপ করেছেন। তাছাড়া অন্য কাফেরদের জবাইকৃত প্রাণী খাওয়া [مباح] 'বৈধ' করে দিয়েছেন। এসব কাফের মূর্তিপুজারী হোক কিংবা নাস্তিক কিংবা অগ্নিপূজারী হোক। সমকালীন কতিপয় আলেমের এই অভিমতটি স্পষ্ট ভ্রান্তি। কুরআন, হাদিস এবং সালাফে সালেহিনের বর্ণনার সঙ্গে এর দূরতম কোনো সম্পর্ক নেই। মূলত তাদের সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে একারণে যে, তারা অনুসন্ধান করে দেখলো, কুরআন-হাদিসে এমন কোনো স্পষ্ট দলিল নেই, যা থেকে এ কথা বোঝা যায়, আহলে কিতাব ছাড়া অন্য কারও জবাইকৃত পশু হারাম। আর প্রত্যেক বস্তুর মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো বৈধ হওয়া। সুতরাং কোনো বস্তু হারাম হওয়ার জন্য জরুরি হলো, তার হারাম হওয়ার ব্যাপারে শরিয়তের অকাট্য প্রমাণ থাকা।[১৫৯]

তবে সঠিক কথা হলো, পশুপ্রাণীর ক্ষেত্রে মূল হলো 'অবৈধতা' এবং কোনো প্রাণীই ততক্ষণ পর্যন্ত হালাল হিসেবে গণ্য হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত শরিয়ত তার হালাল হওয়ার হুকুম না দেবে। এর প্রমাণ আদি ইবনু হাতেম রা.-এর ওই বর্ণনা যা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

[১৫৭] সাদি আবু জেব রচিত মাওসুআতুল ইজমা, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৯১২।

[১৫৮] আহকামুল কুরআন : জাস্‌সাস রচিত, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৬।

[১৫৯] ফাসলুল কিতাব ফি ইবাহাতি জাবায়িহি আহলিল কিতাব : শায়খ আবদুল্লাহ ইবনু জায়েদ আল মাহমুদ রচিত, পৃষ্ঠা : ১৯-২২।

ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন—

قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني أرسل كلبي أجد معه كلبا آخر لا أدري ايهما اخذه. فقال : لا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره.

'হে আল্লাহর রাসুল! আমার শিকারী কুকুরকে শিকারের উদ্দেশ্যে ছাড়লাম, আরেকটি কুকুর এর সঙ্গী হলো। এখন আমার জানা নেই, কোন কুকুর শিকার করেছে? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ওই শিকারটি খেয়ো না। কারণ, তুমি শুধু তোমার কুকুরটি ছাড়ার সময় বিসমিল্লাহ' পড়েছো, অন্যটির ক্ষেত্রে পড়োনি।[১৬০]

এ হাদিসটি দ্বারা বোঝা যায়, শরিয়তসম্মত জবাই'-এর ক্ষেত্রে যখন সন্দেহ সৃষ্টি হবে আর এই সন্দেহ যখন উভয় দিকে সমান সমান হবে (বিসমিল্লাহ পড়েছে কি না) তাহলে ওই প্রাণী খাওয়া হারাম। এ থেকে বোঝা যায়, প্রাণীর ক্ষেত্রে মূল বিধান হলো 'হারাম হওয়া'। কারণ, এর মূল যদি '' 'বৈধতা' হতো তাহলে সন্দেহের কারণে প্রাণী হারাম হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

অপরদিকে পবিত্র কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী শুধু আহলে কিতাবের জবাইকৃত প্রাণীর বৈধতা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। যেমনটি পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে—

﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ﴾

'তাদের খাবার তোমাদের জন্য হালাল, যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে'।

সুতরাং সব ধর্মালম্বীদের প্রস্তুতকৃত খাবার যদি মুসলিমদের জন্য হালাল হতো তাহলে মহান আল্লাহ শুধু আহলে কিতাবীদের কথা নির্দিষ্ট করতেন না। সমকালীন কিছু লোক উপর্যুক্ত দলিলকে استدلال بمفهوم اللقب আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছে। এটিও শুদ্ধ হয়নি। বরং এই নীতি চুপকৃত বস্তুর ক্ষেত্রে মূলের দিকে ফেরার নীতি। আর প্রাণীর ক্ষেত্রে মূল হলো হারাম। ইতোপূর্বে এর আলোচনা গিয়েছে।

মোটকথা, বিশুদ্ধ অভিমত হলো, সর্বকালের আলেমগণ যে বিষয়ে একমতপোষণ করেছেন তা হলো, মুসলিমের জন্য জবাইকৃত পশু ততক্ষণ পর্যন্ত হালাল নয়,

---

[১৬০] সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫৪৮৬।

যতক্ষণ পর্যন্ত জবাইকারী আহলে কিতাব বা মুসলিম না হয়। আহলে কিতাব দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ইহুদি বা খ্রিস্টান সম্প্রদায়।

অবশ্য বিরল কিছু অভিমত অনুযায়ী অগ্নিপূজারীদেরকেও আহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে এবং এই দাবি প্রতিষ্ঠিত করার স্বপক্ষে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদিস তুলে ধরা হয়। যে হাদিসে তিনি বলেছেন—

سنوابهم سنة أهل الكتاب.

'ওদের (অগ্নিপূজারীদের) সঙ্গে আহলে কিতাবীদের মতো আচরণ করো।[১৬১]

কিন্তু এ হাদিসের ব্যাপারে সঠিক ব্যাখ্যা হলো, এ হাদিসটি মূলত অগ্নিপূজারীদের থেকে [جزية] 'ট্যাক্স' আদায় করার বিষয়ে বলা হয়েছে এবং এ প্রসঙ্গেই এ হাদিসটি উত্থাপন করে দলিল পেশ করা হয়েছে। ঘটনাটি ছিলো এমন, উমর ফারুক রা.-এর অগ্নিপূজারীদের থেকে [جزية] 'ট্যাক্স' আদায় করার ব্যাপারে সন্দেহ ছিলো। তখন আবদুর রহমান ইবনু আউফ রা. উমর রা.-কে এ হাদিসটি শুনিয়েছেন। এর পর থেকে এ হাদিসের ওপর ভিত্তি করে উমর রা. অগ্নিপূজারীদের থেকে [جزية] ট্যাক্স আদায় করেন। এই ঘটনাটি ইমাম মালিক রা. মুয়াত্তা মালিক' গ্রন্থে এই ভাষ্যে উল্লেখ করেছেন—

عن محمد بن على أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ذكر المجوس فقال : ما لك كيف أصنع في امرهم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف : أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : سنوابهم سنة أهل الكتاب.

'মুহাম্মাদ ইবনু আলি রা. থেকে বর্ণিত। উমর ইবনু খাত্তাব রা. অগ্নিপূজারীদের কথা আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, আমরা তাদের সঙ্গে কেমন আচরণ করবো? আবদুর রহমান ইবনু আউফ রা. বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি; তিনি বলেছেন, তাদের সঙ্গে আহলে কিতাবের মতো আচরণ করো।[১৬২]

---

[১৬১] আল মুহাল্লাহ : ইবনু হাজাম রহ. রচিত : খণ্ড : ৭; পৃষ্ঠা : ৪৫৬।

[১৬২] মুয়াত্তা ইমাম মালিক : ট্যাক্স অধ্যায়।

'আহলে কিতাব' এই উপাধি শুধু ইহুদি ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমিত। এ বিষয়ে অধিকাংশ আলেম পবিত্র কুরআনের এ আয়াত উত্থাপন করেছেন—

﴿أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ﴾

'(এখন) তোমরা বলো, 'কিতাব তো শুধু আমাদের দুই সম্প্রদায়ের প্রতিই অবতীর্ণ হয়েছিলো। আমরা তাদের পঠন-পাঠন সম্পর্কে তো অজ্ঞ ছিলাম'[১৬৩]

দ্বিতীয় কথা হলো এই যে, উল্লিখিত হাদিসে নবিজি অগ্নিপূজারীদের 'আহলে কিতাবের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করেননি। বরং এই নির্দেশ দিয়েছেন যে, [جزية] ট্যাক্স আদায়ের ক্ষেত্রে অগ্নিপূজারীদের সঙ্গে আহলে কিতাবের মতো আচরণ করো। এ থেকে বোঝা যায়, অগ্নিপূজকরা আহলে কিতাবের মাঝে গণ্য নয়। অবশ্য তাদের থেকে [جزية] ট্যাক্স গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তাদের সঙ্গে আহলে কিতাবের মতো আচরণ করা হবে। যেমনিভাবে আহলে কিতাব থেকে [جزية] ট্যাক্স' আদায় করা সম্ভব, তেমনিভাবে অগ্নিপূজারী' থেকে [جزية] ট্যাক্স আদায় করো।

আহলে কিতাবের জবাইকৃত পশুর মাসআলা

এ বিষয়ে সমগ্র উম্মত একমত যে, আহলে কিতাব অর্থাৎ, ইহুদি ও খ্রিস্টানদের জবাইকৃত পশু মুসলিমদের জন্য হালাল। এই দুই সম্প্রদায়ের মানুষ 'اهل ذكية' 'জবাইকারীদের অন্তর্ভুক্ত। নিচের এ আয়াত এর স্পষ্ট প্রমাণ—

﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾

'যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের খাদ্যদ্রব্য তোমাদের জন্য হালাল।'[১৬৪]

আর এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আলেমগণ একমত যে, এ আয়াতে [طعام] 'খাবার' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো জবাইকৃত পশু। যেমনটি ইবনু কাসির রহ. বলেছেন—

﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ ، قال ابن عباس وأبو

---

[১৬৩] সুরা আনআম, আয়াত : ১৫৬।

[১৬৪] সুরা মায়িদা, আয়াত : ০৫।

أمامة ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء والحسن والمكحول وإبراهيم النخعي والسدي ومقاتل بن حيان : يعني ذبائحهم، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن ذبائحهم حلال للمسلمين، لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله ولا يذكرون على ذبائحهم إلا إسم الله وإن إعتقدوا فيه تعالى ما هو متره عنه تعالى وتقدس.

এ আয়াত وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ (ওইসব লোকদের প্রস্তুতকৃত খাবার তোমাদের জন্য হালাল, যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে।) সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. আবু উমামা রা., মুজাহিদ রহ., সাইদ ইবনু জুবায়ের রহ., ইকরামা রহ., আতা রাহ., হাসান রহ., মাকহুল রহ., ইবরাহিম নাখায়ি রহ., সুদ্দি রহ. এবং মুকাতিল ইবনু হাইয়্যান রহ. প্রমূখ আলেমগণের অভিমত হলো, [طعام] 'খাবার' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আহলে কিতাবের জবাইকৃত পশু। আর আহলে কিতাবের জবাইকৃত পশু মুসলিমের জন্য হালাল হওয়ার ব্যাপারে আলেমগণ একমত পোষণ করেন। কারণ, তাদের আকিদা-বিশ্বাস হলো, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নামে পশু জবাই করা হারাম। তারা আল্লাহর নাম ছাড়া অন্য কারও নাম নেয় না। যদিও তারা মহান আল্লাহ সম্পর্কে এমন বিশ্বাস রাখে যার থেকে মহান আল্লাহ সম্পূর্ণ পবিত্র। (অর্থাৎ, তারা এই বিশ্বাস পোষণ করে যে, ইসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর সন্তান। নাউজুবিল্লাহ)[১৬৫]

এখন প্রশ্ন হলো, যেসব শর্ত মুসলিমের জবাইয়ের মাঝে পাওয়া জরুরি, আহলে কিতাবের জবাইয়ের মাঝেও কি ওইসব শর্ত পাওয়া জরুরি? যেমন : জবাইকালে পশুর রগ-শিরা কর্তন করা, জবাইয়ের হাতিয়ার ধারালো হওয়া, জবাইয়ের সময় বিসমিল্লাহ বলা, ইত্যাদি বিদ্যমান থাকা কি জরুরি?

সমকালীন কোনো কোনো আলেমের দাবি হলো, আহলে কিতাবের জবাই নিঃশর্তভাবে হালাল। তা যেভাবেই জবাই হোক না কেন। তাই এই মাসআলাটি নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন রয়েছে। সুতরাং আমরা এই মাসআলার এই দুটি দিক নিয়ে আলোচনা করবো—

এক.আহলে কিতাবের জবাইকৃত পশু হালাল হওয়ার জন্য শরিয়তসম্মত

[১৬৫] তাফসিরে ইবনু কাসির, ২পৃষ্ঠা : ১৯।

পদ্ধতিতে জবাই করা জরুরি কি না। যেমন : হাতিয়ার ধারালো হওয়া, রগ-শিরা কর্তন করা, ইত্যাদি কি তাদের জন্য জরুরি?

দুই. জবাই করার সময় আহলে কিতাবের জন্য 'বিসমিল্লাহ' পড়া জরুরি কি?

আহলে কিতাবের জন্য শরিয়তসম্মত পদ্ধতিতে পশু জবাই করা

এ মাসআলায় অধিকাংশ আলেমের অভিমত হলো, আহলে কিতাবের জবাই ওই সময় হালাল হবে যখন খুব ভালোভাবে ধারালো হাতিয়ার দিয়ে রগ-শিরা কর্তন করে জবাই করা হবে। এটিই সঠিক অভিমত এবং দলিল প্রমাণ দ্বারা এটিই প্রমাণিত। ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ সামনে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ। কিন্তু এর বিপরীতে সমকালীন কোনো কোনো আলেমের অভিমত হলো, আহলে কিতাবের জবাইকৃত পশু নিঃশর্ত ও সাধারণভাবে হালাল। জবাইকৃত পশু যেভাবেই জবাই করা হোক না কেন। কারণ, আহলে কিতাবের জবাইকৃত পশু হালাল হওয়ার বিষয়টি এ আয়াতের ব্যাপকতার মাঝে নিহিত রয়েছে। যাতে বলা হয়েছে وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ 'যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের খাবার তোমাদের জন্য হালাল'। যারা এমন দাবি করেন তারা কাজি ইবনু আরাবি রহ.-এর এই অভিমত দ্বারা দলিল দিয়ে থাকেন। ইবনু আরাবি রহ.-এর অভিমত হলো—

ولقد سئلت عن النصارني يقتل عنق الدجاجة ثم يطبخها، هل يؤكل معه أو توخذ طعاما منه؟وهى المسئلة الثامنة، فقلت : تؤكل لأنها طعامه وطعام أحباره ورهبانه، وإن لم تكن هذه ذكاة عندنا ولكن الله تعالى أباح طعامهم مطلقا، وكل ما يرونه في دينهم فإنه حلال لنا في ديننا إلا ما كذبهم الله سبحانه فيه.

কাজি ইবনু আরাবি রহ.-এর কাছে এক খ্রিস্টান সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় যে, সে মুরগির ঘাড় মটকিয়ে তাকে মেরে ফেলে তারপর তাকে রান্না করে খায়। এই অবস্থায় কি তার সঙ্গে খাওয়া যেতে পারে? অথবা ওই খ্রিস্টানের খাবার কি কবুল করা যাবে? এটি অষ্টম মাসআলা। তখন আমি তার জবাবে বল্লাম, হ্যাঁ, তা খাওয়া যাবে। কারণ, এই মুরগি তার এবং তার ওলামার খাবার। যদিও এই পদ্ধতিটি আমাদের কাছে শরিয়তসম্মত পদ্ধতি নয়। তবে 'মহান আল্লাহ তাদের খাবার আমাদের

জন্য মুতলাকভাবে হালাল ঘোষণা করেছেন। সুতরাং যে খাবার তাদের ধর্মে হালাল সাব্যস্ত হবে,ওই খাবার আমাদের জন্যও হালাল হিসেবে গণ্য হবে। কেবল ওইসব বিষয় ছাড়া যেসব বিষয়ে 'মহান আল্লাহ তাদেরকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করেছেন।[১৬৬]

কিন্তু ইবনু আরাবি রহ.-এর এই অদ্ভুত অভিমত তার ওই মূল অভিমতের সম্পূর্ণ বিপরীত। যে বক্তব্য তিনি তাঁর ওই কিতাবেরই কয়েক পৃষ্ঠা আগে উল্লেখ করেছেন। যার ভাষ্য হলো এই—

فإن قيل : فما أكلوه ، اي أهل الكتاب، عي غير وجه الذكاة كالخنق وحطم الرأس، فالجواب أن هذه ميتة وهي حرام با لنص، وإن كان أكلوها فلا نأكل نحن كالخنزير، فهو حلال لهم ومن طعامهم، وهو حرام علينا فهذه مثله، والله اعلم.

যদি প্রশ্ন করা হয় যে, আহলে কিতাব যে প্রাণী শরিয়তসম্মতভাবে জবাই করা ছাড়া জবাই করে খায়। উদাহরণস্বরূপ, ঘাড় মটকিয়ে মেরে ফেললো কিংবা শ্বাসরোধ করে মেরে ফেললো। এমন প্রাণীর হুকুম কী? এর জবাব হলো, এটি আমাদের কাছে মৃতপ্রাণী বলে গণ্য হবে এবং তা দলিলের আলোকে হারাম। যদিও তারা ওই পশু খেয়ে থাকে; তবু আমরা তা খাবো না। যেমন : শূকর তাদের জন্য হালাল। এটি তাদের খাবার হিসেবে গণ্য করা হয়। কিন্তু আমাদের জন্য তা হারাম। এ জাতীয় প্রাণীর হুকুমও একই।[১৬৭]

সুতরাং ইবনু আরাবি রহ.-এর উপর্যুক্ত দুটি বক্তব্য বাহ্যত বিপরীতধর্মী অভিমত। আর মূলনীতি হলো, যখন একই ব্যক্তির দুই বক্তব্যে বাহ্যত বৈপরিত্ব দেখা দেবে, তখন ওই অভিমতই গ্রহণ করা উচিত; যা শরিয়তের দলিল দ্বারা প্রমাণিত এবং উম্মতের আমল দ্বারা সমর্থিত। সুতরাং বিরল এসব ফতোয়া গ্রহণযোগ্য হবে না। যা শক্তিশালী একাধিক দলিল-প্রমাণের বিপরীত।

প্রথম দলিল :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ

---

[১৬৬] আহকামুল কুরআন : ইবনু আরাবি রচিত : খণ্ড : ২; পৃষ্ঠা : ৫৫৬।

[১৬৭] আহকামুল কুরআন : ইবনু আরাবি রহ. রচিত : খণ্ড : ২; পৃষ্ঠা : ২৫৫।

وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلا مَا ذَكَّيْتُمْ.

'তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের মাংস, আল্লাহ্ ছাড়া অপরের নামে জবাইকৃত পশু আর শ্বাসরোধে মৃত জন্তু, প্রহারে মৃত জন্তু, পতনে মৃত জন্তু, শৃংগাঘাতে মৃত জন্তু এবং হিংস্র পশুতে খাওয়া জন্তু। তবে তোমরা যা জবাই করতে পেরেছো তা ছাড়া।'

এ আয়াতে [مُنْخَنِقَةُ] 'শ্বাসরোধে মৃত পশু' الْمَوْقُوذَةُ।প্রহারে মৃত জন্তুকে নিঃশর্তভাবে হারাম বলা হয়েছে। তাই এ আয়াতের অধীনে এমন যে-কোনো প্রাণী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যার মৃত্যু শ্বাসরুদ্ধ এবং আঘাতপ্রাপ্ত অবস্থায় হয়েছে। সুতরাং পবিত্র কুরআনের এ আয়াত 'وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ 'যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের খাবার তোমাদের জন্য হালাল।' সার্বিক ও ব্যাপকতার দ্বারা দলিল উত্থাপন করে এ দাবি করা যে, আহলে কিতাবের [مُنْخَنِقَةُ] 'শ্বাসরোধে মৃত জন্তু এবং [موقوذة] প্রহারে মৃত জন্তু' হালাল। তাহলে তাদের এ দাবি করাও উচিত যে, আহলে কিতাবের জবাইকৃত শূকরও হালাল। কারণ, শূকরও আহলে কিতাবের খাবারের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এখন যদি উপর্যুক্ত আয়াত শূকরের গোশত হারাম হওয়ার ওপর দলিল হিসেবে পেশ করা হয়, তাহলে এ আয়াত দ্বারাই [مُنْخَنِقَةُ] 'শ্বাসরোধে মৃত জন্তু' এবং [موقوذة] আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মৃত জন্তু অবৈধতার দলিল পেশ করা হবে। আর এ দু'য়ের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করার কোনো সুযোগ নেই। আর যদি উল্লিখিত আয়াত দ্বারা শূকরের গোশতকে 'আহলে কিতাবের খাবার' বলে নির্দিষ্ট করা হয়, তাহলে এ আয়াত দ্বারা [مُنْخَنِقَةُ] শ্বাসরোধে মৃত ও [موقوذة] আঘাতে মৃত' জন্তুকে আরও নিশ্চিতভাবে নির্দিষ্ট করে দেবে। কারণ, শূকর তাদের ধর্ম মতে হালাল। অথচ [مُنْخَنِقَةُ] শ্বাসরোধে মৃত জন্তু এবং [موقوذة] আঘাতে মৃত জন্তু তাদের মূল ধর্ম মতে হারাম। অচিরেই এ বিষয়ে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ। সুতরাং যেসব খাবার তাদের ধর্ম মতে হালাল। যেমন : শুকর; এ খাবার আহলে কিতাবের খাবারের ওই তালিকা থেকে বাদ থাকবে ; যা মুসলিমের জন্য হালাল। আর ওই খাবার যা তাদের মূল ধর্ম মতে হারাম। যেমন : [مُنْخَنِقَةُ] শ্বাসরোধে মৃত জন্তু এবং [موقوذة] আঘাতে মৃত জন্তু; এগুলো তো সর্বতোভাবে 'আহলে কিতাবের খাবারের তালিকা থেকে বাদ থাকবে।

দ্বিতীয় দলিল :

উসুলে ফিকাহ এবং অভিধান শাস্ত্রে এ কথা প্রতিষ্ঠিত একটি বিষয় যে, যখন কোনো [اسم مشتق] নির্গত বিশেষ্য' এর ওপর হুকুম আরোপিত হয় তখন [ماده اشتقاق 'নির্গত বিশেষ্যর মূল' ওই হুকুমের [علة] তথা 'কারণ' হয়ে থাকে। যেমন : আমরা যখন বলি اكرموا العلماء। 'ওলামাদের সম্মান করো'। এর মাঝে সম্মানের হুকুমটি ওলামাদের ওপর আরোপিত হয়। যা [اسم مشتق] নির্গত বিশেষ্য' এবং তার [ماده اشتقاق] নির্গত বিশেষ্যের মূল হলো [علم] তথা জ্ঞান। সুতরাং এই [علم] তথা জ্ঞান [إكرام] ইকরাম'-এর [علة] বা কারণ। এই নীতি তো একেবারেই স্পষ্ট এবং সর্বজনস্বীকৃত। সুতরাং সুরা মায়েদার এ আয়াতে অবৈধতার হুকুম 'শ্বাসরোধে মৃত এবং আঘাতে মৃত জন্তুর ওপর আরোপিত হয়েছে। এখানে হারাম হওয়ার কারণ শ্বাসরুদ্ধ এবং 'আঘাত' হবে। সুতরাং যেখানেই শ্বাসরুদ্ধ' এবং 'আঘাত' পাওয়া যাবে; সেখানেই হারাম হওয়ার হুকুম আরোপিত হবে। সেখানে শ্বাসরুদ্ধকারী এবং আঘাতকারীর সম্পৃক্ততায় হারাম-হালালের কোনো প্রভাব পড়বে না। সুতরাং শ্বাসরুদ্ধ এবং আঘাত'-এর ফলে প্রাণী হারাম হয়ে যাবে। এখন এই কাজ সম্পাদনকারী মুসলিম হোক কিংবা আহলে কিতাব হোক।

তৃতীয় দলিল :

পবিত্র কুরআনের এ আয়াত—وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ 'যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের খাবার তোমাদের জন্য হালাল।' এ আয়াত থেকে সর্বোচ্চ এতটুকু প্রমাণিত হয় যে, জবাইয়ের ক্ষেত্রে আহলে কিতাব মুসলিমদের সমপর্যায়ের। এ ব্যাপারে উভয়ের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। তবে এ আয়াত দ্বারা আহলে কিতাবের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা প্রমাণিত হয় না। যার কারণে এ কথা বলা যাবে যে, মুসলিমের জবাইকৃত পশু হারাম আর আহলে কিতাবের জবাইকৃত পশু হালাল। আর ইবনু আরাবি রহ.-এর অভিমত মেনে নিলে মুসলিমের ওপর আহলে কিতাবের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। এভাবে যে, আহলে কিতাব যে পদ্ধতিতেই জবাই করুক না কেন তা হালাল আর মুসলিম যদি পশুটিকে আহলে কিতাবদের পদ্ধতিতেই জবাই

করে তাহলে তা হারাম হয়ে যাবে। এ কথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, আহলে কিতাবকে মুসলিমের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া স্পষ্ট ভ্রান্তি।

চতুর্থ দলিল :

মুসলিম উম্মাহর কাছে স্বতসিদ্ধ নীতি হলো,'সব কাফের একই সম্প্রদায়ভুক্ত'। এই নীতির দাবি হলো, আহলে কিতাবের হুকুমও অন্য কাফেরদের মতো হবে। সুতরাং কাফেরদের জবাইকৃত পশু যেমন হারাম তেমনিভাবে আহলে কিতাবের জবাইকৃত পশু হারাম হওয়া বাঞ্চনীয়। কিন্তু ইসলামি শরিয়ত জবাই এবং বিয়ের ক্ষেত্রে আহলে কিতাবকে অন্যান্য কাফের থেকে স্বতন্ত্র ঘোষণা করে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে। কারণ, জবাই এবং বিয়ের বিধান তাদের কাছেও একেবারেই ইসলামি বিধানের মতো। যেমন : জবাইয়ের মাঝে তারা সেসব শর্তসমূহের প্রতি লক্ষ রাখে যেসব শর্ত ইসলাম মুসলিমদের ওপর ফরজ করেছে। জবাইয়ের এই বিধিবিধান এখনো তাদের পবিত্র কিতাবে বিদ্যমান রয়েছে। যদিও তারা নিজেদের মাঝে অনেক নতুন বিষয়ের আবির্ভাব ঘটিয়েছে। এখানে তাদের কিতাবের কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরা হলো—

আল-লাবিয়্যিন' গ্রন্থ—যাকে কিতাবুল আহবারও বলা হয় তাতে উল্লেখ করা হয়েছে—

واما شحم الميتة وشحم المفترسة فيستعمل لكل عمل لكن أكلا لا تأكلوه.

'মৃত প্রাণীর চর্বি এবং হিংস্র প্রাণীর চর্বি সব কাজেই ব্যবহার করা যায়।তবে তা খেতে যেয়ো না।[১৬৮]

আল-ইসতিসনা গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে—

وأما ذبائحك فيسفك دمها على مذبح الرب الهك واللحم تأكله، أحفظ وأسمع جميع هذه كلمات التي أنا أصيك بها لكئ يكون لك ولا ولادك من بعدك خير إلى الأبد إذا علمت الصالح والحق في عيني الرب الهك.

আর তোমাদের জবাইয়ের বিষয়টি হলো: তুমি তোমার প্রভুর নামে তার

[১৬৮] লাবিয়্যিন : খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ২৪।

রক্ত প্রবাহিত করো, যিনি তোমাদের প্রতিপালক এবং তার গোশত খাও। তাকে স্মরণ করো। এসব বিষয় যে সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে অসিয়ত করছি, এগুলো ভালোভাবে শুনে রাখো। যাতে তোমার এবং তোমাদের সন্তানদের মঙ্গল হয়।[১৬৯]

ইহুদি ও খ্রিস্টান উভয় জাতি উপর্যুক্ত গ্রন্থদ্বয়ের অনুসরণ করে থাকে।

খ্রিস্টানদের কিতাব 'আমালুর রুসুল' যা এক পাদ্রী লোকের দিকে সম্পৃক্ত করা হয়ে থাকে। সেখানে এই ভাষ্য বর্ণিত হয়েছে—

ونحن أن لا تضع عليكم ثقلا أكثر غير هذه الأشياء الواجبة أن تمتنعوا عما ذبح للأصنام وعن الدم والمخنوق والزنا.

আমরা তোমাদের ওপর কয়েকটি ওয়াজিব ছাড়া অধিক বোঝা চাপাবো না। আর সেগুলো হলো, তোমরা এমন পশু খাওয়া থেকে বিরত থাকো, যা মূর্তির নামে জবাই করা হয়েছে আর রক্ত থেকে, শ্বাসরোধে মৃত প্রাণী আহার এবং জিনা (ব্যভিচার) থেকে।[১৭০]

এই কিতাবেরই অন্য স্থানে বর্ণিত হয়েছে—

وأما من جهة الذين أمنوا من الامم فأرسلنا نحن إليهم وحكمنا أن لا يحفظوا شيئا مثل ذلك سوي أن يحافظوا على أنفسهم مما ذبح للاصنام ومن الدم ومن المخنوق والزنا.

ওইসব লোকদের জন্য যারা ইমান এনেছে। আমরা তাদের প্রতি এই হুকুম জারি করছি যে, এ জাতীয় কোনো বিষয় থেকে বিরত থাকার প্রয়োজন নেই, শুধু ওইসব বিষয় ছাড়া যেখানে মূর্তির নামে জবাই করা হয়েছে এবং রক্ত থেকে। আর শ্বাসরোধে মৃত জন্তু থেকে এবং জিনা (ব্যভিচার) থেকে।[১৭১]

'বোলোস' যিনি খ্রিস্টান ধর্মের ধারণা অনুযায়ী রাসুল এবং তাদের ইমাম ও নেতা। তিনি তার প্রথম চিঠিতে কোরনাসুস অধিবাসীদের উদ্দেশ্যে লেখেন—

---

[১৬৯] আল-ইসতিসনা : খণ্ড : ১২, পৃষ্ঠা : ২৭-২৮।

[১৭০] আমালুর রুসুল : খণ্ড : ১৮, পৃষ্ঠা : ১৫।

[১৭১] আমালুর রুসুল : খণ্ড : ২০; পৃষ্ঠা : ২৫।

بل ان ما يذبحه الأمم فإنما يذبحون للشياطين لا لله فلست أريد أن تكونوا أنتم شركاء الشياطين لا تقدرون أن تشربوا كأس الرب وكأس الشياطين ولا تقدرون أن تشتركوا في مائدة الرب وفي مائدة الشياطين.

'বরং যেসব জাতি প্রাণী জবাই করে, তারা শয়তানের নামে জবাই করে আল্লাহর নামে জবাই করে না। আমি চাই না তোমরা শয়তানের অংশীদার হও। তোমরা এমন ক্ষমতা রাখো না যে, আল্লাহর পেয়ালা থেকে পান করবে এবং শয়তানের পেয়ালা থেকেও পান করবে। আর তোমরা এতেও সক্ষম নও যে, তোমরা আল্লাহর এবং শয়তানের দস্তরখান একসঙ্গে করে নেবে।[১৭২]

প্রসঙ্গক্রমে এখানে এ কথা বলে রাখা দরকার যে, বোলোস' এমন ব্যক্তি যিনি ইসা আ.-এর অকাট্য প্রমাণাদির বিরুদ্ধে এই নির্দেশ দেন, খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে তাওরাতের সব বিধিবিধান রহিত হয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও তিনি জবাইয়ের বিধিবিধান সম্পূর্ণ অক্ষত রেখে দেন। যেমন : তিনি 'শ্বাসরোধে মৃত জন্তু' হারাম হওয়ার নির্দেশ চালু রাখেন। আল্লাহর নামে জবাই করা ওয়াজিব হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। এতে বোঝা গেলো, জবাইয়ের বিধিবিধান খ্রিস্টানদের মাঝে মূল মাজহাবের অনুসরণ এমনভাবে বহাল রয়েছে যেমনিভাবে ইহুদিদের মাঝেও রয়েছে। ইহুদিদের গ্রন্থাবলিতে জবাই সংক্রান্ত বিধানের আলোচনা বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। যেমন : 'মিশনা' (এটি ইহুদিদের নিকট শরয়ি বিধিবিধান সম্বলিত একটি মৌলিক কিতাব) গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে—

'If he slaughtered with a had-sick or with blint or with a read what he velid. All amy slaughers and at any time and with any implement excepting a reaping sickle or a saw or teeth or the binger nail, since these choke.'

'যদি কোনো ব্যক্তি হাতের ছুরি অথবা ধারালো কাঁচ কিংবা বাঁশের

[১৭২] আমালুর রুসুল : খণ্ড : ২০; পৃষ্ঠা : ২০-২১।

বাকল দ্বারা কোনো পশু জবাই করে, তাহলে ওই পশু হালাল। প্রত্যেক ব্যক্তি যে সময় মনে চায়, যে জিনিস দ্বারা চায় জবাই করতে পারবে। তবে কাস্তে, কাঁচি, দাঁত এবং হাতের নখ দ্বারা জবাই করা জায়েজ নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত দাঁত এবং নখ দেহে সংযুক্ত থাকে। কারণ, তা শ্বাসরুদ্ধ করার শামিল।[১৭৩]

ডাক্তার হার্বাড জ্যানি, 'মিশনার' উল্লিখিত আলোচনার অধীনে লিখেছেন, জবাই সংক্রান্ত যে পরিমাণ বিধিবিধান ইহুদিরা অনুসরণ করে থাকে, তা মূলত তাদের ধর্মের এবং শরিয়তের বুনিয়াদি অংশ। বিশেষত, যা মুসা আ.-কে তুর পর্বতে দেওয়া হয়েছিলো। যার সারমর্ম পাঁচটি বিষয়ের মাঝে সীমাবদ্ধ।

১. পশুর গলায় ছুরি চালানোকালে সময়-ক্ষেপন না করা ওয়াজিব। বরং ওয়াজিব হলো, ছুরি সামনে-পেছনে ধারাবাহিকভাবে চালাতে থাকা।
২. জবাই করার সময় প্রাণীর ওপর কোনো ভারি বস্তু না রাখা ওয়াজিব।
৩. জবাই করার সময় প্রাণীর চামড়ায় কিংবা গলায় অথবা অন্য কোনো রগের ওপর ছুরির চাপ প্রয়োগ না করা ওয়াজিব।
৪. জবাই করার সময় ছুরি শ্বাসনালীর ওই স্থান অতিক্রম না করা যে স্থান দিয়ে কাটা হচ্ছে।
৫. এ বিষয়টিও লক্ষ্ রাখা জরুরি যে, জবাই করার সময় খাদ্যনালী কিংবা রগ-শিরা ওইসব স্থান থেকে সরানোর ক্ষেত্রে যেন কোনো প্রভাব না পড়ে।[১৭৪]

মোটকথা, উল্লিখিত বিষয়গুলো তাদের ওই গ্রন্থাবলিতে বর্ণিত হয়েছে যেসব গ্রন্থকে ইহুদি-খ্রিস্টানরা পবিত্র মনে করে। যেগুলো তাদের ধর্ম ও শরিয়তের মূল উৎস হিসেবে বিবেচিত।

এসব দলিল-প্রমাণাদি নিচের বিষয়গুলোর প্রতি ইঙ্গিত করে—

প্রথমত : শ্বাসরোধে মৃত পশু এবং প্রহারে মৃত পশু তাদের ধর্মেও হারাম যেমনিভাবে আমাদের শরিয়তে হারাম।

---

[১৭৩] the mishmash mullim ১. ৫১৩ oxford ১৯৮৭।

[১৭৪] the mishmash mullim ১. ৫১৩ oxford ১৯৮৭.

দ্বিতীয়ত : তাদের ধর্মে আল্লাহর জন্য জবাই করা ওয়াজিব। কিংবা ভিন্ন ভাষায় এইভাবে বলা যায় যে, আল্লাহর নামের ওপর জবাই করা ওয়াজিব। যেমন : 'কোরনাসুস' অধিবাসীদের উদ্দেশ্যে লেখা চিঠিতে এমনটিই প্রকাশ পেয়েছে। ইতোপূর্বে এই আলোচনা অতিবাহিত হয়েছে।

তৃতীয়ত : কাজি ইবনু আরাবি রহ.-ওই মুরগি হালাল হওয়ার ফতোয়া দিয়েছেন; যে মুরগি কোনো খ্রিস্টান ব্যক্তি ঘাড় মটকিয়ে হত্যা করেছে। যেমনটি আহকামুল কুরআন থেকে প্রতীয়মান হয়। এই ফতোয়াটি যদি তার প্রতি সম্পর্কিত হওয়া সঠিক হয়, তাহলে তার এই ফতোয়াটি তারই ভিন্ন আরেকটি ফতোয়ার সঙ্গে সাংঘর্ষিক বলে মনে হয়। যা আহকামুল কুরআনেই বিদ্যমান। আর এই ফতোয়াটি ধারণার ভিত্তিতে বলেছেন যে, খ্রিস্টানদের কাছে 'শ্বাসরোধে মৃত পশু' হালাল। এই মাসআলায় তারা এর কারণ বর্ণনা করেছেন, যে জিনিস খ্রিস্টানদের ধর্মমতে হালাল তা আমাদের ধর্মেও হালাল। তবে স্বয়ং খ্রিস্টানদের গ্রন্থ থেকে এই নীতিমালা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। কারণ, খ্রিস্টানদের পবিত্র গ্রন্থে 'শ্বাসরোধে মৃত জন্তু' হারাম হওয়ার ব্যাপারে পরিস্কার ঘোষণা এসেছে। যেমন : 'আমালুর রাসুল' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং যদি শায়খ ইবনু আরাবি রহ. জানতেন যে, শ্বাসরোধে মৃত জন্তু' খ্রিস্টানদের কাছে হারাম তাহলে তিনি এমন ফতোয়া দিতেন না।

চতুর্থত : ইবনু কাসির রহ. এব্যাপারে যা বলেছেন, ইহুদি খ্রিস্টানদের অকাট্য প্রমাণাদি থেকে এগুলোর বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হয়। যেমন : তিনি বলেছেন—

'আলেমগণ এ বিষয়ে একমত যে, ইহুদি-খ্রিস্টানদের জবাইকৃত পশু মুসলিমদের জন্য হালাল। কারণ, তারা গাইরুল্লাহর নামে জবাই করাকে হারাম মনে করে এবং নিজেদের জবাইয়ে আল্লাহর নাম নেওয়া ছাড়া অন্য কারও নাম নেয় না। যদিও তারা মহান আল্লাহ সম্পর্কে এমন আকিদা-বিশ্বাস রাখে, (ত্রিত্ববাদ, ইত্যাদি বিশ্বাস) যা থেকে 'মহান আল্লাহ সম্পূর্ণ পবিত্র।[১৭৫]

[১৭৫] তাফসিরে ইবনু কাসির, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৯।

পঞ্চম দলিল :

খ্রিস্টানদের [مخنوقة] শ্বাসরোধে মৃত জন্তু ও [موقوذة] প্রহারে মৃত জন্তুকে হালাল সাব্যস্ত করার দ্বারা এ ফলাফলটি আবশ্যক করে যে, [خانق] শ্বাসরুদ্ধকারী এবং [واقذ] প্রহারকারী মুসলিম হলে পশুটি হারাম হচ্ছে। আর শ্বাসরুদ্ধকারী খ্রিস্টান হলে প্রাণীটি যদিও খ্রিস্টান ধর্মে হারাম হচ্ছে এরপরও আমরা বলছি যে, খ্রিস্টানদের [مخنوقة] শ্বাসরোধে মৃত জন্তু' মুসলিমদের জন্য বৈধ। বিষয়টি এমন হলো, যেন [خانق] শ্বাসরুদ্ধকারী কাফের হওয়ায় তার স্বাতন্ত্রতা ও বিশেষ সম্মানজনক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যে বৈশিষ্ট্যের কারণে তার এই কাজটিকে বৈধ সাব্যস্ত করা হয়েছে। যদিও এটি তার এবং আমাদের শরিয়তে সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। আর এসব স্পষ্ট ভ্রান্ত বিষয়গুলো সৃষ্টি হয়েছে মূলত আমাদের এই কথার কারণে যে, আহলে কিতাব যে প্রাণী হত্যা করবে তা মুসলিমের জন্য হালাল। তা শরিয়ত-বহির্ভূত পন্থায় হত্যা করলেও হালাল হবে। আর যে কথার দ্বারা এমন বাতিল ফলাফল সৃষ্টি হয়, তাও বাতিল হিসেবেই গণ্য হবে।

ষষ্ঠ দলিল :

ইহুদি ও খ্রিস্টানদের মাঝে অন্য কাফেরদের তুলনায় যে বৈশিষ্ট্য অর্জিত হয়েছে তা মূলত দুটি বিষয়ের কারণে। এক. তাদের জবাইকৃত পশু মুসলিমদের জন্য হালাল। দুই. তাদের নারীদের সঙ্গে মুসলিমদের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা জায়েজ। স্বতসিদ্ধ নীতি হলো, মুসলিমদের জন্য আহলে কিতাব' নারীদের বিয়ে করা তখনই বৈধ হবে যখন বিয়ের মাঝে ওইসব শর্ত পাওয়া যাবে যা আমাদের শরিয়তে বিদ্যমান। সুতরাং কোনো মুসলিম যদি আহলে কিতাব' কোনো নারীকে শরিয়ত-পরিপন্থি পন্থায় বিয়ে করে, যেমন : ওই নারী যদি তার মাহরামের অন্তর্ভুক্ত হয়; অথবা সাক্ষী ছাড়া বিয়ে করে কিংবা শরিয়ত বিয়ের যে নীতিমালা প্রণয়ন করেছে যথা [إيجاب] 'প্রস্তাব' [قبول] গ্রহণ' ছাড়াই বিয়ে করে নেয়, তাহলে কোনো ব্যক্তিই এই বিয়েকে হালাল হিসেবে গণ্য করবেন না। এতে বোঝা যায়, আহলে কিতাব নারীর সঙ্গে বিয়ে হালাল হওয়া ওই শর্তের সঙ্গে শর্তযুক্ত যে, ওই বিয়ে ইসলামি শরিয়ত অনুযায়ী হতে হবে। আর তা না হলে তা শুদ্ধ করার

জন্য পবিত্র কুরআনের আয়াত—وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ 'ইহুদি-খ্রিস্টানদের নারী তোমাদের জন্য হালাল' দ্বারা প্রমাণ দেওয়া আদৌ ঠিক হবে না। (এ কথা বলা যাবে না যে, আহলে কিতাব নারীগণ যেহেতু আমাদের জন্য হালাল; যে-কোনোভাবেই হোক বিয়ে হালাল। তা শরিয়তসম্মত পন্থায় হোক কিংবা শরিয়ত-বহির্ভূত পন্থায় অর্জিত হোক।

সুতরাং বিয়ের ক্ষেত্রে যখন এই নীতি, তাহলে জবাইয়ের ক্ষেত্রেও একই নীতি প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ, তাদের জবাইকৃত পশু আমাদের জন্য তখনই হালাল হবে যখন তা শরিয়তসম্মত পন্থায় জবাই করা হবে। আর যদি শরিয়ত-বহির্ভূত পন্থায় জবাই করে, যেমন : [خنق] 'শ্বাসরুদ্ধ করে' কিংবা [وقذ] প্রহার করে, তাহলে তাকে এ আয়াতের وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ 'যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে, তাদের খাবার তোমাদের জন্য হালাল') দ্বারা হালাল হওয়ার প্রমাণ দেওয়া কীভাবে সঠিক হবে? যে ক্ষেত্রে বিয়ে এবং জবাই একই ধরনের দুই হুকুম।

[ميتة] 'মৃত জন্তু' [منخنقة] শ্বাসরোধে মৃত এবং [موقوذة] প্রহারে মৃত জন্তুর [حرمت] হারাম হওয়াটা যেহেতু অকাট্য প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত; তাই ফকিহগণ এ বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন। [خانق] শ্বাসরুদ্ধকারী এবং [واقذ] প্রহারকারী আহলে কিতাব হলেও আমাদের জানামতে কাজি ইবনু আরবি রহ. ছাড়া আর কোনো ব্যক্তি [منخنقة] শ্বাসরোধে মৃত জন্তু এবং [موقوذة] প্রহারে মৃত জন্তুকে হালাল বলেননি। উল্লেখ্য, কাজি ইবনু আরাবি রহ.-ও শুধু উল্লিখিত এক স্থানেই হালাল সাব্যস্ত করেছেন। আবার তার এই ভাষ্যটি তারই অন্য ভাষ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। যা ওই গ্রন্থেরই মাত্র এক পৃষ্ঠা পূর্বে যে আলোচনা হয়েছে সেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন। তার দুটি অভিমতই একটির সঙ্গে অপরটি সাংঘর্ষিক। সুতরাং তাহলে আমরা কি কুরআন-হাদিসের এসব অকাট্য দলিল-প্রমাণ এবং ওইসব শক্তিশালী দলিল-প্রমাণ যা আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি তা বাদ দিয়ে শুধু ইবনু আরাবি রহ.-এর বিরল এ ফতোয়ার ওপর ছেড়ে দেবো? যেখানে স্বয়ং ফতোয়াদুটি স্ব-বিরোধী। শুধু এ ধারণার ওপর ভিত্তি করে যে, খ্রিস্টান ধর্মে [منخنقة] 'শ্বাসরোধে মৃত প্রাণী' হালাল? অথচ খোদ খ্রিস্টানদের পবিত্র গ্রন্থ থেকে সেই বিষয়টিও ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়।

এখন যদি আমরা ইবনু আরাবি রহ.-এর বিরোধপূর্ণ দুটি অভিমত থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে এ কথা মেনে নিই যে, তার বিশুদ্ধ মাজহাব এটিই। তবুও তার এই মাজহাব বিরল। কারণ, কুরআন-হাদিসের শক্তিশালী দলিল তাকে খণ্ডন করে দিয়েছে। যা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। সুতরাং এমন নাজুক বিষয়ে বিরল এই ফতোয়া গ্রহণ করা কোনোক্রমেই বাঞ্ছনীয় নয়। যেহেতু বিষয়টি [حلت] বৈধ এবং [حرمت] অবৈধতার একটি বিষয়। আর শরিয়তের নীতি হলো, [حلت] বৈধতা' আর [حرمت] অবৈধতার মাঝে মতভেদ সৃষ্টি হলে [حرمت] অবৈধতার দিকটি প্রধান্য পেয়ে থাকে। আর এ ক্ষেত্রে তো শরিয়তের অকাট্য প্রমাণ ও আহলে ইলমদের ঐকমত্যের প্রতি লক্ষ্ করে [حرمت] অবৈধতার দিকটিই নির্দিষ্ট হয়ে যায়।

মোটকথা, সঠিক অভিমত হলো, আহলে কিতাবের জবাইকৃত পশু ততক্ষণ পর্যন্ত হালাল হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত পশুকে শরিয়তসম্মত পদ্ধতিতে জবাই না করা হবে। অর্থাৎ, রগ-শিরা কেটে রক্ত প্রবাহিত করে দেওয়া না হয়। আর যদি আহলে কিতাব কোনো প্রাণী শরিয়ত-বহির্ভূত পন্থায় হত্যা করে, যেমন : শ্বাসরোধে হত্যা কিংবা প্রহারে হত্যা করে তাহলে ওই প্রাণী হারাম হিসেবেই বিবেচিত হবে।

আহলে কিতাবের জবাইয়ে কি 'বিসমিল্লাহ' শর্ত?

দ্বিতীয় বিষয় হলো, আহলে কিতাবের জবাইকৃত পশু হালাল হাওয়ার জন্য কি জবাইয়ের সময় 'বিসমিল্লাহ' বলা শর্ত? এ বিষয়ে ফকিহগণের বিভিন্ন অভিমত রয়েছে।

প্রথম অভিমত :

প্রথম অভিমত হলো, মুসলিম ও আহলে কিতাব উভয়ে জবাইকৃত পশু হালাল হওয়ার জন্য 'বিসমিল্লাহ' বলা শর্ত। এ ব্যাপারে আহলে কিতাব ও মুসলিমদের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। এটিই হানাফি মাজহাব ও হাম্বালি মাজহাবের অভিমত। যেমনটি ইবনু কুদামা রহ. উল্লেখ করেছেন—

فالتسمية مشترطة في كل ذابح مع العمد سواء كان مسلما أو كتابيا. فإن ترك الكتابي التسمية عن عمد أو ذكر اسم غير الله لم تحل

ذبيحته. وروي ذلك عن علي. وبه قال النخعي والشافعي وحماد وإسحاق وأصحاب الرأي.

'প্রত্যেক জবাইকারীর জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে 'বিসমিল্লাহ' বলা শর্ত। জবাইকারী মুসলিম হোক কিংবা আহলে কিতাব। যদি আহলে কিতাব ইচ্ছাকৃতভাবে 'বিসমিল্লাহ' ছেড়ে দেয় এবং জবাইয়ের সময় 'মহান আল্লাহর নাম ছাড়া অন্য কারও নাম নেয়, তাহলে জবাইকৃত পশু হালাল হবে না। আলি রা. থেকে এমন অভিমতই বর্ণিত হয়েছে। ইমাম নাখায়ি রহ., ইমাম শাফিয়ি রহ. ইমাম হাম্মাদ রহ, ইমাম ইসহাক রহ. এবং আসহাবে রায় তারা সবাই এমন অভিমতই ব্যক্ত করেছেন।

কাসানি রহ. বাদায়েউস সানায়ে গ্রন্থে লেখেন—

ثم إنما تؤكل الكتابي إذا لم يشهد ذبحه ولم يسمع منه شيئ أو سمع وشهد منه تسمية الله تعالى وحده لأنه إذا لم يسمع منه شيئ يحمل على أنه قد سمي الله تبارك وتعالي وجرد التسمية تحسينا للظن به كما بالمسلم ولو سمع منه ذكر اسم الله لكنه عني بالله عز وجل المسيح عليه الصلاة والسلام قالوا : تؤكل لأنه أظهر تسمية هي تسمية المسلمين إلا إذا نص فقال : بسم الله الذي هو ثالث وثلاثة فلا تحل وقد روي عن سيدنا على رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن ذبائح أهل الكتاب وهم يقولون ما يقولون. فقال رضي الله تعالى عنه : قد أحل الله ذبائحهم وهو يعلم ما يقولون فأما إذا سمع منه أنه سمي المسيح عليه الصلاة والسلام وحده أو سمي الله سبحانه وتعالي وسمي المسيح لاتؤكل ذبيحته كذا روي عن سيدنا على رضي الله تعالى عنه ولم يرو عنه غيره خلافه.

'যদি আহলে কিতাবের পশু জবাইকালে কেউ উপস্থিত না থাকে এবং জবাইয়ের সময় তার থেকে কোনো শব্দও শোনা না যায়; কিংবা জবাইয়ের সময় কেউ উপস্থিত ছিলো এবং সে জবাই করার সময় আহলে কিতাব থেকে 'বিসমিল্লাহ শুনে থাকে, তাহলে এসব অবস্থায় আহলে কিতাবের জবাইকৃত পশু খাওয়া যাবে। কারণ, যে অবস্থায় তার থেকে কেউ 'বিসমিল্লাহ' শুনেনি, (সে অবস্থায়ও খাওয়া যাবে) এ অবস্থাকে একজন মুসলিমের অবস্থার সঙ্গে তুলনা করা হবে। যেমন : এ অবস্থায়

সাধারণত একজন মুসলিমের প্রতি সুধারণা পোষণ করা হয়; ঠিক তেমনি এ অবস্থায় আহলে কিতাবের প্রতিও সুধারণা পোষণ করা হবে এবং সেই ভিত্তিতেই বলা হবে যে, সে জবাইয়ের সময় শুধু আল্লাহর নাম নিয়েছে। আর যদি আহলে কিতাব থেকে আল্লাহর নাম শোনা গেছে কিন্তু (নাউজুবিল্লাহ) সে এর দ্বারা উদ্দেশ্য নিয়েছে ইসা আ.-কে। এ ব্যাপারে ফকিহগণের অভিমত হলো, ওই পশু খাওয়া যাবে। কারণ, জবাইয়ের সময় তো সে ওই বিসমিল্লাহই পড়েছে যা মুসলিমদের 'বিসমিল্লাহ'। তবে হ্যাঁ, যদি আহলে কিতাব পরিস্কার ভাষায় এই বাক্য বলে بسم الله الذي هو ثالث وثلاثة 'তার নামে জবাই করছি যিনি (আল্লাহ)-এর তৃতীয় জন।' এই অবস্থায় তার জবাইকৃত পশু হালাল হবে না। এক বর্ণনায় এসেছে যে, আলি রা.-এর কাছে আহলে কিতাবের জবাই সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো যে, তারা তো জবাইয়ের সময় এমন এমন কথাও বলে থাকে। জবাবে আলি রা. বলেন, তাদের জবাইকৃত পশু 'মহান আল্লাহ হালাল করেছেন। অথচ 'মহান আল্লাহ জানেন তারা কী কী বলে থাকে। সুতরাং যদি কোনো আহলে কিতাব সম্পর্কে শোনা যায় যে, জবাইয়ের সময় তারা শুধু ইসা আ.-এর নাম নিয়েছে কিংবা আল্লাহর নামের সঙ্গে ইসা আ.-এর নামও নিয়েছে তাহলে তার জবাইকৃত পশু খাওয়া যাবে না। আলি রা থেকে এভাবেই বর্ণিত হয়েছে। এর বিপরীত কিছু বর্ণিত হয়নি।[১৭৬]

দ্বিতীয় অভিমত :

এ ব্যাপারে ফকিহগণের দ্বিতীয় অভিমত হলো, আহলে কিতাবের জবাইকৃত পশু হালাল হওয়ার জন্য জবাইয়ের সময় 'বিসমিল্লাহ' বলা ওয়াজিব নয়। তাই আহলে কিতাব যদি জবাইয়ের সময় 'বিসমিল্লাহ' বলা থেকে বিরত থাকে তবু তার জবাইকৃত পশু হালাল হবে। তবে হ্যাঁ, যদি সে জবাইয়ের সময় অন্য কারও নাম নেয়; উদাহরণস্বরূপ ইসা আ.-এর নাম নিলো। তাহলে তার জবাইকৃত পশু হালাল হবে না। এই অভিমতটি মালিকি মাজহাবের। যেমন : শায়খ দারদির রচিত 'শরহু সগির' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন—

وجب عند التذكية ذكر اسم الله بأي صيغة من تسمية أو تهليل أو

[১৭৬] বাদায়েউস সানায়ে, খণ্ড : ৫; পৃষ্ঠা : ৪৬

تسبيح أو تكبير لكن لمسلم لا كتابي فلا يجب عند ذبحه ذكر الله بل الشرط أن لا يذكر اسم غيره مما يعقد ألوهيته

'تذكية' অর্থাৎ, জবাইয়ের সময় আল্লাহর নাম নেওয়া ওয়াজিব। যে-কোনো শব্দ দ্বারাই হোক না কেন। 'বিসমিল্লাহ' বলে, অথবা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে, কিংবা 'সুবহানাল্লাহ' বলে বা 'আল্লাহু আকবার' বলে। তবে ওয়াজিবের এই হুকুমটি মুসলিমদের জন্য প্রযোজ্য, আহলে কিতাবের জন্য নয়। তাই জবাইয়ের সময় আহলে কিতাবের জন্য আল্লাহর নাম নেওয়া ওয়াজিব নয়। বরং তাদের জন্য শর্ত হলো, আল্লাহ্ ছাড়া যেসব উপাস্যের ওপর বিশ্বাস রাখে জবাইয়ের সময় তাদের নাম না নেওয়া।[১৭৭]

তৃতীয় অভিমত :

আহলে কিতাবের জবাইকৃত পশু হালাল হওয়ার জন্য 'বিসমিল্লাহ' বলা ওয়াজিব নয়। জবাইয়ের সময় যদিও আল্লাহর নাম নেওয়া ছাড়া অন্য কারও নাম নেয় তবুও তাদের জবাইকৃত পশু হালাল। এই অভিমতটি আতা রহ., মুজাহিদ রহ., মাকহুল রহ.-এর। ইবনু কুদামা রহ. যেমনিভাবে ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছেন।[১৭৮]

মোটকথা, আমরা যদি বর্ণিত দলিল-প্রমাণের বিশ্লেষণ করি তাহলে উল্লিখিত তিনটি অভিমতের মাঝে প্রথম অভিমতটিই প্রাধান্য পাওয়ার ক্ষেত্রে বেশি যুক্তিযুক্ত। কারণ, 'মহান আল্লাহ বলেন—

﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾

বর্ণিত আয়াতে لم يذكر শব্দটি مجهول-এর صيغة। যা এই কথার স্পষ্ট প্রমাণ যে, 'বিসমিল্লাহ' ছেড়ে দিলে পশুটি হারাম হয়ে যাবে। এতে জবাইকারী মুসলিম হোক কিংবা আহলে কিতাব হোক। একইভাবে হারাম বস্তু বর্ণনা করতে গিয়ে 'মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ এ আয়াতে أهل শব্দটিও مجهول-এর صيغة হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। যা মুসলিম ও আহলে কিতাব সবাইকে অন্তর্ভুক্ত

---

[১৭৭] শারহুস সগির, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১৭১-১৭২।

[১৭৮] ইবনু কুদামা রহ. রচিত আল-মুগনি, খণ্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ৫৬।

করে। এমনিভাবে 'মহান আল্লাহর উক্তি: وما ذبح على النصب 'যাকে প্রতিমার নামে বলি দেওয়া হয়' এ আয়াতে '' শব্দটি مجهول এর صيغة ব্যবহৃত হয়েছে।

আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করে এসেছি যে, ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সবাই আল্লাহর নামেই পশু জবাই করে থাকে। 'বোলোস' খ্রিস্টানদের জন্য অন্যান্য সম্প্রদায়ের জবাইকৃত পশু হারাম ঘোষণা করেছিলেন। কারণ, অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরা পশু জবাইয়ের সময় আল্লাহর নাম নেওয়া ছাড়া শয়তানের নাম নিয়ে থাকে। এর বর্ণনা ইতোপূর্বে আলোচিত উদ্ধৃতিতে আলোচনা করা হয়েছে। যা 'বোলোস' এর প্রথম চিঠি থেকে নেওয়া হয়েছে। যে চিঠি তিনি কোরনাসুস অধিবাসীদের উদ্দেশে লিখেছিলেন। এ কারণেই আহলে কিতাবের জবাইকৃত পশু মুসলিমদের জন্য হালাল করা হয়েছে। যার বিবরণ ইতোপূর্বে ইবনু কাসির রহ.-এর উদ্ধৃতিতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং আহলে কিতাব যদি 'বিসমিল্লাহ' ছেড়ে দেয় অথবা জবাইয়ের সময় আল্লাহর নাম নেওয়া ছাড়া অন্য কারও নাম নেয়, তাহলে হারাম হওয়ার হুকুম পুনরায় ফিরে আসবে। কারণ, যে علت (কারণ) এর জন্য আহলে কিতাবের জবাইকৃত পশু হালাল ছিলো, সে علت (কারণ) এখন আর অবশিষ্ট নেই।

আমরা ইতোপূর্বে আহলে কিতাবের 'শ্বাসরোধে মৃত' ও আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মৃত জন্তু' হারাম হওয়ার বিষয়টি দলিল-প্রমাণসহ বর্ণনা করেছি এবং সেসব প্রমাণাদির অধিকাংশ জবাইয়ের সময় আল্লাহর নাম নেওয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল। তবে 'বিসমিল্লাহ' ছেড়ে দেওয়ার বিষয়টি শ্বাসরোধে মৃত ও আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মৃত' জন্তুর তুলনায় এই হিসাবে বেশি সহজ ও সরল যে আহলে কিতাব যদি 'বিসমিল্লাহ' ছেড়ে দেয় তাহলে সেই পশু হালাল-হারামের বিষয়টি ইজতিহাদ-নির্ভর। এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু 'শ্বাসরোধে মৃত ও আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মৃত' জন্তুর মাসআলা নিয়ে মাজহাবের ইমামদের মাঝে কোনো মতানৈক্য নেই। এমনকি এটি কোনো মতানৈক্যের বিষয়ও নয়। কাজি ইবনু আরাবি রহ.-এর পক্ষ থেকে স্ববিরোধী বক্তব্যেরও কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। এটুকুরও সুযোগ নেই যে, উল্লেখিত কারণে উল্লিখিত মাসআলাটিকে নূন্যতম মতভেদপূর্ণ মাসআলা বলা যেতে পারে।

মোটকথা, বাহ্যিক অকাট্য ও বিশুদ্ধ প্রমাণের আলোকে গ্রহণযোগ্য অভিমত হলো, আহলে কিতাবের জবাইকৃত পশু মুসলিমদের জন্য তখনই হালাল হিসেবে

বিবেচিত হবে। যখন জবাইয়ের সময় কুরআন-হাদিসে বর্ণিত সব নীতিমালার অনুসরণ করবে। এছাড়া যে সময় তাদের জবাইকৃত পশু খাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিলো। ওই সময় সেই শর্তসমূহ বহাল ছিলো।

যারা নিজেদের খ্রিস্টান বলে পরিচয় দেয় সেসব বস্তুবাদী নাস্তিকদের জবাইকৃত পশুর হুকুম

আহলে কিতাবের জবাইকৃত পশু হালাল হওয়ার জন্য শর্ত হলো জবাইকারী ইহুদি ও খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারী হতে হবে এবং ওই ধর্মের মৌলিক আকিদা-বিশ্বাসে বিশ্বাসী হতে হবে। যদিও সেই আকিদা-বিশ্বাস ইসলামের পরিপন্থি হয়। উদাহরণস্বরপ ত্রিত্ববাদ-এর বিশ্বাস, কাফফারা-এর বিশ্বাস, বিবর্তিত তাওরাত ও ইঞ্জিলের ওপর ইমান আনা, ইত্যাদি। এর কারণ হলো, কুরআন নাজিলের সময় যদিও তারা ভ্রান্ত আকিদা-বিশ্বাসে বিশ্বাসী ছিলো। তবুও মহান আল্লাহ্ তাদেরকে 'আহলে কিতাব' উপাধিতে ভূষিত করেছেন। আর পবিত্র কুরআন তাদের ভ্রান্ত আকিদা-বিশ্বাসের কথা স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছে—

﴿وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ﴾

এবং খ্রিস্টানরা বলে, মাসিহ্ আল্লাহর পুত্র।হ্[১৭৯]

অন্য আয়াতে বলেছেন—

﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ﴾

তারা নিশ্চয় অবিশ্বাসী (কাফের), যারা বলে, আল্লাহ্ তো তিনের মধ্যে একজন।[১৮০]

মহান আল্লাহ্ আরও বলেন—

﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ﴾

'ইহুদিরা বলে উজায়ের আল্লাহর পুত্র'[১৮১]

---

[১৭৯] সুরা তাওবা, আয়াত : ৩০।

[১৮০] সুরা মায়িদা, আয়াত : ৭৩।

[১৮১] সুরা তাওবা, আয়াত : ৩০।

আরেক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন—

﴿يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾

'তারা (তাওরাতের) বাক্যাবলির পরিবর্তন সাধন করে থাকে'[১৮২]

এ বিষয়ে আহকামুল কুরআনে ইমাম জাস্সাস রহ. বলেন—

وروي عبادة بن نسي عن غضيف بن الحارث أن عاملا لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كتب اليه ان ناسا من السامرة يقرؤن التوراة ويسبون السبت ولا يؤمنون بالبعث، فما تري؟ فكتب اليه عمر : أنهم طائفة من أهل الكتاب.

'উমর ইবনু খাত্তাব রা.-এর কাছে তার এক গভর্ণর এই মর্মে পত্র লেখেন যে, 'সামিরা' কওমের কিছু লোক তাওরাত পাঠ করে। তারা সপ্তাহে এক দিনকে ধর্মীয় উৎসবের দিন মনে করে। পুনরুত্থান দিবসে তারা বিশ্বাসী নয়। এদের বিষয়ে আপনার সিদ্ধান্ত কী? জবাবে উমর ইবনু খাত্তাব রা. বলেন, তারাও আহলে কিতাবের একটি অংশ।'[১৮৩]

এর দ্বারা স্পষ্টভাবে বোঝা গেলো, কোনো ব্যক্তি আহলে কিতাব হওয়ার জন্য নির্ভেজালভাবে তাওহিদের বিশ্বাসী হওয়া শর্ত নয়। জরুরিও নয়। বিদ্যমান বিকৃত 'তাওরাত ও ইঞ্জিলের ওপর বিশ্বাস রাখতে হবে এমনটিও শর্ত নয়। মুসা আ. ও ইসা আ.-এর শরিয়ত রহিত হয়ে গেছে এমন বিশ্বাস রাখাও শর্ত নয়। বরং 'আহলে কিতাব' হওয়ার জন্য ইহুদি-খ্রিস্টানদের ওইসব মৌলিক আকিদায় বিশ্বাসী হওয়াই যথেষ্ট যেসব আকিদা-বিশ্বাসের কারণে অন্যান্য ধর্ম থেকে তাদের মাঝে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য অর্জিত হয়।

তবে কেউ 'আহলে কিতাব' হিসেবে গণ্য হওয়ার জন্য শুধু এতটুকুই যথেষ্ট নয় যে, তার নাম খ্রিস্টানদের নামের মতো হবে। আর এতটুকুই যথেষ্ট নয় যে, সরকারী আদম শুমারির সময় তার তালিকা খ্রিস্টানদের তালিকার অন্তর্ভুক্ত করে নেবে। বরং এ ক্ষেত্রে জরুরি হলো, তার আকিদা-বিশ্বাস আহলে কিতাবের আকিদা-বিশ্বাসের মতো হতে হবে। বর্তমান সময়ে বিশেষত, পাশ্চাত্য দেশসমূহে এমন লোকের বিশাল সংখ্যা রয়েছে যে, যাদের নাম খ্রিস্টানদের নামের মতো, আবার

---

[১৮২] সুরা মায়িদা, আয়াত : ১৩।

[১৮৩] ইমাম জাস্সাস রহ. রচিত আহকামুল কুরআন, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩২৩।

কোনো কোনো সময় আদমশুমারিতে তাদের নাম খ্রিস্টানদের নামের তালিকার মাঝে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা বস্তুবাদী ও নাস্তিক্যবাদে বিশ্বাসী। সে বস্তুবাদী ও নাস্তিক্যবাদী চিন্তা-চেতনার অধিকারী মানুষ হয়ে থাকে। সুতরাং যেসব মানুষ এই ভূ-খণ্ডের সৃষ্টিকর্তার ওপর ইমান রাখে না। অন্যান্য আকিদা-বিশ্বাস রাখা তো দূরের কথা বরং তারা ধর্মীয় বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-মশকরা করে। তারা মূলত খ্রিস্টান হিসেবে গণ্য নয়। সুতরাং তাদেরকে 'আহলে কিতাব' ও বলা যাবে না এবং তাদের জবাইকৃত পশুও হালাল হবে না।

এর প্রমাণ তো একেবারেই স্পষ্ট যে, আহলে কিতাব অন্য কাফেরদের থেকে ভিন্ন হওয়ার মূল কারণই হলো তাদের স্বতন্ত্র আকিদা-বিশ্বাস। যেমন : তারা 'মহান আল্লাহ'র অস্তিত্বে বিশ্বাসী। রাসুলগণ সত্য এর ওপরও তারা ইমান এনে থাকে। আসমানি কিতাবের ওপর ইমান রাখে। সুতরাং যারা একেবারেই আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয়, রাসুলগণকে সত্যবাদী হিসেবে বিশ্বাস করে না এবং আসমানি কিতাবের ওপরও বিশ্বাস রাখে না তাদেরকে আহলে কিতাব হিসেবে গণ্য করা জায়েজ নেই। যেমনটি 'তালাব' গোত্রের লোকদের ব্যাপারে আলি রা.-এর থেকে এমন একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। ইমাম জাস্‌সাস রহ. বলেন—

> روي محمد بن سيرين عن عبيدة قال : سألت عليا عن ذبائح نصاري العرب فقال : لا تحل ذبائحهم فإنهم لم يتعلقوا من دينهم بشئ إلا بشرب الخمر.
>
> 'ওবায়দা রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আলি রা.-এর কাছে আরবের খ্রিস্টানদের জবাই করা পশু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, তাদের জবাইকৃত পশু হালাল নয়। কারণ, মদপান করা ছাড়া তাদের নিজ ধর্মের সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক নেই।'

এর ব্যাখ্যা হলো, এসব লোক তাওরাত ও ইঞ্জিলের ওপর ইমান রাখে না। শুধু তাই নয়, তারা ইহুদি-খ্রিস্টানদের মৌলিক আকিদায়ও বিশ্বাসী নয়। সুতরাং তারা শুধু ইহুদি-খ্রিস্টানদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে বিধায় তাদেরকে আহলে কিতাব' বলা যাবে না।

তবে এই বিধান ওই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, যার ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে জানা যাবে যে, সে আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী কিন্তু রাসুলে বিশ্বাসী নয় এবং আসমানি কিতাবের ওপরও ইমান রাখে না। কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তিকে তার

বাহ্যিক আলামত দ্বারা কিংবা তার নাম দ্বারা খ্রিস্টান মনে হয় তাহলে তাকে খ্রিস্টান গণ্য করা জায়েজ। যতক্ষণ পর্যন্ত এ কথা প্রকাশ না হবে যে, সে বস্তুবাদে বিশ্বাসী এবং বস্তুবাদী চিন্তা-চেতনা লালন করছে।

জবাইকারী অজ্ঞাত থাকলে জবাইকৃত পশুর হুকুম

জবাইকারী সম্পর্কে যদি জানা না থাকে যে, সে কী আকিদা পোষণ করে কিংবা যদি এ কথা যদি জানা না থাকে যে, সে কী পদ্ধতিতে জবাই করেছে? এ জাতীয় জবাইকৃত পশুর হুকুম সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত পরিলক্ষিত হয়।

প্রথম পদ্ধতি

যদি মুসলিমদের শহর হয়, অর্থাৎ, ওই শহরের অধিকাংশ অধিবাসী মুসলিম হয়; এমন শহরের বাজারে যে গোশত বেচা-কেনা হয় সেই গোশত খাওয়া হালাল। যদিও ক্রেতা সেই পশু জবাই হতে দেখেনি। অথবা জবাইকারী জবাইয়ের সময় 'বিসমিল্লাহ' বলেছে কি না এ কথা জানা না যায়। কারণ, মুসলিম অধ্যুষিত শহরে যেসব পণ্যসামগ্রী কেনা-বেচা হয়, সে সম্পর্কে এ ধারণাই রাখতে হবে যে, তা শরয়ি বিধান অনুযায়ী হচ্ছে। কেননা, এক মুসলিমকে অপর মুসলিম সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করতে বলা হয়েছে। এই অভিমতের দলিল হলো আয়শা রা.-এর বর্ণনা। যাতে বলা হয়েছে—

إن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : إن قوما يأتوننا بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: سموا عليه أنتم وكلوه قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر.

'এক গোত্রের কিছু লোক এসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বললো, কিছু লোক আমাদের কাছে গোশত নিয়ে আসে। তবে আমাদের জানা নেই যে, তারা জবাইয়ের সময় আল্লাহর নাম নিয়েছে কি না। জবাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা আল্লাহর নাম নিয়ে ওই গোশত খেয়ে নাও। আয়শা রা. বলেন, ওই যুগটি ছিলো কুফরের একেবারেই নিকটবর্তী যুগ।[১৮৪]

---

[১৮৪] সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫৫০৭।

এ হাদিসের ব্যাখ্যায় হাফেজ ইবনু হাজার আসকালানি রহ. বলেন—

قال ابن التين : وأما التسمية على ذبح تولاه غيرهم من غير علمهم فلا تكليف عليهم فيه وإنما يحمل على غير الصحة إذا تين خلافها. ويحتمل أن يريد أن تسميتكم الآن تستبيحون بها أكل ما لم تعلموا أذكر اسم الله عليه أم لا؟ إذا كان الذبائح من تصح ذبيحته إذا سمي. ويستفاد منه أن ما يوجد في أسواق المسلمين محمول على الصحة وكذا ما ذبحه أعراب المسلمين لأن الغالب أنهم عرفوا التسمية وبهذا الأخير جزم ابن عبد البر.

'ইবনু ত্বিন রহ. বলেন, যে পশু ভিন্ন কেউ জবাই দিয়েছে এবং তাতে জবাইয়ের সময় 'বিসমিল্লাহ' পড়েছে কি না কারও জানা না থাকে; তাহলে এমন পশুর ক্ষেত্রে বিভ্রান্তিতে ভোগার কোনো কারণ নেই। (যে সে এই অনুসন্ধান চালাবে যে, জবাইয়ের সময় 'বিসমিল্লাহ' বলা হয়েছে কি না?) যদি সে ক্ষেত্রে 'বিসমিল্লাহ' বলার বিপরীত (বিসমিল্লাহ না বলার) বিষয়টি প্রকাশ পেয়ে যায় তা হলে পশুটি খাওয়া হারাম বলে গণ্য হবে। আর মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই কথা বলা যে, তোমরা 'বিসমিল্লাহ' বলে খেয়ে নাও। এই কথার দ্বারা এই সম্ভাবনা রয়েছে, ওই সময় এ জাতীয় প্রাণীর ওপর 'বিসমিল্লাহ' বলার দ্বারা ওই প্রাণী খাওয়া [مباح] 'বৈধ' করে দেয়। যেই প্রাণীর এ বিষয়ে তোমাদের নিশ্চিত কোনো জ্ঞান নেই যে, জবাইকালে তাতে 'বিসমিল্লাহ' পড়া হয়েছে কি না? যখন জানা যাবে যে, জবাইকারী এমন ব্যক্তি, যে জবাইয়ের সময় 'বিসমিল্লাহ' বলে জবাই করে থাকে তাহলে তার জবাইকৃত পশু হালাল হয়ে যাবে।'

বর্ণিত হাদিস দ্বারা এ বিষয়টিও বেরিয়ে এসেছে যে, মুসলিমদের বাজারে যে বেচা-কেনা হয় তা হালাল হওয়ার ওপরই প্রযোজ্য হবে। ঠিক এমনিভাবে যে পশুটি গ্রাম্য মুসলিমগণ জবাই করে। কারণ, তাদের ব্যাপারে নিশ্চিত ধারণা হয় যে, তারা 'বিসমিল্লাহ' সম্পর্কে অবগত রয়েছে। এই শেষ বক্তব্যের সঙ্গে হাফেজ ইবনু আবদুল বার রহ.-ও একমত পোষণ করেছেন।[১৮৫]

বর্ণনার শেষে আয়শা রা.-এর এই মন্তব্য— 'তাদের যুগটি ছিলো কুফরি

[১৮৫] ফাতহুল বারি, খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ৬৩৫-৬৩৬।

যুগের একেবারে নিকটবর্তী'। এই মন্তব্য এ কথার দিকে ইঙ্গিত করে যে, এমনও হতে পারে যে, এসব লোকেরা জবাইকালে যে 'বিসমিল্লাহ' পড়তে হয় সে সম্পর্কে অবগত নয়। তা সত্ত্বেও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওইসব লোকের জবাইকৃত পশু খওয়ার হুকুম দিয়েছেন। এর কারণ হলো, মুসলিমরা যদিও অজ্ঞ হয়, তবুও তাদের কাজকে যথাসম্ভব বৈধতার ওপর প্রয়োগ করা হবে। যতক্ষণ না এই কথা নিশ্চিত হওয়া যাবে যে, সে এই কাজকে ভুল পদ্ধতিতে সম্পাদন করেছে কি না? এ বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করার জন্যই ইমাম বুখারি রহ. باب ذبيحة الأعراب ونحوهم 'গ্রাম্য বা এ জাতীয় লোকদের জবাইকৃত পশুর অধ্যায়' শিরোনামে এই ভাষ্যে উল্লেখ করেছেন। সুনানে নাসায়ির বর্ণনায় স্পষ্টভাবে এ কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, এসব লোক [اعراب] 'গ্রাম্য' ছিলো। যেমনটি হাফেজ ইবনু হাজার আসকালানি রহ. ফাতহুল বারিতে' তার বর্ণনাটি নকল করেছেন। আর গ্রাম্য লোকদের জ্ঞান-বুদ্ধি একটু কমই হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় পদ্ধতি :

যদি শহরের অধিকাংর্শ বাসিন্দা কাফের হয় এবং আহলে কিতাব না হয় তাহলে ওই শহরের বাজারে যে গোশত বেচা-কেনা হতে থাকবে, তা মুসলিমদের জন্য হালাল হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে জানা না যাবে কিংবা প্রায় নিশ্চিত হয়ে না বলা যাবে যে, এই পশুটি মুসলিম কিংবা আহলে কিতাব শরয়ি পদ্ধতি অনুযায়ী জবাই করেছে। ততক্ষণ পর্যন্ত তা খাওয়া হালাল হবে না। এই পদ্ধতিটি একেবারেই স্পষ্ট এবং পরিস্কার একটি বিষয়।

তৃতীয় পদ্ধতি :

বর্ণিত দ্বিতীয় পদ্ধতিটির হুকুম ওই শহর সম্পর্কেও যার অধিবাসী মুসলামন, মূর্তিপূজারী এবং অগ্নিপূজারীদের সমন্বয়ে হয়ে থাকে। কারণ, যে গোশত সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি হবে তা ততক্ষণ পর্যন্ত হালাল হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত তার হালাল হওয়ার বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া না যাবে। এর প্রমাণ আলি রা.-এর ওই হাদিস যা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। যে হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন শিকার হারাম করেছেন, যে শিকারে দ্বিতীয়

এমন কুকুর শরিক হয়ে যায় যাকে ছাড়ার সময় 'বিসমিল্লাহ' পড়া হয়নি।

চতুর্থ পদ্ধতি :

কোনো শহরের অধিবাসী আহলে কিতাব হলে ওই শহরের গোশতের হুকুম সেটিই যা মুসলিম অধ্যুষিত শহরের গোশতের হুকুমের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে। (অর্থাৎ, সেখানকার গোশত কিনে খাওয়া হালাল হবে)। কারণ, জবাইয়ের বিধানের ক্ষেত্রে তাদের বিধান মুসলিমদের বিধানের মতোই। মুসলিম ও আহলে কিতাবের মাঝে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু যদি নিশ্চিতভাবে কিংবা প্রায় নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, এই শহরের আহলে কিতাব শরয়ি পদ্ধতি অনুযায়ী পশু জবাই করে না। তাহলে তাদের বাজার থেকে গোশত কিনে খাওয়া জায়েজ নেই। যতক্ষণ না নিশ্চিতভাবে এ কথা জানা না যাবে যে, আমার ক্রয়াধীন এই গোশত শরয়ি পদ্ধতিতে জবাইকৃত পশুর গোশত। বর্তমান সময়ে পাশ্চাত্যের অধিকাংশ শহরের গোশত সম্পর্কে এই পদ্ধতিটিই প্রযোজ্য হবে। যার বিশদ আলোচনা অচিরেই করবো বলে আমরা আশা রাখি। ইনশাআল্লাহ।

আধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা পশু জবাইয়ের পদ্ধতি ও তার হুকুম

শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি

‘আধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা পশু জবাইয়ের পদ্ধতি ও তার হুকুম’ এ প্রবন্ধটি শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি (হাফিজাহুল্লাহ) তার احكام الذبائح واللحوم المستورة শীর্ষক একটি দীর্ঘ রচনায় কলমবন্ধ করেছেন। প্রবন্ধটি بحوث في قضايا فقهية معاصرة পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। সর্বসাধারণের উপকারার্থে আমি এর উর্দু তরজমা পেশ করলাম।

—আবদুল্লাহ মায়মান

মাকতাবাতুল ইসলাম মাকতাবাতুল ইসলাম

আধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা পশু জবাইয়ের পদ্ধতি ও তার হুকুম

বর্তমান বিশ্বে জনবসতি, আবাদি এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও আবাদির ব্যাপক সম্প্রসারণ হচ্ছে। ফলে দিন দিন মানুষের চাহিদাও বেড়ে চলেছে। সেই চাহিদা মেটাতে গিয়ে মানুষ বাধ্য হয়ে কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করছে। আর মানুষের এই প্রয়োজনীয়তার নিরিখে যে বিষয়টি সামনে আসে তা হলো, আধুনিক ও অটোমেটিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে পশু জবাইয়ের কার্যক্রম সম্পাদন করা। তারই অংশ হিসেবে পশু জবাইয়ের জন্য আধুনিক ও অটোযন্ত্রের আবিষ্কার হয়েছে এবং সেই উদ্দেশ্যে বর্তমানে অনেক কল-কারখানাও স্থাপিত হয়েছে। এসব কারখানায় প্রতিনিয়ত হাজার হাজার পশু জবাই করা হচ্ছে। সুতরাং আধুনিক এসব যন্ত্রপাতি দিয়ে জবাইকৃত পশুর শরয়ি বিধান জানা একটি জরুরি বিষয়। পশুর প্রকারভেদে জবাইয়ের পদ্ধতিও ভিন্ন ভিন্ন। যেমন : মুরগি জবাইয়ের আধুনিক পদ্ধতি গরু-বকরি জবাইয়ের পদ্ধতি থেকে ভিন্ন। তাই আমরা প্রত্যেক পশু জবাইয়ের বিস্তারিত পদ্ধতি পৃথকভাবে বর্ণনা করে তার শরয়ি বিধানও উল্লেখ করে দেবো।

মুরগি জবাইয়ের আধুনিক পদ্ধতি ও তার বিধান

কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং জাজিরাবারি ইউনিয়নসহ বিশ্বের উন্নত বিভিন্ন

দেশে মুরগি জবাইয়ের যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, আমি স্বচক্ষে তা প্রত্যক্ষ করেছি। আধুনিক যন্ত্রপাতির বিশাল এক মেশিন জবাই থেকে শুরু করে প্যাকেটজাত পর্যন্ত সব কাজই এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। মেশিনের একদিকে জীবিত মুরগি প্রবিষ্ট হয় এবং অপরদিক দিয়ে সম্পূর্ণ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন গোশত প্যাকেটজাত হয়ে বেরিয়ে আসে। আর এর সবগুলো স্তরই অর্থাৎ, মুরগি জবাই হওয়া, দেহ থেকে চামড়া অপসারণ, পেট থেকে নাড়িভূড়ি বের করা, গোশত পরিস্কার করা, গোশত টুকরো করা এবং তা প্যাকেটজাত করা, ইত্যাদি সবই বৈদ্যুতিক অটোমেটিক মেশিনের সাহায্যে সম্পন্ন হয়ে থাকে। মেশিনের যন্ত্রপাতিগুলো লোহার বিশাল এক পাটাতনের ওপর স্থাপিত। এই পাটাতনটি মূলত ভেতর নির্মিত দুটি দেওয়ালের ওপর ফিট করা থকে। পাটাতনের নিচে অসংখ্য হুক টানানো থাকে। এসব হুক নিম্নমূখী থাকে। এরপর বিরাট ট্রাকে করে হাজার হাজার মুরগি নিয়ে আসা হয়। মুরগিগুলোকে পাটাতনের নিচের অংশে হুকের সঙ্গে এমনভাবে টানিয়ে দেওয়া হয় যে, মুরগির পা হুকের কড়াতে আটকে থাকে। আর দেহ মাথা এমনভাবে উলটোমুখী হয়ে লটকে থাকে যে, মুরগির পা উপরের দিকে এবং মাথা নিচের দিকে উলটোমুখী টানানো থাকে। তারপর মেশিনে সুইচ টেপার সঙ্গে সঙ্গে সাঁটানো হুকগুলো মুরগিসহ চলতে শুরু করে। মুরগিগুলো এমন স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে ছোটো ছোটো ঝরনা থেকে ঠান্ডা পানি ঝরতে থাকে। উদ্দেশ্য হলো, মুরগির শরীরে লেগে থাকা ময়লাগুলো যেন পরিস্কার হয়ে যায়।

অনেক সময় ওই পানিতে বিদ্যুতের সংযোগ থাকে। ফলে মুরগিগুলো অজ্ঞান হয়ে যায়। এরপর মুরগিগুলো এমন স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়, যার নিচে ঘূর্ণায়মান ছুরি স্থাপিত থাকে। ছুরিগুলো খুব দ্রুত ঘুরতে থাকে। ছুরিগুলো এমন দূরত্বে স্থাপন করা হয়, যেখানে হুকের সঙ্গে টানানো উলটো মাথা ঝুলে থাকে। মুরগিসহ হুকগুলো স্থাপিত ছুরির ওপর আসতেই দ্রুত ঘূর্ণায়মান ছুরিগুলো মুরগির মাথা স্পর্শ করা মাত্র তার শরীর থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এভাবে সামান্য সময়ের মধ্যে অসংখ্য মুরগির শরীর থেকে মাথা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

এরপর হুকগুলো মুরগিসহ আরও সামনে অগ্রসর হয়। সেখানে এমন স্থান দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে ঝর্ণার মতো পানি পুনরায় নির্গত হতে থাকে। তবে এবারের পানি গরম। এর দ্বারা মুরগির শরীরের পাখাগুলো পরিস্কার করা হয়। এর পরবর্তী পর্যায় অর্থাৎ, পেটের ভেতর থেকে নাড়িভূড়ি বের করা, গোশত পরিস্কার

করা, গোশত টুকরো করা এবং তাকে প্যাকেটজাত করা, ইত্যাদি কাজগুলো এই আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে করা হয়ে থাকে। যেহেতু এ বিষয়গুলো আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়; এজন্য এসব কার্যক্রমের প্রক্রিয়াগুলোর আলোচনা আমরা বর্জন করলাম।

এখানে উল্লেখ্য যে, আধুনিক এ অটোমেশিনগুলো সার্বক্ষণিকভাবে এবং এক নাগারে সারাদিনই চালু থাকে। কোনো কোনো সময় রাতদিন চব্বিশ ঘণ্টাই এগুলো চালু থাকে। কখনো কখনো সাময়িক পরিস্থিতির কারণে কোনো প্রেক্ষাপটে বন্ধ থাকলে ভিন্নকথা।

জবাইয়ের উপর্যুক্ত পদ্ধতির প্রেক্ষাপটে শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে চারটি বিষয়ে এখানে আলোচনা করা বাঞ্ছনীয়—

১. বিদ্যুৎ-সংযোজিত ঠান্ডা পানির ভেতর দিয়ে মুরগি অতিবাহিত হওয়া;
২. ঘূর্ণায়মান ছুরি দ্বারা মুরগির মাথা কাটা;
৩. মেশিন দ্বারা মুরগির মাথা কাটার সময় কীভাবে 'বিসমিল্লাহ'-এর ওয়াজিব হুকুম 'আদায় করা হবে?
৪. গরম পানির ভেতর দিয়ে মুরগি অতিবাহিত হওয়া;

এক. বিদ্যুৎ-সংযোজিত ঠান্ডা পানির ভেতর দিয়ে মুরগি অতিবাহিত হওয়া

মুরগির গলা কাটার আগে বিদ্যুৎ-সংযোজিত ঠান্ডা পানির ভেতর দিয়ে মুরগি অতিবাহিত হওয়ার বিষয়টির ক্ষেত্রে প্রথমেই যা বলতে হয়, তা হলো, এই পদ্ধতিটি এখনো সব কারখানায় পুরোপুরিভাবে চালু হয়নি। তাই এখনো এর ব্যাপক প্রচলন শুরু হয়নি। বরং অধিকাংশ কারখানায় ঠান্ডা পানির ভেতর দিয়ে অতিবাহিত হওয়ার কাজটি নেই বললেই চলে।

মোটকথা, এই পদ্ধতিটির শরয়ি ব্যাখ্যা এই যে, যদি সেই ঠান্ডা পানিতে বিদ্যুতের সংযোগ না থাকে তাহলে (ঠান্ডা পানির ভেতর দিয়ে অতিবাহিত হওয়াটা) শুধু ঠান্ডা পানিতে মুরগিকে অতিবাহিত করার দ্বারা জবাইয়ের মাঝে কোনো প্রভাব পড়বে না। তবে যদি পানিতে বিদ্যুতের সংযোগ থাকে তাহলে স্বাভাবিক নিয়মে

এ কথা বলা যায় যে, বিদ্যুৎ সংযোজন দ্বারা প্রাণীর মৃত্যু ঘটবে না ঠিক তবে তার বিবেকশক্তি অবশ হয়ে যাবে। আর দেমাগ অবশ হওয়ার কারণে চেতনাশক্তির অবলুপ্তি ঘটবে। ফলে এ জাতীয় পশুকে জবাই করার দ্বারা ওই পরিমাণ রক্ত প্রবাহিত হয় না; একটি প্রাণীকে স্বাভাবিকভাবে জবাই করলে যে পরিমাণ রক্ত প্রবাহিত হয়ে থাকে। এখন প্রশ্ন হলো উল্লিখিত কার্যক্রমের দ্বারা প্রাণীর মৃত্যু ঘটে কি না? এর জবাব হলো সাধারণত এধরনের কার্যক্রমের দ্বারা প্রাণীর মৃত্যু ঘটে না। তবে হ্যাঁ যদি নির্দিষ্ট প্রাণীর ব্যাপারে জানা যায় যে, এই কার্যক্রমের (ঠান্ডা পানির ভেতর দিয়ে অতিবাহিত হওয়া) কারণেই উল্লিখিত প্রাণীর মৃত্যু হয়েছে তাহলে ওই প্রাণী খাওয়া জায়েজ হবে না। যদিও পরবর্তীকালে শরয়ি পদ্ধতিতে রগ-শিরা কাটা হয়।

সুতরাং বিদ্যুৎ-সংযোজিত পানিতে এতটুকু শক্তি না থাকার বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে, যার দ্বারা পশুটির নিশ্চিত মৃত্যু হয়। অতএব, উল্লিখিত কার্যক্রম পরিচালনার সময় এর তত্ত্বাবধান খুব সতর্ক দৃষ্টিতেই করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে খুব সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন যে, এই কার্যক্রমের দ্বারা যেন কোনো প্রাণীর মৃত্যু না হয়। আর যদি কোনো প্রাণী মারা যায় তাহলে তা যেন আর সামনে অগ্রসর হতে না পারে। প্রকৃতপক্ষে এ জাতীয় ক্ষেত্রে সর্বোত্তম সতর্কতা হলো, পানিতে বিদ্যুতের সংযোগই না দেওয়া। তাহলে আর কোনো সংশয় থাকবে না।

দুই. ঘূর্ণায়মান ছুরি দ্বারা মুরগির মাথা কাটা

ঘূর্ণয়মান ছুরির দ্বারা যে জবাই করা হয়, সে ক্ষেত্রে আমাদের নীরিক্ষা হলো ছুরিগুলো মূলত চাক্কি সদৃশ হয়ে থাকে। এর পার্শ্বগুলো থাকে বেশ ধারালো। আর এই চাক্কি খুব দ্রুতবেগে ঘুরতে থাকে। মুরগির গলা তার পাশ দিয়ে অতিক্রম করা-মাত্রই স্বয়ংক্রিয়ভাবেই শরীর থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। প্রকাশ থাকে যে, এর দ্বারা মুরগির প্রায় সবকটি রগ-শিরা কেটে যায়। তবে কোনো কোনো সময় কোনো কারণবশত হুকে আটকানো মুরগিগুলো এমনভাবে নড়াচড়া করে; যার ফলে মুরগির মাথা ঘূর্ণয়মান ছুরির পুরোপুরি কাছে আসতে পারে না। ফলে মুরগির গলা কাটা যায় না। আবার কখনো এত অল্প কাটে যে, তার সবগুলো রগ-শিরা কাটা হয়েছে কি না তাতে সন্দেহ থেকে যায়। এই দুই পদ্ধতিতেই শরয়ি জবাই হয়েছে বলা যাবে না।

তিন : জবাইয়ের সময় বিসমিল্লাহ্ বলা

অটোযান্ত্রিক পদ্ধতিতে মুর্গি জবাইয়ের ক্ষেত্রে বিসমিল্লাহ্ বলার বিষয় খুবই জটিল। প্রথম জটিলতা হলো, জবাইকারী ব্যক্তি কে? তা নির্ধারণ করা। কারণ বিসমিল্লাহ বলা জবাইকারীর ওপর আবশ্যক। তাইতো যদি এক ব্যক্তি বিসমিল্লাহ বলে ও অপর ব্যক্তি জবাই করে তাহলে এ পদ্ধতিটিও সঠিক হবে না। এখন প্রশ্ন হলো, মেশিনে জবাইয়ের ক্ষেত্রে জবাইকারী ব্যক্তি কে? মেশিনটিকেই জবাইকারী বলা হবে নাকি যে মেশিন চালু করেছে? তার একটি জবাব এইভাবে দেওয়া যায় যে, যে ব্যক্তি প্রথমবার মেশিন চালু দিয়েছে সেই জবাইকারী। কারণ যান্ত্রিক মেশিনের সকল কার্যক্রম তার সঙ্গেই সম্পৃক্ত হয় যে মেশিন চালু করে। তার কারণ হলো, মেশিন-যন্ত্রপাতি এমন কোনো জ্ঞান সম্পন্ন কিছু নয় যার দিকে কাজের সম্বন্ধ করা যায়। সুতরাং কাজের সম্বন্ধ তার দিকেই করা হবে যে মেশিনটি চালু করেছে। আর যন্ত্রের মাধ্যমে তাকেই কর্তা হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে কঠিন বিষয় হলো, যে ব্যক্তি সকাল বেলা প্রথমে মেশিন চালু করলো সে তো এক দফাতেই মেশিন চালু করলো। এরপর আধুনিক যন্ত্রপাতি-সম্পন্ন মেশিনটি সার্বক্ষণিকভাবে এবং এক নাগারে সারাদিনই চলতে থাকে। কোনো কোনো সময় রাতদিন চব্বিশ ঘণ্টাই এগুলো চলতে থাকে। আর হাজার হাজার মুরগির মাথা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। সুতরাং যিনি সকালে মেশিন চালু করার সময় একবার 'বিসমিল্লাহ' বলে মেশিন চালু করে থাকেন। তার এই একবার 'বিসমিল্লাহ' বলাটা কি মেশিনের সাহায্যে জবাইকৃত হাজার হাজার মুরগির জন্য যথেষ্ট হবে? এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনের ঘোষণা হলো—

﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ﴾

> 'যে প্রাণীর ওপর আল্লাহর নাম নেওয়া হয়নি, তোমরা তা ভক্ষণ করো না।'

এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, প্রত্যেক প্রাণী জবাইকালে 'বিসমিল্লাহ' পড়া এবং বিসমিল্লাহ পড়ার সঙ্গে জবাই করা জরুরি। এরই ওপর ভিত্তি করে ফকিহগণ নিম্নোক্ত মাসআলাগুলো উদঘাটন করেছেন।

প্রথম মাসআলা

ফতোয়া হিন্দিয়াতে এসেছে—

وأما الشرط الذي يرجع إلى محل الذكاة. فمنها تعيين المحل بالتسمية فى الذكاة الإختيارية. وعلي هذا يخرج ما إذا ذبح وسمي ثم ذبح أخري. يظن أن التسمية الأولي تجزئ عنهما لم تؤكل فلا بد أن يجدد لكل ذبيحة تسمية علي حدة.

'ওইসব শর্তাবলি যা জবাইয়ের স্থানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট; তার মধ্যে একটি হলো, স্বেচ্ছায় জবাইয়ের সময় 'বিসমিল্লাহর' সঙ্গে সঙ্গে বিসমিল্লাহর স্থানটিও নির্ধারণ করে নেওয়া। সুতরাং এই শর্তের কারণে নিম্নোক্ত পদ্ধতি বৈধতার সীমারেখা থেকে বাদ পড়ে যাবে। যদি কোনো ব্যক্তি 'বিসমিল্লাহ' বলে জবাই করে। এরপর দ্বিতীয় আরেকটি পশু এই ভিত্তিতে জবাই করে যে, প্রথম 'বিসমিল্লাহ' দ্বিতীয়টির জন্য যথেষ্ট তাহলে এই অবস্থায় দ্বিতীয় পশুটি খাওয়া যাবে না। সুতরাং প্রত্যেক প্রাণী জবাইকালে স্বতন্ত্রভাবে 'বিসমিল্লাহ' পড়ে নেওয়া জরুরি।[১৮৬]

দ্বিতীয় মাসআলা :

ولو أضجع شاة وأخذ السكين وسمي ثم تركها وذبح شاة اخري وترك التسمية عامدا عليها لا تحل كذا فى الخلاصة.

'যদি কোনো ব্যক্তি বকরি জবাইয়ের জন্য বকরিকে শুইয়ে দেয়, তারপর ছুরি হাতে নিয়ে 'বিসমিল্লাহ' পড়ে এরপর বকরিকে ছেড়ে দিয়ে ভিন্ন আরেকটি বকরিকে জবাই করে এবং দ্বিতীয় বকরি জবাইকালে ইচ্ছাকৃতভাবে 'বিসমিল্লাহ' ছেড়ে দেয়, তাহলে ওই বকরি হালাল হবে না।[১৮৭]

তৃতীয় মাসআলা :

وإذا اضجع شاة ليذبح وسمي عليها ثم كلم إنسانا. أو شرب ماء. أو حدد سكينا أو أكل لقمة أو ما أشبه ذلك من عمل لم يكثر. حلت بتلك التسمية. وإن طال الحديث وكثر العمل كره أكلها. وليس في ذلك تقدير. بل ينظر فيه إلى العادة. إن استكثرالناس فى العادة يكون كثيرا. وإن كان يعد قليلا فهو قليل.

---

[১৮৬] ফতোয়া হিন্দিয়া, জবাইয়ের অধ্যায়, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ২৮৬।

[১৮৭] ফতোয়া হিন্দিয়া, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ২৮৬।

'যদি কোনো ব্যক্তি জবাইয়ের জন্য বকরি শুইয়ে দেয় এবং বিসমিল্লাহ'-ও পড়ে নেয়। তারপর কারও সঙ্গে কথা বলে, পানি পান করে, ছুরি ধার দেয়, এক লোকমা খাবার খেয়ে নেয় কিংবা এ জাতীয় অন্য কোনো কাজ করে যাকে অধিক কাজ হিসেবে গণ্য করা হয় না। (তারপর ওই বকরি জবাই করে); তাহলে এমতাবস্থায় পূর্বের পঠিত 'বিসমিল্লাহ' দ্বারা ওই বকরি হালাল হিসেবে বিবেচিত হবে। আর যদি 'বিসমিল্লাহ' পড়ার পর দীর্ঘ কোনো আলোচনা করে কিংবা দীর্ঘ সময় কাজ করে তারপর বকরি জবাই করে; তাহলে ওই বকরির গোশত খাওয়া মাকরুহ। অবশ্য কাজ [كثير] 'বেশি' এবং [قليل] 'কম হওয়ার নির্দিষ্ট কোনো সীমারেখা নেই। বরং এ ক্ষেত্রে সামাজিক প্রথাই প্রাধান্য পাবে। যদি সাধারণ নিয়মানুসারে মানুষ কোনো [عمل] কাজকে [كثير] বেশি মনে করে, তাহলে সেই কাজটা [عمل كثير] 'বেশি কাজ' বলে গণ্য হবে। আরা যে কাজটা স্বাভাবিক নিয়মানুসারে [قليل] 'কম' মনে হয় তাহলে সেটি [عمل قليل] 'কম কাজ' বলে গণ্য হবে।[১৮৮]

ইবনু কুদামা রহ. বলেন—

والتسمية على الذبح معتبرة حال الذبح أو قريبا منه، كما تعتبر على الطهارة، وان سمي على شاة ثم أخذ أخري فذبحها بتلك التسمية لم يجز سواء أرسل الاولي أو ذبحها، لانه لم يقصد الثانية بهذه التسمية وإن راي قطيعا من الغنم، فقال : بسم الله، ثم اخذ شاة فذبحها بغير تسمية لم يحل، وإن جهل كون ذلك لا يجزئ لم يجز مجر النسيان، لان النسيان يسقط المواخذة والجاهل مواخذ، ولذلك يفطر الجاهل بالأكل في ا لصوم دون الناسي، وإن أضجع شاة ليذبحها وسمي ثم ألقي السكين وأخذ أخري أو رد سلاما أو كلم إنسانا أو استسقي ماء ونحو ذلك وذبح حل، لأنه سمي على ذلك الشاة بعينا ولم يفصل بينهما إلا بفصل يسير فأشبه ما لو لم يتكلم.

জবাইয়ের সময় 'বিসমিল্লাহ' পড়া তখনই গ্রহণযোগ্য হবে, যখন তা একেবারে জবাইয়ের মুহূর্তে কিংবা জবাইয়ের কিছু আগ মুহূর্তে হয়। যেমন : পবিত্রতা অর্জনের ক্ষেত্রে এমটিই গ্রহনযোগ্য। যদি কোনো

[১৮৮] ফতোয়া হিন্দিয়া, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ২৮৮।

বকরির ওপর 'বিসমিল্লাহ' পড়া হয়, এরপর ভিন্ন আরেকটি বকরি ধরে পূর্বের বিসমিল্লাহ-এর ওপর ভিত্তি করে জবাই করে নেয়, তাহলে তা খাওয়া জায়েজ হবে না। প্রথম বকরি ধরে ছেড়ে দেওয়া হোক কিংবা জবাই করা হোক। কারণ, এই 'বিসমিল্লাহ'-এর মাধ্যমে তার দ্বিতীয়টি জবাই করা উদ্দেশ্য ছিলো না। আর যদি বকরির পাল দেখে 'বিসমিল্লাহ' বলে। তারপর পাল থেকে যে-কোনো একটি ধরে এনে 'বিসমিল্লাহ' বলা ছাড়াই জবাই করে তাহলে তা খাওয়া হালাল হবে না। যদি সে শরিয়তের এই বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে, তবু তা জায়েজ হবে না এবং এটি ভুলের স্থলাভিষিক্ত হবে না। কারণ, ভুলে কোনো কাজ হয়ে গেলে জবাবদিহিতা রহিত হয়ে যায়। কিন্তু অজ্ঞতা জবাবদিহিতাকে রহিত করে না। এ কারণেই অজ্ঞ ব্যক্তি রোজা রেখে খেয়ে ফেললে তাকে রোজা ছেড়ে দিতে হয়। কিন্তু ভুলে খেয়ে ফেললে রোজা ছেড়ে দিতে হয় না। আর যদি কোনো ব্যক্তি জবাই করার উদ্দেশ্যে বকরি শুইয়ে দেয় এবং 'বিসমিল্লাহ' পড়ে। তারপর ছুরিটি ফেলে দিয়ে অন্য কিছু হাতে নেয় কিংবা সালামের জবাব দেয়, অথবা কারও সঙ্গে কথা বলে বা কারও কাছে পানি চায় কিংবা এ জাতীয় অন্য কোনো কাজ করার পর জবাই করে। তাহলে তা খাওয়া হালাল হবে। কারণ, সে নির্দিষ্ট এই বকরির জন্যই 'বিসমিল্লাহ' পড়েছে এবং এর মাঝে সামান্য বিরতি ছাড়া দীর্ঘ কোনো বিরতিও দেয়নি। ফলে বিষয়টি এমন হলো যে, সে যেন কারও সঙ্গে কোনো কথাই বলেনি।[১৮৯]

চতুর্থ মাসআলা :

ফকিহগণের আরেকটি অভিমত হলো, জবাইকৃত প্রাণীর ক্ষেত্রে 'বিসমিল্লাহ' পড়া তখনই গ্রহণযোগ্য, যা জবাইয়ের মুহূর্তে কিংবা খুব কাছাকাছি সময়ে পড়া হবে। যেমন : [طهارة] পবিত্রতা অর্জনের ক্ষেত্রে একইভাবে 'বিসমিল্লাহ' গ্রহণযোগ্য। সুতরাং কোনো ব্যক্তি যদি একটি বকরির জবাইয়ের উদ্দেশ্যে বিসমিল্লাহ' পড়ে এবং এরপর ভিন্ন আরেকটি বকরি ধরে প্রথমবারের 'বিসমিল্লাহ'-এর ওপর ভিত্তি করে জবাই করে তাহলে সে 'বিসমিল্লাহ' যথেষ্ট নয়। (আর এই বকরিটিও খাওয়া জায়েজ হবে না) এ ক্ষেত্রে প্রথম

[১৮৯] আল-মুগনি, ইবনু কুদামা রহ. রচিত, খণ্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ৩৩।

বকরি ছেড়ে দেওয়া হোক কিংবা জবাই করা হোক। কারণ হলো, দ্বিতীয় বকরির উদ্দেশ্যে 'বিসমিল্লাহ' পড়েনি।

পঞ্চম মাসআলা :

যদি কোনো ব্যক্তি বকরির পাল দেখে বিসমিল্লাহ' পড়ে। তারপর সেই পাল থেকে ধরে এনে এক বকরিকে 'বিসমিল্লাহ' ছাড়া জবাই করে ফেলে তাহলে এই বকরি হালাল হবে না। যদি সে এমনটা অজ্ঞতার কারণে করে থাকে তবুও তার প্রথম 'বিসমিল্লাহ' যথেষ্ট হবে না। কারণ, অজ্ঞতাকে ভুলের স্থলাভিষিক্ত করা যায় না। ভুল হলে জবাবদিহিতা রহিত হয়ে যায় পক্ষান্তরে অজ্ঞতার কারণে হলে জবাবদিহিতা রহিত হয় না। এই জন্যই, রোজা অবস্থায় অজ্ঞতাবশত খেয়ে ফেললে সে রোজা ভঙ্গকারী হিসেবে বিবেচিত হবে পক্ষান্তরে ভুলে এমনটা হলে রোজা ভঙ্গকারী হিসেবে বিবেচিত হবে না।

ষষ্ঠ মাসআলা :

যদি কোনো ব্যক্তি জবাইয়ের জন্য কোনো বকরিকে শুইয়ে দেয় এবং তার ওপর 'বিসমিল্লাহ' পড়ে তারপর হাতের ছুরি নিক্ষেপ করে ভিন্ন কোনো ছুরি হাতে নেয় কিংবা 'বিসমিল্লাহ' পড়ার পর কারও সালামের জবাব দেয়, কারও সঙ্গে কথা বলে, কারও কাছে পানি চায় কিংবা এ জাতীয় অন্য কোনো কাজ করে তারপর বকরি জবাই করে। তাহলে সেই জবাইকৃত বকরি হালাল হবে। কারণ, সে সুনির্দিষ্টভাবে এই বকরির জন্যই 'বিসমিল্লাহ' পড়েছিলো। আর 'বিসমিল্লাহ' ও জবাইয়ের মাঝে সামান্য ব্যবধান রয়েছে। তাই তার এই ব্যবধানটি এমন হয়ে গেলো যে, যেন 'বিসমিল্লাহ' পড়ার পর যেন সে কোনো কথাই বলেনি।

মাউওয়াক মালিকি রহ. বলেন—

قال مالك : لا بد من التسمية عند الرمي وعند إرسال الجوارح وعند الذبح لقوله تعالى : واذكرو اسم الله عليه.

ইমাম মালিক রহ. বলেন, পবিত্র কুরআনের আয়াত واذكروا اسم الله عليه এর কারণে তির নিক্ষেপের সময়, শিকারী প্রাণী ছাড়ার সময় এবং জবাই করার সময় 'বিসমিল্লাহ' পড়া জরুরি।[১৯০]

[১৯০] আত-তাজুল ইকলিল বিহামিস মাওয়াহিবিল জালিল, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ২১৯।

ফিকহশাস্ত্রের বিভিন্ন গ্রন্থের এসব ভাষ্যের দ্বারা এ বিষয়টি প্রতীয়মান হয় যে, অধিকাংশ ফকিহ 'বিসমিল্লাহ'-কে জবাইকৃত প্রাণী হালাল হওয়ার জন্য শর্ত করেছেন। অধিকাংশ ফকিহ-এর কাছে সুনির্দিষ্ট প্রাণীর ওপর 'বিসমিল্লাহ' পড়া, জবাইয়ের সময় 'বিসমিল্লাহ' পড়া এবং জবাই ও 'বিসমিল্লাহ'-এর ব্যবধান সময় একটি যুক্তিসঙ্গত সময় হওয়াটাও শর্ত হিসেবে প্রযোজ্য। আর এ জাতীয় শরয়ি বিধিবিধানগুলো আধুনিক মেশিন দ্বারা জবাই করলে অনুপস্থিত থাকে। কারণ, যে ব্যক্তি প্রথমবার 'বিসমিল্লাহ' বলে মেশিন চালু করে, সে তো নির্দিষ্ট কোনো মুরগির জন্য বিসমিল্লাহ' পড়েনি। আর তার 'বিসমিল্লাহ' বলা এবং হাজার হাজার মুরগি জবাইয়ের সময়ের মধ্যে বেশ ব্যবধান থাকে। আবার কখনো এই ব্যবধানটি পূর্ণ এক দিনের মতো দীর্ঘ হয়, আবার কখনো এক দিন একরাত আবার কখনো দুই দিন দুই রাত পর্যন্ত প্রলম্বিত হয়ে থাকে। এ কথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, একবারের 'বিসমিল্লাহ' হাজারও মুরগির জন্য যথেষ্ট নয়।

মেশিনে জবাইয়ের এই পদ্ধতিটি ওই মাসআলার খুবই নিকটবর্তী যা ইবনু কুদামা রহ. 'আল-মুগনি' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। যদি কোনো ব্যক্তি বকরির পাল দেখে এবং তার ওপর 'বিসমিল্লাহ' পড়ে নেয়। তারপর ওই পাল থেকে একটি বকরি ধরে এনে 'বিসমিল্লাহ' ছাড়াই জবাই করে ফেলে তাহলে ওই জবাইকৃত বকরি হারাম হয়ে যাবে।[১৯১]

উল্লেখ্য, উল্লিখিত মাসআলার এই ভাষ্যে প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে; যা কোনো কোনো ফকিহ বর্ণনা করেছেন—

ولو أضجع أحدي الشاتين على الأخري تكفي تسمية واحدة إذا ذبحها بإمرار واحد. ولو جمع العصافير في يده فذبح وسمي وذبح آخر على أثره ولم يسم لم يحل الثاني ولو أمر السكين على الكل جاز بتسمية واحدة.

'যদি এক বকরিকে অপর আরেকটি বকরির ওপর শুইয়ে দেওয়া হয় তাহলে এমতাবস্থায় একবার 'বিসমিল্লাহ' পড়াই যথেষ্ট হবে। শর্ত হলো, একসঙ্গে ছুরি চালিয়ে উভয়টিকে জবাই করে দিতে হবে। যদি কেউ অনেকগুলো চড়ুই পাখি ধরে নিয়ে আসে। তারপর 'বিসমিল্লাহ'

[১৯১] এ মাসআলাটি ফতোয়া হিন্দিয়াতেও রয়েছে। খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ২৮৯।

বলে একটিকে জবাই করে এবং তৎক্ষণাৎ আরেকটি চড়ুই জবাই করে এবং 'বিসমিল্লাহ' না বলে থাকে তাহলে দ্বিতীয়টি হালাল হবে না। আর যদি সবগুলো চড়ুই পাখির ওপর একসঙ্গে ছুরি চালিয়ে দেয় তাহলে একবার 'বিসমিল্লাহ' বলার দ্বারাই সবগুলো চড়ুই হালাল হয়ে যাবে।[১৯২]

অনেক সময় এই সংশয় সৃষ্টি হয়ে থাকে যে, মেশিনে জবাইয়ের মাসআলাটি দুই বকরির মধ্য থেকে একটি অপরটির ওপর শুইয়ে দিয়ে জবাই করা এবং এক হাতে অনেকগুলো চড়ুই পাখি ধরে একবারে জবাই করার মতোই তো হয়ে গেলো। সুতরাং এই দুই মাসআলায় একবার 'বিসমিল্লাহ' বলা যেমন যথেষ্ট তেমনিভাবে মেশিনে জবাইয়ের মাঝেও একবার 'বিসমিল্লাহ' বলা যথেষ্ট হওয়া উচিত।

তবে সঠিক কথা হলো এই যে, আমাদের আলোচিত বিষয়টি ওই দুই পদ্ধতির সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল নয়। কেননা, এই দুই মাসআলার পদ্ধতি তো এই যে, দুই বকরি জবাই কিংবা অনেকগুলো চড়ুই পাখি জবাই একবারেই হয়ে থাকে। জবাই ও বিসমিল্লাহর মাঝে তেমন কোনো ব্যবধানও হয় না। একারণেই উল্লিখিত মাসআলার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে স্পষ্ট করে এ কথা বলা হয়েছে যে, যদি জবাইকারী অনেক চড়ুই নিজের হাতে নিয়ে 'বিসমিল্লাহ' বলে একটি চড়ুই জবাই করে তারপর তৎক্ষণাৎ আরেকটি জবাই করে 'বিসমিল্লাহ' পড়া ছাড়াই তাহলে দ্বিতীয় চড়ুই পাখি হালাল হবে না। কারণ, প্রথম চড়ুই পাখি জবাই ও দ্বিতীয় চড়ুই পাখির জবাইয়ের মাঝে বেশ সময়ের ব্যবধান রয়েছে।

আমাদের আলোচনাধীন মাসআলাটির ব্যাপারে আমরা এ কথা বলতে পারি না যে, যে মুরগিগুলো এক বা দুই দিনে মেশিনের মাধ্যমে জবাই করা হয়েছে। ওই সবগুলোকে একবারেই জবাই করা হয়েছে। বরং এখানে জবাইয়ের আরও অনেক আনুষাঙ্গিক-প্রাসঙ্গিক কাজ হয়েছে। প্রত্যেকটি কাজই পর্যায়ক্রমে একের পর এক হয়েছে। সুতরাং উভয় পদ্ধতিতে পার্থক্য ও ব্যবধান স্পষ্ট।

মোটকথা উপর্যুক্ত বিশদ বিশ্লেষণ দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, এক বা দুই দিনে যে পরিমাণ মুরগি জবাই করা হয়েছে সবগুলোর জন্য মেশিন চালুকারীর শুধু একবার

---

[১৯২] ফতোয়া হিন্দিয়া, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ২৮৯।

'বিসমিল্লাহ' বলা যথেষ্ট নয়। তবে যদি এমন একটি পদ্ধতি অবলম্বন করা যায় যে, ঘূর্ণায়মান ছুরির কাছে একজন লোক দাঁড়িয়ে থাকবে যাতে করে যখনই ওই মুরগি ওই ছুরির কাছে পৌঁছবে তখনই ওই ব্যক্তি 'বিসমিল্লাহ' বলবে। তারপর মুরগির শরীর থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন হবে। এই পদ্ধতিটি আমি কানাডার একটি কারখানায় স্বচক্ষে দেখেছি। তবে এই পদ্ধতিটি শরিয়তে গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য বেশ কিছু প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে।

প্রথম প্রশ্ন :

এ ক্ষেত্রে প্রথম যে প্রশ্নটি উত্থাপিত হতে পারে তা হলো, 'বিসমিল্লাহ' জবাইকারী থেকে উত্থাপিত হওয়া জরুরি। যে ব্যক্তি ঘূর্ণমান ছুরির সামনে দাঁড়িয়ে আছে তার সঙ্গে জবাইয়ের কোনো সম্পর্ক নেই। কারণ, সে না মেশিন চালু করাচ্ছে এবং না সে ছুরি ঘুরাচ্ছে এবং না সে মুরগিকে ছুরির কাছে নিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং তার 'বিসমিল্লাহ' জবাইকারীর বিসমিল্লাহ' হিসেবে বিবেচিত হবে না।

দ্বিতীয় প্রশ্ন :

দ্বিতীয় যে প্রশ্নটি উত্থাপিত হতে পারে তা হলো, ঘূর্ণমান ছুরির কাছে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে অসংখ্য মুরগি আসে। ওই ছুরির পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয় যে, আগত এই অসংখ্য মুরগির প্রত্যেকটির জন্য কোনো প্রকার ব্যবধান না করে প্রতিবার 'বিসমিল্লাহ' পড়া।

তৃতীয় প্রশ্ন :

তৃতীয় যে প্রশ্নটি উত্থাপিত হতে পারে তা হলো, মেশিনের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তি অবশ্যই মানুষ। সে তো কোনো অটোমেটিক মেশিন নয়। তাই এটি কখনোই সম্ভব নয় যে, সে শুধু 'বিসমিল্লাহ' পড়বে অন্য কোনো কাজে ব্যস্ত হবে না আর তা কারও পক্ষে সম্ভবও নয়। কারণ, কোনো সময় এমন প্রয়োজনও হতে পারে যার কারণে 'বিসমিল্লাহ' পড়তে প্রতিবন্ধক হয়। আর ওই সময়ের মাঝে বেশকিছু মুরগি ঘূর্ণমান ছুরির ওপর দিয়ে অতিক্রম করে মাথা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে যেগুলোতে 'বিসমিল্লাহ' পড়া হয়নি। ফলে

'বিসমিল্লাহ' ছাড়াই এগুলো জবাই হয়ে যাবে। আমি নিজেই কানাডার এক জবাইখানায় এমন অবস্থা দেখতে পেয়েছি যে, মেশিনের পাশে দাঁড়িয়ে-থাকা ব্যক্তি অন্যত্র চলে যাচ্ছে। আবার কোনো কোনো সময় সেই চলে যাওয়ার সময়সীমা আধাঘন্টাব্যাপী কিংবা তার চেয়ে বেশি হয়ে থাকে।

অটোমেটিক মেশিনে 'বিসমিল্লাহ' পড়া সম্পর্কে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়। আর তা হলো, আমরা মেশিন চালুর বিষয়টিকে শিকারী কুকুর ছাড়ার সঙ্গে তুলনা করতে পারি। যেমন : সেখানে শিকারকে হত্যা করার সময় 'বিসমিল্লাহ' পড়া ওয়াজিব নয়। বরং কুকুরকে ছাড়ার সময় 'বিসমিল্লাহ' পড়া ওয়াজিব। কখনো কুকুর ছাড়া ও শিকার হত্যার মাঝে বেশ ব্যবধান হয়ে থাকে। আবার কখনোও শিকারী কুকুর একবারেই একাধিক প্রাণী শিকার করে নিয়ে আসে। আর এ ক্ষেত্রে এটি তো স্পষ্ট যে, সেখানে একবার 'বিসমিল্লাহ' সব প্রাণী হত্যার জন্য যথেষ্ট। যেমনটি এ প্রসঙ্গে ইবনু কুদামা রহ. বর্ণনা করেন—

وإن سمي الصائد على صيد فأصاب غيره حل، وإن سمي على سهم ثم ألقاه وأخذ غيره فرمي به لم يبح ما صاده به، لأنه لما لم يكن إعتبار التسمية على صيد بعينه اعتبرت الآلة التي يصيد بها بخلاف الذبيحة ويحتمل أن يباح قياسا على ما لو سمي على سكين ثم ألقاها وأخذ غيرها وسقوط اعتبار تعيين الصيد لمشقته لا يقضي إعتبار تعيين الآلة فلا يعتبر.

'যদি শিকারী ব্যক্তি শিকারের উদ্দেশ্যে 'বিসমিল্লাহ' পড়ে। তারপর শিকারী প্রাণী ওই নির্দিষ্ট শিকারের স্থলে ভিন্ন আরেকটি প্রাণী শিকার করে নিয়ে আসে তাহলে এই দ্বিতীয় প্রাণীও তার জন্য হালাল হয়ে যাবে। তবে এক ব্যক্তি একটি তির-এ 'বিসমিল্লাহ' পড়লো। তারপর ওই তিরটি রেখে ভিন্ন আরেকটি তির দিয়ে শিকার করে তাহলে এমতাবস্থায় ওই শিকারকৃত প্রাণী খাওয়া বৈধ হবে না। কারণ, যখন নির্দিষ্ট শিকারের ওপর 'বিসমিল্লাহ' পড়া সম্ভব নয় তখন ওই যন্ত্রের ওপর 'বিসমিল্লাহ' পড়া গ্রহণযোগ্য হবে। যার দ্বারা সে শিকার করবে। তবে জবাইয়ের বিষয়টি এর ব্যতিক্রম। (কারণ, সেখানে নির্দিষ্ট প্রাণীর ওপর বিসমিল্লাহ' পড়া সম্ভব এবং এ সম্ভাবনাও আছে যে, বর্ণিত মাসআলায় প্রাণীকে বৈধ সাব্যস্ত করা হবে ওই মাসআলার সঙ্গে তুলনা

করে যে, এক ব্যক্তি কোনো একটি ছুরিতে 'বিসমিল্লাহ' পড়লো, তারপর তা রেখে দিয়ে আরেকটি ছুরি উঠিয়ে তা দিয়ে জবাই করে দিলে ওই পশুটি হালাল হয়ে যায়। আর শিকারের ক্ষেত্রে জটিলতার কারণে 'নির্দিষ্টকরণ' রহিত হয়ে যাওয়া এই দাবি করে না যে, হাতিয়ার নির্দিষ্টকরণের বিষয়টি ধর্তব্য হবে। তাই হাতিয়ার 'নির্দিষ্টকরণের বিষয়টি গ্রহণযোগ্য হবে না।[১৯৩]

উপরে বর্ণিত বিশদ আলোচনা [ذكاة إضطراري] 'অস্বাভাবিক জবাইয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। অথচ আমাদের আলোচনার বিষয়টি [ذكاة اختياري] স্বাভাবিক জবাই' সংক্রান্ত। তাই স্বাভাবিক অবস্থাকে অস্বাভাবিক অবস্থার সঙ্গে তুলনা করা যায় না।

কিন্তু আমরা যখন আধুনিক ও সমকালীন বিশ্বের প্রতি নজর দিই তখন দেখা যাবে যে, স্বল্প সময়ে অধিক উৎপাদনের তীব্র প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে। কারণ, জনবসতি এবং আবাদির ব্যাপক বিস্তার ঘটছে। ফলে উৎপাদনমুখি দ্রব্যের ব্যবহারকারীর সংখ্যা কেবলই বৃদ্ধি পাচ্ছে। পক্ষান্তরে জবাইকারীর সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। অপরদিকে আমরা দেখতে পাই, শরিয়ত কাঠিন্যের কারণে শিকারে 'বিসমিল্লাহ' 'নির্দিষ্টকরণের বিষয়টি রহিত করে দিয়েছে। যেমনটি ইবনু কুদামা রহ.-এর ভাষ্য থেকে জানা যায়। আর এ জাতীয় পরিস্থিতিতে শরিয়তে কাঠিন্যতা দূর করার প্রতিশ্রুতিও রয়েছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে কোনো কোনো সময় শুধু 'বিসমিল্লাহ'-এর মাসআলায় কাঠিন্যতা দূর করার জন্য এবং মানুষের জন্য সহজতর করার লক্ষ্যে 'স্বাভাবিক অবস্থা'-কে অস্বাভাবিক অবস্থার ওপর তুলনা করা জায়েজ হওয়ার কারণ সৃষ্টি করে দেয়। তবে এই অভিমতের ওপর জোর দিয়ে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চাই না। কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য, আলেমগণের সামনে এ বিষয়টি আলোচনা-পর্যালোচনা করার জন্য পেশ করছি। এখনো পর্যন্ত আমি এ বিষয়ে ফতোয়া দিচ্ছি না। কারণ, যেহেতু আমাদের সামনে ঘূর্ণমান ছুরির বিকল্প ব্যবস্থাও বিদ্যমান রয়েছে। আর সেই বিকল্পপন্থায়ও ঠিক একই সময়ে প্রয়োজনীয় উৎপাদন সামগ্রী প্রস্তুতে এবং ভোক্তার চাহিদা মেটাতে সক্ষম।

আর সেই বিকল্পপদ্ধতি হলো এই যে, সেই অটোমেটিক মেশিনে যে ছুরিগুলো

---

[১৯৩] আল মুগনি, ইবনু কুদামা রহ. রচিত, খণ্ড : ১১; পৃষ্ঠা : ৩৩-৩৪।

লাগানো রয়েছে তা সরিয়ে সেখানে চারজন মুসলিম দাঁড় করিয়ে রাখবে। হুকে টানানো মুরগিগুলো যখন তাদের সামনে আসবে তখন তারা পর্যায়ক্রমে 'বিসমিল্লাহ' বলে একেকজন একেকটি করে মুরগি জবাই করবে।

এ পদ্ধতিটি জাজিরারি ইউনিয়নের একটি বিশাল জবাইখানার কর্তৃপক্ষের কাছে পরীক্ষামূলক প্রচলনের জন্য অনুরোধ করা হয়। তারা এ পদ্ধতিটি সাদরে গ্রহণ করেন এবং এরই ভিত্তিতে তারা কাজ শুরু করেন। তাদের অভিজ্ঞতার ফল এই যে, এই পদ্ধতি অবলম্বন করার দ্বারা সামান্যতম পরিমাণও ঘাটতি হয়নি। কারণ, এই ঘূর্ণমান ছুরি যে পরিমাণ সময়ে যতগুলো মুরগি জবাই করতে পারে, সেই একই সময়ে চারজন ব্যক্তি ততগুলো মুরগি জবাই করতে পারে।

এই অটোমেটিক মেশিনও কিন্তু মানুষের একদম সাহায্য ছাড়া চলতে পারে না। যা আমরা নিজেরা প্রত্যক্ষ করেছি। যেসব স্থান দিয়ে হুকে আটকানো মুরগি অতিক্রম করে, সেখানকার কোনো কোনো স্থানে মানুষ দাঁড়িয়ে থাকা আবশ্যক। যেমন : ওইসব দাঁড়ানো মানুষ নিজের হাত বা হাতিয়ার দিয়ে মুরগির পেট থেকে নাড়িভুড়ি বের করতে হয়। এমন কোনো জবাইখানা নেই যেখানে কোনো না কোনোভাবে মানুষের প্রয়োজন হয় না। তাহলে জবাইয়ের জন্য আরও চারজন মানুষ দাঁড় করাতে সমস্যা কোথায়। আর এতে করে মুসলিম জবাইকারীর 'বিসমিল্লাহ'-এর মাধ্যমে জবাইটিও সম্পন্ন হয়ে গেলো। আর অন্য কাজগুলো মেশিনের সাহায্যে সম্পাদন করলো।

জাজিরারি ইউনিয়ন ছাড়াও আমি দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবান শহরের কাছাকাছি এর চেয়ে বড়ো জবাইখানা দেখেছি। যেখানে প্রতিদিন হাজার মুরগি প্রসেসিংয়ের পর প্যাকেটজাত করা হয়। তারাও মুসলিমদের এই প্রস্তাব মেনে কাজ শুরু করে দিয়েছে এবং কোনো ধরনের জটিলতা ছাড়াই তারা এই কাজ আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে।

তেমনিভাবে আমি যখন কানাডার জবাইখানা দেখতে যাই। তখন তাদের সামনেও আমি এই প্রস্তাব পেশ করি। তারাও মুসলিমদের এই প্রস্তাব মেনে নিয়ে কাজ করতে উৎসাহ প্রকাশ করে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, সেখানকার 'জামিয়াতুল মুসলিমিন' যারা 'কোন জবাইখানার গোশত হালাল আর কোন জবাইখানার গোশত হালাল নয়' এই স্বীকৃতি দিয়ে থাকে। তারাই এই প্রস্তাব মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত এই বিকল্প ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত মেশিনের দ্বারা জবাইয়ের তেমন কোনো প্রয়োজন নেই।

আর এ পন্থা থাকাকালীন 'স্বাভাবিক অবস্থার জবাইয়ের ওপর অস্বাভাবিক অবস্থার জবাইয়ের সঙ্গে তুলনা করার কোনো প্রয়োজন নেই।

চার. গরম পানির ভেতর দিয়ে মুরগি অতিবাহিত হওয়া

মেশিনের মাধ্যমে জবাইয়ের শেষ মাসআলা হলো, গরম পানির ভেতর দিয়ে মুরগি অতিবাহিত হওয়া। একাজ তখনই করা হয় যখন ঘূর্ণমান ছুরি দ্বারা মাথা বিচ্ছিন্ন হয়ে মুরগিগুলো সামনে এগিয়ে যায়। সেখানে ঘূর্ণায়মান ছুরি দিয়ে জবাইয়ের পর এমন স্থানে রাখা হয় যেখানে মুরগিগুলোর ওপর দিয়ে গরম পানি ঢালা হয়ে থাকে। আর পানি ওপর থেকে এমনভাবে ছাড়া হয় যে, মুরগির পুরো দেহেই প্রবাহিত হয়। মুরগির ওপর পানি ঢালার ক্ষেত্রেও দুটি আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে।

এ ক্ষেত্রে প্রথমেই যে প্রশ্নটি উত্থাপিত হতে পারে তা হলো, যদি ঘূর্ণমান ছুরি দ্বারা মুরগিগুলোর রগ-শিরা শরিয়তসম্মত পদ্ধতিতে কাটা না হয়; তাহলে হতে পারে তার ভেতরে এখনো প্রাণ অবশিষ্ট আছে। আর এরপর যেহেতু গরম পানিতে রাখা হয় তাহলে এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, গরম পানির কারণেই মুরগিগুলোর মৃত্যু হয়েছে।

দ্বিতীয় যে প্রশ্নটি উত্থাপিত হতে পারে যে, অনেকে এ কথা দাবি করেছেন যে, মুরগিগুলোর নাড়িভুড়ি বের করা ছাড়াই এগুলোকে গরম পানিতে অতিবাহিত করা হয়। ফলে অনেক সময় এমন হয় যে, গরম পানিতে মুরগিগুলো সিদ্ধ হওয়ার কারণে তার নাপাকি গোশতের ভেতরে প্রবেশ করে। ফকিহগণ মাসআলা বলেছেন যে, এ জাতীয় প্রাণীর গোশত কখনোই হালাল হবে না। যেমন : দুররুল মুখতারে এসেছে—

وكذا دجاجة ملقاة حالة على الماء للنتف قبل شقها

> 'এই হুকুম ওই মুরগির ক্ষেত্রেও যাকে ফাড়ার আগে উত্তপ্ত পানিতে ছেড়ে দেওয়া হয়।[১৯৪]

এই আলোচনার অধীনে ইবনু আবেদিন রহ. বলেন—

---

[১৯৪] রদ্দুল মুহতার, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৩৪।

قال فى الفتح : إنها لا تطهر أبدا، لكن على قول أبي يوسف تطهر، والعلة والله أعلم، تشربها النجاسة بواسطة الغليان.

'ফাতহুল কাদির' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে, এমন মুরগি কখনোই পবিত্র হতে পারে না। তবে ইমাম আবু ইউসুফ রহ.-এর অভিমত অনুযায়ী পাক হতে পারে। পাক না হওয়ার কারণ হলো, গরম পানির কারণে নাপাকি গোশতের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যায়। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।[১৯৫]

তবে এই প্রশ্নটি আমাদের আলোচনাধীন মাসআলায় উত্থাপিত হতে পারে না। কারণ, যে গরম পানি দিয়ে মুরগির অতিবাহিত হতে হয়, সেই গরমের পরিমাণটা 'সেদ্ধ হওয়ার' পর্যায় কিংবা 'উত্তপ্ত হওয়ার' পর্যায়ে পৌঁছে না। কেননা, এ ক্ষেত্রে এই পানি শতভাগ গরমের চেয়ে যথেষ্ট পরিমাণ কম গরম হয়ে থাকে। দ্বিতীয় আরেকটি বিষয় হলো, মুরগিগুলোকে গরম পানিতে মাত্র কয়েক মিনিট রাখা হয়। আর এ পরিমাণ সময়ের ভেতরে গরমের প্রতিক্রিয়ায় গোশতের ভেতরে 'নাপাকি'প্রবেশ করার জন্য যথেষ্ট নয়। যেসব ফকিহ এ জাতীয় মুরগিকে নাপাক বলেছেন, তাদের কাছে এই অভিমত ওই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যখন পানি টগবগিয়ে ওঠার পর্যায়ের তীব্র গরম ও উত্তপ্ত হবে এবং সে মুরগি পানিতে এত দীর্ঘ সময় থাকে যে, এর ফলে নাপাকি' গোশতের ভেতর প্রবেশ করে। যেমন : ইবনু আবেদিন রহ. বর্ণিত মাসআলা বর্ণনা করার পর বলেছেন—

وعليه إشتهر أن اللحم السميط بمصر نجس، لكن العلة المذكورة لا تثبت ما لم يمكث اللحم بعد الغليان زمانا يقع في مثله التشرب والدخول في باطن اللحم، وكل منهما غير متحقق فى السميط حيث لا يصل إلى حد الغليان، ولا يترك فيه إلا مقدار ما تصل الحرارة إلى ظاهر الجلد لتنحل مسام الصوف، بل لو ترك يمنع إنقلاع الشعر.

'এই মাসআলার ভিত্তিতে এ কথা প্রসিদ্ধ যে, মিশরের [لحم سميط] 'সামিত গোশত' নাপাক। কিন্তু উপরোক্ত কারণ (তীব্র গরমের কারণে গোশতের ভেতর নাপাক প্রবেশ করা) ততক্ষণ পর্যন্ত পাওয়া যাওয়ার সম্ভাবনা নেই, যতক্ষণ পর্যন্ত ওই গোশত উত্তপ্ত পানিতে এই পরিমাণ সময় না থাকবে; যার দ্বারা গোশতের ভেতর পানি প্রবেশের সুযোগ

[১৯৫] রদ্দুল মুহতার, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৩৪।

হয়। আর এ ‘সামিত’-এ এই দুটির কোনোটিই পাওয়া যায় না। কারণ, প্রথমত সেই পানি তেমন তীব্র পর্যায়ে পৌঁছেনি। দ্বিতীয়ত, গরম পানিতে মুরগিকে এ পরিমাণ সময় রাখা হয়, যাতে করে শুধু মুরগির উপরের লোমকূপগুলো খসে পড়ে। কারণ, তা ছাড়া মুরগির পশম ওপড়ানো সম্ভব হয় না।[১৯৬]

বর্ণিত পদ্ধতিটি ওই পানির সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্যশীল, যে পানির ভেতর মেশিন দ্বারা জবাইকালে মুরগি অতিবাহিত করা হয়ে থাকে। আমি নিজেও ওই পানি স্পর্শ করে দেখেছি যে, ওই পানি দ্বারা সেদ্ধ হওয়া কিংবা টগবগিয়ে ওঠা তো দূরের কথা; বরং ওই পানি দ্বারা হাতও ঝলসে না।

মেশিনে জবাইকৃত মুরগির বর্ণিত আলোচনার সারকথা

ইতোপূর্বে মেশিনে জবাইকৃত মুরগি নিয়ে যে বিশদ আলোচনা আমরা করেছি; শরয়ি দৃষ্টিকোণের আলোকে তাতে নিচে বর্ণিত দোষনীয় বিষয়গুলো বিদ্যমান।

প্রথম দোষ : কোনো কোনো জবাইখানায় মুরগিগুলোকে জবাইয়ের আগে বিদ্যুৎ-সংযোজিত ঠান্ডা পানিতে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। ফলে এ সংশয়ের উদ্রেক হয় যে, জবাইয়ের আগেই হয়তো এগুলোর মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে। কারণ, কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির ধারণা হলো, বিদ্যুৎ-সংযোগের কারণে শতকরা নব্বই ভাগ মুরগিই চেতনাশক্তি হারিয়ে ফেলে। মহান আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

দ্বিতীয় দোষ : অধিকাংশ মেশিনে সংযোজিত ঘূর্ণায়মান ছুরিগুলো মুরগির রগ-শিরা কাটার জন্য যথেষ্ট হলেও কোনো কোনো সময় সেগুলো আবার এমনও হয় যে, ওইসব মুরগির গলায় পৌঁছতে সক্ষম হয় না। ফলে মুরগির গলা একেবারেই কাটে না। কিংবা অল্প অল্প কাটলেও বেশকিছু অংশ কাটা বাকি থেকে যায়।

তৃতীয় দোষ : মেশিনে এই ছুরিগুলো সংযোজিত অবস্থায় সচল থাকলে সবক’টি মুরগির ওপর ‘বিসমিল্লাহ’ পড়া কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। এছাড়া মেশিন

---

[১৯৬] রদ্দুল মুহতার, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৩৪।

চালু করার সময় 'বিসমিল্লাহ' পড়া অথবা ছুরির নিকট দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তির 'বিসমিল্লাহ' পড়া শরিয়তের চাহিদা পূরণে যথেষ্ট হিসেবে বিবেচিত হয় না।

চতুর্থ দোষ : যে গরম পানির ভেতর দিয়ে মুরগিগুলো অতিক্রান্ত হয়ে থাকে, তাতে এ সন্দেহ হয় যে, মুরগিগুলোর গলা একেবারেই কাটেনি কিংবা অল্পস্বল্প কেটেছে। সেই মুরগিগুলোর গরম পানিতে থাকার কারণে মৃত্যু হয়েছে।

উপর্যুক্ত বর্ণিত চারটি দোষনীয় বিষয় বিশ্লেষণ করলে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এই দোষগুলো দূর করা কোনো কঠিন কাজই নয়। বরং মেশিন দ্বারা জবাইয়ের পদ্ধতির মাঝে কিছুটা সংশোধন করে নিলেই এসবগুলো কাজ শরিয়তসম্মত পদ্ধতিতে করা সম্ভব।

প্রথম সংশোধন : প্রথম সংশোধন হলো এই যে, ঠান্ডা পানিতে বিদ্যুৎ সংযোজন না দেওয়া। কিংবা এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যে, বিদ্যুৎ সংযোজনের কারণে মুরগির চেতনাশক্তি বিলুপ্ত হয় কি না।

দ্বিতীয় সংশোধন : মেশিন থেকে ছুরি খুলে ফেলা হবে এবং তার স্থলে কয়েকজন মুসলিম বা আহলে কিতাব দাঁড় করিয়ে রাখা হবে। যখনই মুরগি দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোর সামনে দিয়ে অতিক্রম করবে তখনই তারা তাতে 'বিসমিল্লাহ' বলে প্রত্যেকটা মুরগি জবাই করবে। এর বিস্তারিত নীতিমালা ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে। মুসলিমদের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে অনেক বড়ো বড়ো জবাইখানার কর্তৃপক্ষ নিজেদের জবাইখানাগুলোতে এই পদ্ধতি চালু করেছে এবং এ কারণে তাদের উৎপাদনে কোনো প্রকার ঘাটতি দেখা যায়নি।

তৃতীয় সংশোধন : এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া জরুরি যে, যে গরম পানিতে জবাইকৃত মুরগিগুলো অতিক্রম করা হয় তা যেন তীব্র গরমের পর্যায়ে না পৌঁছে।

উপর্যুক্ত তিন সংশোধনী গ্রহণ করা হলে মেশিনে জবাইকৃত মুরগিসমূহ হালাল হয়ে যাবে।

মেশিনে চতুষ্পদ জন্তু জবাই

গরু, (মহিষ,) বকরি, (ভেড়া, দুম্বা,) ইত্যাদি বড়ো বড়ো জন্তু। যেগুলো মেশিনে জবাই করা হয়ে থাকে; সেগুলো জবাইয়ের পদ্ধতি মুরগি জবাইয়ের পদ্ধতি থেকে

ভিন্ন। অর্থাৎ, মেশিনের মাধ্যমে চতুষ্পদ জন্তু জবাই ও মুরগি জবাইয়ের মাঝে বেশ পার্থক্য রয়েছে। মেশিনের ছুরির মাধ্যমে জবাই করে পশুর প্রাণ বের করা হয় না। বরং এমন পদ্ধতিতে প্রাণ বের করা হয় যাতে মানুষের হস্তক্ষেপ রয়েছে। সেইসব পদ্ধতির মাঝে একটি হলো, 'শ্বাসরুদ্ধ করা। বর্তমান যুগে জবাইয়ের যে 'ইংরেজি পদ্ধতি' চালু রয়েছে, তার মাঝে এ পদ্ধতি পাওয়া যায়। এ পদ্ধতির মাঝে পশুর দুই পাঁজরের মাঝে বক্ষ বিদারণ করা হয়। তারপর তাতে হাওয়া ভরা হয়। অর্থাৎ, পাম্পের সাহায্যে এর মাঝে তীব্র বাতাস সঞ্চালন করা হয়। তীব্র গতিতে বাতাস সঞ্চালন করায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে পশুটি মারা যায়। ফলে ওই পশু থেকে কোনো প্রকার রক্ত প্রবাহিত হয় না। এ বিষয়টি তো সম্পূর্ণ পরিস্কার যে, এভাবে জবাইকৃত পশু শ্বাসরোধে মৃত পশুর অন্তর্ভুক্ত। আর তা হারাম হওয়ার ব্যাপারে অকাট্য প্রমাণ রয়েছে কুরআন কারিমে। ইতোপূর্বে আমরা বর্ণনা করে এসেছি যে, শ্বাসরোধে মারা যাওয়ার কারণে পশুটি হারাম বলে বিবেচিত হবে। তা কোনো মুসলিমের মাধ্যমে হোক কিংবা আহলে কিতাবের মাধ্যমেই হোক। সুতরাং শ্বাসরোধে মৃত জন্তুটি হালাল হওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

তবে বর্তমান যুগে অধিকাংশ জবাইখানায় গলার এক অংশ কেটে কিংবা ঘাড় কেটে রক্ত প্রবাহের মাধ্যমে জবাইয়ের কাজ সম্পন্ন করে থাকে। তবে যেহেতু পশুকে বিভিন্নভাবে আহত করার প্রচলন রয়েছে তাই আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি না যে, এভাবে আহত করার দ্বারা রগ-শিরা কাটে কি না। অথবা পশুর গর্দান ছাড়া অন্য কোথাও কাটা হয় কি না। এসব প্রাণী ওই সময় পর্যন্ত হালাল হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত এ ব্যাপারে নিশ্চিত না হওয়া যাবে যে, প্রাণীর সবগুলো রগ কাটা হয়েছে কি না। যে রগগুলো কাটা শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত এবং অবশ্যই কাটা ওয়াজিব। উল্লেখ্য, জবাইকারী মুসলিম হলে তার জন্য এতটুকু সুযোগ রয়েছে যে, সে প্রাণীর সবগুলো রগ শরিয়তসম্মত পদ্ধতিতে জবাই করে নেবে।

কিন্তু ওইসব জবাইখানার জবাইকৃত পশুর ব্যাপারে মূল কথা হলো, জবাইয়ের কার্যক্রম শুরু করার আগে তারা পশুটিকে অজ্ঞান কিংবা অনুভূতিহীন করার জন্য বেশ গুরুত্ব দিয়ে থাকে এবং খুব বেশি বাড়াবাড়ি করে থাকে। এ ক্ষেত্রে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, এর মাধ্যমে পশুর কষ্ট কম হয়। তাই তারা এটিকে আবশ্যক বলে মনে করে। ওইসব লোকেরা পশু শৃঙ্খলিত অবস্থায় জবাইয়ের আগ মুহূর্তে পশুটিকে প্রতিহত করে রাখার জন্য এবং সহজে তার ঘাড়কে জবাই করার কাছাকাছি আনার জন্য অসংখ্য হাতিয়ার ব্যবহার করে থাকে।

পশু অজ্ঞানের পদ্ধতি

জবাই করার আগে পশুকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে জ্ঞানশূন্য করার প্রচলন রয়েছে। নিচে তারই বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হলো—

প্রথম পদ্ধতি : পশু জবাইয়ের আগে পশুকে অজ্ঞান করার যে পদ্ধতিটি সাধারণত সবাই ব্যবহার করে থাকে তা হলো, জবাইয়ের আগে পিস্তল ব্যবহারের মাধ্যমে পশুকে অজ্ঞান করা হয়। তবে এই পিস্তলটি গুলি চালানোর পিস্তল নয়। বরং এই পিস্তলটি চালানোর সময় তা থেকে সুঁই কিংবা ধাতুদ্রব্যের একটি শলা বের হয়। পিস্তলটি পশুর কপালে ঠেকিয়ে গুলি চালানো হয়। এতে করে পিস্তলের ভেতরের সুঁই বা শলাটি বের হয়ে পশুর মস্তিষ্ক ছিদ্র করে দেয়। ফলে পশুটি জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। এরপর পশুটিকে জবাই করা হয়।

দ্বিতীয় পদ্ধতি : পশু অজ্ঞান করার দ্বিতীয় পদ্ধতিটি হলো, পশুর কপালে বড়ো ভারি হাতুড়ি দ্বারা আঘাত করা হয়। (ফলে ওই জন্তুটি বেহুঁশ হয়ে যায়।) যেহেতু এই পদ্ধতিটি পশুর জন্য বেশ কষ্ট এবং পীড়াদায়ক, এজন্য অধিকাংশ জবাইখানায় এই পদ্ধতি পরিহার করা হয়। আর এর পরিবর্তে পিস্তল দ্বারাই জ্ঞানশূন্য করার পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

তৃতীয় পদ্ধতি : পশু জ্ঞানশূন্য করার তৃতীয় পদ্ধতিটি গ্যাস ব্যবহার করার মাধ্যমে করা হয়ে থাকে। সেটি এভাবে যে, প্রথমে পশুটিকে একটি সংরক্ষিত কক্ষে আবদ্ধ করে রাখা হয়। যেখানে নির্দিষ্ট পরিমাণ বিশেষ 'কার্বনঅক্সাইড' ব্যবহার করা হয়। আর সেই গ্যাস পশুর মস্তিষ্কে প্রভাব বিস্তার করে। ফলে প্রাণীটি অজ্ঞান হয়ে যায়। এরপর পশুটিকে হাত দিয়ে জবাই করা হয়।

চতুর্থ পদ্ধতি : পশুকে অজ্ঞান করার চতুর্থ পদ্ধতি হলো, বিদ্যুতের মাধ্যমে শর্ট দেওয়া। এই পদ্ধতি হলো, চিমটার মতো একটি যন্ত্র পশুর উভয় কানে লাগিয়ে দেওয়া হয়। এরপর বিদ্যুতের সংযোগ দিয়ে সুইচ টেপা হয়। ফলে সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ সংযোগ তার মাথায় আঘাত করে। এভাবে বিদ্যুতের ঝাকুনিতে পশুটি অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যায়।

প্রাণীকে অজ্ঞান করার শরয়ি পদ্ধতি জানতে হলে, আমাদেরকে দুটি পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করা অতি জরুরি। প্রথম বিষয় হলো, প্রচলিত পদ্ধতি গ্রহণ করে প্রাণীকে জ্ঞানশূন্য করা কি জায়েজ হবে? দ্বিতীয় বিষয় হলো, অজ্ঞান হওয়ার পর

ওই পশুটি কোনো মুসলিম কিংবা আহলে কিতাব শরিয়তসম্মত পদ্ধতিতে জবাই করলে তা হালাল হবে কি না।

এ জাতীয় পদ্ধতি অবলম্বন করে পশুকে অজ্ঞান করা জায়েজ কি না? মূলত তা নির্ভর করে এই পদ্ধতি অবলম্বন করার মাধ্যমে পশুর কষ্ট হ্রাস পায় কি না? এর অন্য একটি কারণ, প্রসিদ্ধ একটি হাদিসে মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জবাইয়ের সময় তোমরা পশুর সঙ্গে নরম ও সদাচরণ করো। যেমনটি তিনি এ হাদিসে বলেছেন—

> إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته.
>
> 'যখন তোমরা (কোনো কাফেরকে) হত্যা করো, তখন উত্তমপন্থায় হত্যা করো। আর যখন (কোনো পশু) জবাই করবে, তখন তা উত্তমপন্থায় করবে। নিজের ছুরি ধার দিয়ে নাও এবং নিজের পশুকে আরাম দাও।[১৯৭]

আর স্বতঃসিদ্ধ কথা হলো, ইসলামি শরিয়ত পশু জবাইয়ের ক্ষেত্রে তার সবগুলো রগ-শিরা কাটার যে পদ্ধতি প্রবর্তন করেছে, এই পদ্ধতিটি পশুর প্রাণ বের করার জন্য একটি উত্তম ও সুন্দর পদ্ধতি। এটি পশুর জন্য বেশ সহজ ও আরামদায়ক একটি পদ্ধতি। অজ্ঞান করার যে পদ্ধতিগুলো বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলো অনেক সময় পশুর জন্য ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। পশুকে অজ্ঞান করার জন্য পশু রমাথায় হাতুড়ি দিয়ে জোরে আঘাত করা। এতে পশুর জবাইয়ের কষ্টের চেয়ে বেশি কষ্ট হয় অজ্ঞান করার সময়। নিঃসন্দেহে এই পদ্ধতিটি শরিয়তসম্মত ও জায়েজ পদ্ধতি নয়। অবশ্য পশুকে জ্ঞানশূন্য করার অন্য যেসব পদ্ধতি রয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে আমি নিশ্চিত নই যে, এর কারণে পশু জবাইয়ে কষ্ট হ্রাস পায় কি না। কারণ, পশুর কপালে পিস্তল দিয়ে গুলি করার কারণে এর জন্য তাকে বেশ ধকল সামলাতে হয়। একই অবস্থা হয় বৈদ্যুতিক শক দেওয়ার ক্ষেত্রে। আবার গ্যাস ঘরে আবদ্ধ করে রাখার দ্বারা তাকে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থার মাঝে ঠেলে দেওয়া হয়। তবে পশু বিশেষজ্ঞদের দাবি অনুযায়ী, এর মাধ্যমে পশুর কষ্ট লাঘব হয়। তাই যদি এই ব্যাপারটি চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয় যে, এ জাতীয় পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে

---

[১৯৭] সহিহ মুসলিম, হাদিস : ১৯৫৫, তিরমিজি, আবু দাউদ ও নাসায়ি¾দেখুন, জামিউল উসুল, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৪৮১।

পশুর কষ্ট কম হয় এবং এসব কার্যক্রমে পশুর মৃত্যু হয় না; তাহলে এ জাতীয় পদ্ধতি অবলম্ব করা জায়েজ হবে। অন্যথায় তা জায়েজ হবে না।

অজ্ঞান করে জবাইকৃত পশুর হুকুম

অজ্ঞান করে জবাইকৃত পশু হালাল না হারাম সেটি মূলত নির্ভর করে অজ্ঞান করার দ্বারা পশুর মৃত্যু হয় কি না তার ওপর। বর্তমান যুগে এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের দাবি হলো, এ জাতীয় পদ্ধতি অবলম্বনে পশুর মৃত্যু হয় না। বরং এর দ্বারা পশুকে জ্ঞানশূন্য করা হয়। ফলে কষ্টের অনুভূতি শেষ হয়ে যায়।

তবে বিশেষজ্ঞদের এ দাবিতে চিন্তার বেশ খোরাক রয়েছে। কারণ, পিস্তল দ্বারা বেহুঁশ করার কারণে পশুর কপালে ও মস্তিষ্কে অত্যন্ত মারাত্মকভাবে চোট লাগে। আর তা কোনো অসম্ভবের বিষয় নয় যে, এর কারণে পশুর মৃত্যু হয়ে যেতে পারে। সুতরাং এ জাতীয় প্রাণী প্রহারে মৃত জন্তুর হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। আমি নিজেও আমেরিকার 'দি ট্রায়েট' শহরে প্রত্যক্ষ করেছি যে, পিস্তল থেকে প্রায় এক আঙুল পরিমাণ মোটা শলা বের হয়ে গরুর মস্তিষ্কে প্রবেশ করছে। ফলে সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্ক থেকে রক্ত বের হয়ে পশুটি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নড়াচড়া একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়, যেন সেটি মরেই গেছে।

কিন্তু এ জবাইখানার মালিক বললেন, পিস্তল চালানোর পরও কয়েক মিনিট পশুটি জীবিত থাকে। যদি বারো মিনিটের মধ্যে সেটিকে জবাই করা না হয় তাহলে সেটি মারা যায়। একবার ওই জবাইখানায় নিয়োজিত সরকারি প্রফেসরের সঙ্গে তার অফিসে গিয়ে সাক্ষাত করি। তিনি বলেন, এ পদ্ধতিতে বেহুঁশ করার দ্বারা দুটি সম্ভাবনা রয়েছে। একটি হলো, এভাবে বেহুঁশ করার কয়েক মিনিট পরেই সেটি মারা যায়। দ্বিতীয়টি হলো, পশুটি ক্রমান্বয়ে জ্ঞান ও বোধশক্তি ফিরে পেতে থাকে। প্রফেসর সাহেব কথা প্রসঙ্গে এ কথাও স্বীকার করেন যে, বেহুঁশ করার এই পদ্ধতি একসঙ্গে কয়েকটি পশুর ওপর প্রয়োগ করা হয়। এরপর ধারাবাহিকভবে জবাইয়ের কাজও সম্পাদন করা হয়। এজন্য এটি কোনো অসম্ভব নয় যে, যেহেতু একসঙ্গে অনেক পশু বেহুঁশ করা হয়, ফলে জবাই করার পূর্বেই মৃত্যু যন্ত্রণায় অনেক পশুর মৃত্যু হয়ে যেতে পারে। আর আমাদের এমন কোনো পদ্ধতিও জানা নেই যে, যার দ্বারা আমরা জানতে পারি যে, জবাইয়ের সময় পশুটি জীবিত ছিলো।

মোটকথা, প্রফেসর সাহেবের কথা যাচাই করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে যে পদ্ধতি আমি প্রত্যক্ষ করেছি, তাতে যে পশুর মৃত্যু হয়না, প্রফেসর সাহেবের এমন দাবির 'অর্থাৎ, অজ্ঞান করার কারণে পশুর মৃত্যু হয় না' ব্যাপারে আমি সন্দেহমুক্ত হতে পারছি না। আবার এমনটি হওয়াও তো অসম্ভব নয় যে, এত মারাত্মক আঘাত পাওয়ার কারণে কোনো কোনো প্রাণীর মৃত্যুও হয়ে যেতে পারে।

বিদ্যুৎ শর্টে পশু বেহুঁশ করার ক্ষেত্রে কোনো কোনো বিশেষজ্ঞজনের স্বীকৃতি হলো, কখনো এই শর্টের কারণে পশুর স্পন্দ বন্ধ হয়ে যায়। তেমনিভাবে গ্যাসের মাধ্যমে পশুকে অজ্ঞান করার ক্ষেত্রে গ্যাসের পরিমাণ যদি বেশি হয়ে যায়, তাহলে সম্ভাবনা আছে, এর কারণে পশুর মৃত্যুও হতে পারে।

মোটকথা, এ বিষয়ে প্রাজ্ঞ ও আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন মুসলিম সমাজ এবং অভিজ্ঞ আলেমসমাজের গভীর চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন রয়েছে। যেহেতু বিষয়টি আমদের ইচ্ছার বাইরে, তাই আমার পক্ষ থেকে এ বিষয়ে চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা উচিত হবে না।

অবশ্য আমি ফেকাহ্ একাডেমির কাছে আবেদন করছি যে, তারা যেন এ বিষয়ে অবিজ্ঞ ও পন্ডিত একদল মুসলিম ফকিহ্দের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করে দেন। যাতে তারা এ বিষয়ে তথ্য-উপাত্ত যোগাড় করে আলোচনা-পর্যালোচনার মাধ্যমে বিচার-বিশ্লেষণ করে ফেকাহ্ একাডেমির কাছে একটি চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করেন। এতে কোনো সন্দেহ্ নেই যে, বেহুঁশ করার উল্লিখিত পদ্ধতি যদি পশু মৃত্যুর কারণ হয়, কিংবা এই পন্থা অবলম্বনের কারণে যদি পশুর মৃত্যুর সংশয় হয় তাহলে এ জাতীয় পন্থা অবলম্বন করা জায়েজ হবে না। আর বেহুঁশ করার পর জবাইকৃত পশু হালাল হিসেবে বিবেচিত হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত এই পদ্ধতি অবলম্বন করলে সংশয় থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই পদ্ধতি অবলম্বন থেকে দূরে থাকা উচিত। প্রসিদ্ধ আছে যে, ইহুদি সম্প্রদায় পশুকে বেহুঁশ করার কোনো পদ্ধতিই অবলম্বন করে না। তাহলে তো মুসলিমদের এই সন্দেহ্ ও সংশয় থেকে আরও দূরে থাকা উচিত। মহান আল্লাহ্ সর্বাধিক অবগত।

অমুসলিম দেশ থেকে আমদানিকৃত গোশতের বিধান

শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি

‘অমুসলিম দেশ থেকে আমদানিকৃত গোশতের বিধান’ এই প্রবন্ধটি উস্তাজে মুকাররাম শায়খুল ইসলাম মুফতি মুহাম্মাদ তকি উসমানি (হাফিজাহুল্লাহ) أحكام الذبائح واللحوم المستورة নামক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন। প্রবন্ধটি بحوث في قضايا فقهية معاصرة পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। সর্বসাধারণের উপকারার্থে এই অধম এটিরও উর্দু অনুবাদ করে দিয়েছে।

—আবদুল্লাহ্ মায়মান

মাকতাবাতুল ইসলাম মাকতাবাতুল ইসলাম

অমুসলিম দেশ থেকে আমদানিকৃত গোশতের বিধান

আজকাল অমুসলিম দেশ, যেমন : আমেরিকা, ইংল্যান্ড, হল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানিকৃত গোশতের রমরমা ব্যবসা চলছে। কোনো প্রকার যাচাই-বাছাই ছাড়াই এসব গোশত বেচাকেনা হচ্ছে দেদারসে। ইতোপূর্বে দলিল-প্রমাণের আলোকে এ বিষয়টি পরিষ্কারভাবে সামনে এসেছে যে, আহলে কিতাবের জবাইকৃত পশুর গোশত মুসলিমদের জন্য তখনই হালাল হবে যখন পশুটি শরিয়তসম্মত পদ্ধতিতে জবাই করা হবে। যে যুগে পবিত্র কুরআন আহলে কিতাবের জবাইকৃত পশু মুসলিমদের জন্য হালাল সাব্যস্ত করে; সেই যুগে এ বিষয়গুলোর প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য রাখা হতো। বর্তমান যুগে ইহুদিদের ব্যাপারে এ কথা প্রসিদ্ধ আছে যে, আজও তারা জবাইয়ের ক্ষেত্রে নিজ ধর্মের বিধিবিধান অনুসরণ করে থাকে। তারা এমন চেষ্টাও করে যে, নিজ ধর্মের পন্ডিতদের তত্ত্বাবধানে নিজেদের জন্য পৃথকভাবে স্বতন্ত্র জবাইখানা নির্মাণ হোক। তারা নিজেদের জবাইকৃত গোশতকে 'কোশর' নামকরণ করে স্বাতন্ত্র বজায় রাখে। যেখানে ইহুদি বসবাস করে সেখানে এই গোশত সহজেই পাওয়া যায়।

বর্তমান যুগের খ্রিস্টানরা জবাইয়ের ক্ষেত্রে শরিয়তের সব বিধিবিধান এবং নিয়ম-নীতির শৃঙ্খল মুক্ত হয়ে নিজেরেদ পূর্ণ স্বাধীন ভাবতে শুরু করেছে। এখন তারা তাদের ধর্মগ্রন্থে যে বিধি বিধান বিদ্যমান আছে, সেগুলোর প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপ

করছে না। (ইতোপূর্বে তাদের ধর্মগ্রন্থের বেশকিছু উদ্ধৃতি আমাদের আলোচনায় গিয়েছে।) এমতাবস্থায় তাদের জবাইকৃত পশু ততক্ষণ পর্যন্ত হালাল হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো প্রাণীর ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে জানা না যাবে যে, তারা এই প্রাণীটি জবাইয়ের ক্ষেত্রে শরিয়তের সব শর্তের অনুকরণ করেছে। মোটকথা, বর্তমানে যে গোশত পাশ্চাত্যের বাজারে বেচা-কেনা হচ্ছে এবং অমুসলিম দেশ থেকে মুসলিম দেশগুলোতে আমদানি করা হচ্ছে তা বর্জনের একাধিক কারণ রয়েছে। নিচে সেই কারণগুলো তুলে ধরা হলো।

প্রথম কারণ : বিশ্বের অমুসলিম দেশ থেকে যে গোশত আমদানি করা হয়, সেই পশুর জবাইকারীর ধর্মীয় পরিচয় জানা প্রায় অসম্ভব। কারণ, ওইসব দেশে মূর্তিপূজারী, অগ্নিপূজারী, নাস্তিক ও বস্তুবাদীরা ব্যাপকভাবে বসবাস করে। তাই এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া খুবই কঠিন একটি বিষয় যে, যে পশুর গোশত বাজারে কেনা-বেচা হচ্ছে, তার জবাইকারী আহলে কিতাব কি না?

দ্বিতীয় কারণ : অনুসন্ধানের মাধ্যমে কিংবা বসবাসকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার কারণে যদি এ কথা প্রমাণও হয়ে যায় যে, জবাইকারী খ্রিস্টান। তারপরও তো এ বিষয়টি অস্পষ্ট থেকে যায় যে, সে আকিদাগত দিক থেকে নাস্তিক না বস্তুবাদী। ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে, বর্তমান সময়ে অসংখ্য খ্রিস্টান এমনও রয়েছে যে, যারা এই বিশ্বজগতের জন্য আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয়। নাউজুবিল্লাহ। এমতাবস্থায় জবাইকারী প্রকৃত খ্রিস্টান নয়।

তৃতীয় কারণ : যদি অনুসন্ধান কিংবা বাহ্যিক অবস্থা থেকে প্রমাণিত হয় যে, জবাইকারী খ্রিস্টান। কিন্তু তাদের ক্ষেত্রে এ কথা প্রসিদ্ধ আছে যে, তারা জবাইয়ের ক্ষেত্রে শরিয়ত নির্দেশিত পন্থা যথাযথভাবে করে না। বরং কোনো কোনো খ্রিস্টান তো পশুকে শ্বাসরোধ করে মেরে ফেলে। আবার কোনো কোনো খ্রিস্টান পশুর রগ-শিরা কাটা ছাড়াই পশুকে হত্যা করে ফেলে। আর কোনো কোনো খ্রিস্টান পশুকে অজ্ঞান করার জন্য সন্দেহযুক্ত পদ্ধতি অবলম্ব করে। যা ইতিপূর্বে আমরা বলে এসেছি।

চতুর্থ কারণ : এ বিষয়টি নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত যে, খ্রিস্টানরা জবাইয়ের সময় 'বিসমিল্লাহ' বলে না। অধিকাংশ ফকিহ-এর কাছে গ্রহণযোগ্য অভিমত হলো, আহলে কিতাবের জবাইকৃত পশু হালাল হওয়ার জন্য 'বিসমিল্লাহ' শর্ত।

মোটকথা, উল্লিখিত শক্তিশালী কারণ বিদ্যমান থাকায়, মুসলিমদের জন্য অমুসলিম দেশ থেকে যেসব গোশত আমদানি করা হয়, সেই গোশত খাওয়া হালাল হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো নির্দিষ্ট গোশতের ব্যাপারে এ কথা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত না হবে যে, এই গোশত শরিয়তসম্মতভাবে জবাইকৃত পশুর গোশত। যদি তা প্রমাণিত হয় তাহলে তা খাওয়া জায়েজ। আদি ইবনু হাতেম রা.-এর হাদিস দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, গোশতের মূল হুকুম হলো, হারাম হওয়া। যতক্ষণ না এর বিপক্ষে কোনো দলিল পাওয়া যায়। তাছাড়া মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন শিকার খেতে নিষেধ করেছেন, যে শিকারে শিকারী কুকুর ছাড়া ভিন্ন কোনো কুকুর তাতে অংশ নেয়।

এমনিভাবে শিকার সম্পর্কে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

> ان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فإنك لاتدرى الماء قتله أو سهمك.
>
> 'যদি তোমার শিকারকে পানিতে ডুবন্ত অবস্থায় পাও, তাহলে সেই শিকার খেয়ো না। কারণ, তোমার জানা নেই যে, ওই প্রাণীটি পানিতে ডোবার কারণে মৃত্যু হয়েছে না তোমার তির নিক্ষেপের কারণে মৃত্যু হয়েছে।[১৯৮]

এ দ্বারা বোঝা গেলো যে, যদি কোনো প্রাণীর মাঝে হালাল-হারাম উভয়ের সম্ভাবনা থাকে তাহলে হারামের দিকটা প্রাধান্য পাবে। উল্লিখিত হাদিসও গোশতের মূল অবস্থান 'হারাম হওয়া' এই মূলনীতির প্রতিই ইঙ্গিত করে। এই নীতি অনেক ফকিহই উল্লেখ করেছেন।

একই হুকুম পাশ্চাত্য দেশ থেকে আমদানিকৃত গোশতের ক্ষেত্রে। কারণ, তাতে নিষেধাজ্ঞার চারটি কারণই বিদ্যমান। অবশ্য অমুসলিম দেশ থেকে আমদানিকৃত গোশতের প্যাকেট বা কার্টুনে একটি সত্যায়নপত্র লেখা থাকে যে, এই গোশত ইসলামি বিধান অনুযায়ী জবাইকৃত পশুর।

ব্যাপকভাবে অনুসন্ধানের পর এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, এই ট্রেডমার্কের ওপর কোনোক্রমেই বিশ্বাস স্থাপন করা যাবে না। কারণ, এ বিষয়ে সৌদি আরবের 'গ্র্যান্ড ওলামা বোর্ড' যেসব মুসলিম দেশে গোশত আমদানি করা হয় সেসব দেশে নিজেদের প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। ওইসব জবাইখানার প্রতিবেদন সংগ্রহ করার

---

[১৯৮] সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৯৭৩

পর প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে যে রিপোর্ট পেশ করা হয় তা থেকে এ কথা স্পষ্ট যে, ট্রেডমার্কে সত্যায়ন হিসেবে যা লেখা হয় তাতে মোটেও আস্থা রাখা যায় না। 'গ্র্যান্ড ওলামা বোর্ড-এর ফতোয়ায় অমুসলিম দেশ থেকে আমদানিকৃত গোশতের ব্যাপারে সিদ্ধান্তমূলক যে রেজুলেশন গৃহীত হয়েছে তা তুলে ধরা হলো।

গ্র্যান্ড ওলামা বোর্ডের সিদ্ধান্ত

আমেরিকা এবং অন্যান্য দেশ থেকে যে গোশত সৌদি আরবে আমদানি করা হয়ে থাকে, সেইসব গোশতের ব্যাপারে কোনো হুকুম আরোপ না করে শুধু পশু জবাইয়ের শরিয়তসম্মত পদ্ধতি বর্ণনা করে দিলেই যারা হালাল খেতে চায় এবং হারাম থেকে বেঁচে থাকতে চায়, তাদের জন্য তা ফলদায়ক হবে বলে মনে হয় না। সুতরাং যেসব অমুসলিম দেশ থেকে সৌদি আরবে গোশত আমদানি করা হয়। সেখানকার কোম্পানিগুলো সম্পর্কে এ বিষয়গুলো জানা জরুরি।

১. কীভাবে তারা জবাই করে? ২. জবাইকারী ব্যক্তি কে? তবে এ বিষয়গুলো সাধারণ মানুষ কীভাবে জানবে? একে তো বহু দূরের দেশ, আবার সেখানে যাওয়া খুব কঠিন কাজ। খরচের ব্যাপার তো আছেই। সেজন্য খুব কম সংখ্যক লোক সেসব দেশে সফর করতে পারে। আবার যারা ওইসব দেশে যান তারা বিশেষত, চিকিৎসা, জীবিকা উপার্জন বা পড়া শোনার জন্য গিয়ে থাকেন। কিন্তু এই উদ্দেশ্যে কেউ সফর করে না এবং তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ কিংবা এর হাকিকত জানার জন্য কেউ নিজেকে কষ্টে জড়াতে চায় না। এ কারণে 'ইদারাতুল বুহুস আল ইসলামিয়া'-এর সদর দফতরের পক্ষ থেকে ওইসব কোম্পানির দায়িত্বশীলদের কাছে একটি চিঠি প্রেরণ করা হয়, যেসব কোম্পানি সৌদি আরবে গোশত বা খাদ্যদ্রব্য রফতানি করে থাকে। সেই চিঠিতে কোম্পানির প্রকৃত অবস্থা জানতে চাওয়া হয়। সেইসঙ্গে তাদের কাছে এই আবেদন করা হয়েছে যে, তারা যেন দীনি ও শরয়ি দিকটাকে বিশেষভাবে বিবেচনায় রাখে। যাতে মুসলিমদেরকে ওইসব খাবার থেকে বিরত রাখা যায়, যে খাবার 'মহান আল্লাহ তাদের জন্য হারাম করেছেন।

কোম্পানিগুলোর পক্ষ থেকে চিঠির যে জবাব দেওয়া হয়, তা ছিলো অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। যার দ্বারা নিশ্চিত হওয়া যায় না, আবার সংশয়মুক্তও হওয়া যায় না।

তাই পুনরায় সেই সংস্থার পক্ষ থেকে তাদের নিজস্ব প্রতিনিধি, যারা ইউরোপ আমেরিকায় থাকে তাদের কাছে এই মর্মে চিঠি প্রেরণ করা হয় যে, তারা যেন জবাইখানার সার্বিক অবস্থা এবং জবাইকারীর দীনদারি সম্পর্কে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে একটি প্রতিবেদন পেশ করে। অনেকে সেই দ্বিতীয় চিঠির জবাবও সংক্ষিপ্ত করে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু কোনো কোনো প্রতিনিধি এ বিষয়ে খুব সচেতন হয়ে জবাইয়ের অবস্থা এবং জবাইকারীর ধর্মীয় পরিচিতি নিয়ে বিরাট এক প্রতিবেদন তৈরি করেন। যা প্রায় একটি গ্রন্থের মতো হয়ে যায়। পরে সেটিকে তারা ওই সংস্থার চিঠির জবাবে পাঠিয়ে দেন। মহান আল্লাহ যত্নবান এই প্রতিনিধিদের উত্তম বিনিময় দান করুন। আমিন।

কিন্তু এসব জবাবে সবগুলো কোম্পানির প্রকৃত অবস্থা জানা সম্ভব হয়নি। যে কোম্পানিগুলো সৌদি আরবে গোশত রফতানি করে থাকে, সে কোম্পানিগুলোর কোনো কোনোটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনাও এসেছে।

মোটকথা, কোম্পানিগুলোর যে রিপোর্ট কমিটির হস্তগত হয়েছে, চিঠি-পত্রের মাধ্যমে এ ব্যাপারে যে তথ্য সংগ্রহ হয়েছে; শরিয়তসম্মত জবাইয়ের যে বর্ণনা ইতোপূর্বে গিয়েছে এবং এ বিষয়ে যে ফতোয়া দেওয়া হয়েছে নিচে এর সারমর্ম তুলে ধরা হলো। যাতে আমদানিকৃত গোশতের বিধান সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা হয়।

সারমর্ম

১. 'রাবেতা আলমে ইসলামির সেক্রেটারি জেনারেল 'ইদারাতুল বুহুস আল ইসলামির সভাপতি বরাবর এ পত্র লেখেন যে, আমাদের কাছে রিপোর্ট এসেছে যে, অস্ট্রেলিয়ার কোনো কোনো কোম্পানি যারা ইসলামি দেশে গোশত রফতানি করে থাকে। বিশেষ করে 'আল হালালুস সাদিক' কোম্পানি, যার মালিক 'হালালুস সাদিক' একজন বিখ্যাত কাদিয়ানি। তারা গরু, ছাগল, পাখি ইত্যাদি জবাইয়ে কখনো ইসলামি শরিয়তের বিধানের কোনো তোয়াক্কা করে না। এসব কোম্পানির জবাইকৃত গোশত খাওয়া হারাম। 'রাবেতা আলমে ইসলামি' নিজেদের কিতাবে যে সিদ্ধান্ত ও সুপারিশ পেশ করেছে সেগুলোর অনুসরণ জরুরি।

২. শায়খ আহমাদ ইবনু সালেহ মুহায়িরির পক্ষ থেকে ফ্রান্সের 'বরয়ীসা' কোম্পানির জবাইয়ের পদ্ধতি সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট এসেছে। তবে সেই

কোম্পানির জবাইকারী সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। সে মুসলিম না আহলে কিতাবি। মূর্তিপূজারী না নাস্তিক। তাছাড়া পশুর রগ একটি কেটেছে না দুটি কেটেছে সে ব্যাপারেও সন্দেহ রয়েছে। এই গোশত হালাল হওয়া সত্যায়নকারীর সাক্ষ্য না খোদ জবাই কার্যক্রমের ওপর ভিত্তি করে? না তার প্রতিনিধির প্রত্যক্ষের ওপর ভিত্তি করে?!!! এই প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ওই কোম্পানির জবাইকৃত পশুর গোশত খাওয়া বৈধ নয়।ওই কোম্পানি যে শরিয়ত সম্মত পদ্ধতিতে জবাই করে না এর প্রমাণ এ কথা থেকেও পাওয়া যায় যে, ওই কোম্পানির ডাইরেক্টর এই প্রস্তাবও দিয়েছেন যে, যদি আমদানিকারক দেশগুলো আমাদেরকে আগে থেকেই জানিয়ে দেয় যে, আমাদের এই পরিমাণ গোশতের প্রয়োজন তাহলে আমরা জবাইয়ের বিদ্যমান পদ্ধতি পরিবর্তন করে ইসলামি পদ্ধতিতে জবাই করতে সম্মত আছি।

৩. শায়খ আহমাদ ইবনু সালেহ মুহায়িরির পক্ষ থেকে 'সাদিয়া ওয়াইসা' কোম্পানির গরু এবং মুরগি জবাইয়ের পদ্ধতি বিষয়ে যে রিপোর্ট এসেছে। তাতে জবাইকারীর ধর্মীয় পরিচয়ে সন্দেহ পোষণ করা হয়েছে। অর্থাৎ, তার ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে কোনো তথ্য জানা যায়নি যে, সে আহলে কিতাব না মূর্তিপূজারী? দ্বিতীয় আরেকটি বিষয় হলো, গরুকে প্রথমে বৈদ্যুতিক শকের মাধ্যমে অজ্ঞান করা হয়। যখন গরু বেহুশ হয়ে যায়, তখন তাকে মেশিনের সাহায্যে পা-গুলো উপরের দিকে ঝুলিয়ে দিয়ে তারপর ছুরি দিয়ে গলা থেকে চামড়া ওঠানো হয়। এরপর ভিন্ন ছুরি দিয়ে রগ-শিরা কাটা হয় যার ফলে বেশ পরিমাণ রক্ত প্রবাহিত হয়। এসব কারণে ওই কোম্পানির জবাইকৃত পশু খাওয়া জায়েজ নেই।

৪. শায়খ আবদুল্লাহ গুদাইয়্যার পক্ষ থেকে লন্ডনে জবাইয়ের পদ্ধতি সম্পর্কে রিপোর্টে এই বলা হয়েছে যে, ওখানকার জবাইকারী হলো একদল যুব সমাজ। যারা ধর্ম ত্যাগ করেছে। তারা মূর্তিপূজা করে ও নাস্তিক্যবাদে বিশ্বাসী। জবাইয়ের পদ্ধতি হলো, মুরগিকে একটি মেশিনের মাঝে প্রবেশ করানো হয়। যখন মুরগি মেশিন থেকে বের হয়ে আসে তখন মৃত অবস্থায় বের হয়ে আসে। শরীরে কোনো পশম পাখা থাকেনা। গলায়ও কোনো জবাইয়ের চিহ্ন থাকে না। জবাইখানার ইংরেজ মালিক নিজে এ কথা স্বীকার করেছেন।

জবাইখানার কর্মচারীরা ধোঁকা দিয়ে থাকে যে, যদি কোনো ব্যক্তি স্বয়ংক্রিয় মেশিনের মাধ্যমে জবাইয়ের অবস্থা দেখতে চায়; যেখানে জবাইয়ের পর

গোশত বিভিন্ন দেশে রফতানি করে থাকে, তখন ওই ব্যক্তিকে জবাইখানার ওই অংশে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে কয়েকজন মুসলিম কর্মচারী নিজ দেশের মুসলিমদের চাহিদা পূরণে নিয়োজিত আছে। জবাইখানার মূল অংশে তাদের নিয়ে যাওয়া হয় না। এ বিষয়টি জবাইয়ের পদ্ধতি এবং জবাইকারীর ধর্মীয় পরিচয়ে সন্দেহ সৃষ্টি করে। তাই তাদের জবাইকৃত পশুর গোশত খাওয়া হালাল হবে না।

৫. উস্তাজ হাফিজ-এর পক্ষ থেকে ইউনান-এর কয়েকটি প্রসিদ্ধ অঞ্চলের ব্যাপারে এই রিপোর্ট এসেছে যে, ওখানে বড়ো বড়ো পশুর মাথায় গুলি চালিয়ে মাটিতে শুইয়ে দেওয়া হয়। তারপর জবাই করা হয়। এ জাতীয় পশুর ক্ষেত্রে যেহেতু সন্দেহ রয়েছে যে, জবাইটা কি মৃত্যুর পরে হয়েছে না মৃত্যুর আগে? এজন্য এ জাতীয় পশুর গোশত খাওয়া নাজায়েজ। ওই অঞ্চলে জবাইয়ের আরও একটি পদ্ধতি চালু রয়েছে যার ব্যাপারে রিপোর্টকারীর বক্তব্য হলো, সেই পদ্ধতিটি ইসলামি পদ্ধতিটির অনুকূলে। তবে হ্যাঁ, রিপোর্টকারী জবাইয়ের পদ্ধতি ও জবাইকারীর ধর্মীয় পরিচয় নিয়ে কিছু বলেননি। এমন কি জবাইয়ের স্থান ও জবাইকারী কোম্পানি সম্পর্কেও কিছু বলেননি।

৬. শায়খ আবদুল কাদের আরনাউতের পক্ষ থেকে যুগোস্লাভিয়ার জবাই-পদ্ধতি সম্পর্কে আমাদের কাছে রিপোর্ট এসেছে যে, যুগোস্লাভিয়ার গ্রাম ও উপশহরগুলোতে ইসলামি পদ্ধতিতে জবাই করা হয়। জবাইকারীও মুসলিম। তাই ওখানকার জবাইকৃত পশু খাওয়া জায়েজ। তবে যুগোস্লাভিয়ার অন্য শহরগুলোতে যেসব পশু জবাই করা হয় সেগুলোর জবাইকারী অমুসলিম। যারা বাহ্যত আহলে কিতাবি কিংবা শিয়া সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। তবে বাস্তবে এমন নয়। সুতরাং জবাইকারী নিয়ে সন্দেহ থাকায়, যুগোস্লাভিয়ার অন্য শহরের জবাইকৃত পশুর গোশত খাওয়া জায়েজ নেই।

৭. পশ্চিম জার্মানির জবাই সম্পর্কে ডাক্তার তাবা যে রিপোর্ট পাঠিয়েছেন তাতে বলা হয়েছে, জবাইয়ের পূর্বে গরুর মাথায় পিস্তল চালানো হয়, তারপর যখন গরুটি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে, তখন সেটিকে জবাই করা হয়। সুতরাং এ জাতীয় জবাইকৃত পশুও খাওয়া জায়েজ নেই।

৮. 'আল-মুজতামা' পত্রিকায় ডেনমার্কের জবাই সম্পর্কে একটি রিপোর্ট

প্রকাশ হয়েছে, ওখানকার জবাইকারীরা খ্রিস্টানদের তুলনায় মূর্তিপূজা ও জড়বাদে অধিক বিশ্বাসী। কোম্পানিগুলো ইসলামি পদ্ধতিতে জবাই করা সম্পর্কে নূন্যতম ধারনা রাখে না। মুখে মুখে তারা যেটুকু জেনেছে, মূলত ওটুকুই তাদের পুঁজি। সুতরাং কোম্পানির জন্য এটি কীভাবে সম্ভব যে, তারা ইসলামি জবাই সম্পর্কে ধারণা রাখবে? তারা যে গোশতের প্যাকেটে লিখে দেয় «ذبح على الطريقة الإسلامى» 'তথা এই গোশত ইসলামি শরিয়ত অনুযায়ী জবাইকৃত পশুর'। এই বাক্যটি মূলত গোশত রফতানির একটি ভূয়া পলিসি। যাতে করে মানুষ ধোঁকা খায়। মূলত এর কোনো বাস্তবতা নেই এবং তাতে আস্থা রাখারও কোনো সুযোগ নেই। কারণ, কোনো ব্যক্তি যদি তাদের জবাইয়ের অবস্থা সম্পর্কে জানতে চায়,তখন তারা তাকে বাধা দেয়।

শায়খ আহমাদ সালেহ মুহায়িরি, তিনি মুহাম্মাদ আল আবরাজ মাগরিবির মাধ্যমে একটি রিপোর্ট সংগ্রহ করেছেন। যিনি ডেনমার্কে গোশত প্যাকেজিং কাজে নিয়োজিত আছেন। তিনি বলেছেন, তারা যে গোশতের প্যাকেটে লিখে দেয় 'এই গোশত ইসলামি শরিয়ত অনুযায়ী জবাইকৃত' এটি মূলত সঠিক নয়। কারণ, তারা সব সময়ই বৈদ্যুতি শক দিয়ে পশুর মৃত্যু কার্যকর করে থাকে। সুতরাং এই দুই রিপোর্ট অনুযায়ী ডেনমার্ক থেকে আমদানিকৃত গোশত খাওয়া জায়েজ হবে না।

৯. ইবনু আরবি রহ. যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন, চতুষ্পদ জন্তু এবং পাখি—যা কোনো আহলে কিতাব জবাই করেছে—নিঃশর্তে তা খাওয়া জায়েজ। যদিও তাদের জবাইয়ের পদ্ধতি আমাদের জবাইয়ের পদ্ধতির অনুকরণে না হয়। তাছাড়া আহলে কিতাব তাদের ধর্মমতে যা হালাল মনে করে, তার অনেক কিছুই আমাদের ধর্মে হালাল। তবে ওইসব বিষয় ছাড়া যেগুলোতে তাদের মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা হয়েছে। ইতোপূর্বে জবাইয়ের যে পদ্ধতি এবং ফতোয়া বর্ণনা করা হয়েছে সে অনুযায়ী ইবনু আরাবি রহ.-এর অভিমত প্রত্যাখ্যানযোগ্য।

১০. জবাইয়ের পদ্ধতি ও জবাইকারীর ইমানদারি নিয়ে যে বিশদ আলোচনা ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে, তা থেকে এ কথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট প্রতীয়মান যে, বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মহোদয়ের পক্ষ থেকে 'আমদানিকৃত গোশত হালাল' হওয়ার যে সত্যায়নপত্র দেওয়া হয়েছে তা

নিয়ে চিন্তামুক্ত হওয়া যথেষ্ট নয়। বরং অন্তরে খটকা লেগেই আছে যে, এ জবাই ইসলামি পদ্ধতিতে হয়েছে কি না? আর গোশত-এর ক্ষেত্রে মূল বিধান হলো হারাম হওয়া। সুতরাং এই জটিলতা নিরসন করা অত্যন্ত জরুরি।

আমদানিকৃত গোশতের জটিলতা নিরসন

আমদানিকৃত গোশতের ব্যাপারে যে জটিলতা রয়েছে তা নিরসনের সারমর্ম নিচে তুলে ধরা হলো—

এক.

ব্যাপকহারে পশুপ্রাণী পালনের ব্যবস্থা করতে হবে। এগুলো লালন-পালনের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। দেশের চাহিদা মেটাতে যে পরিমাণ পশুর প্রয়োজন সেই পরিমাণ জীবিত প্রাণী আমদানি করতে হবে। এরপর সেগুলো লালন-পালনের জন্য দেশেই সুন্দর ও নিরাপদ ব্যবস্থা করতে হবে এবং দেশের ভেতরেই থাকবে এবং এই কাজে আগ্রহী কোম্পানিগুলোকে সার্বিক সহযোগিতা দিতে হবে। তাছাড়া পশু রফতানির নীতিমালা সহজ করতে হবে। সহজলভ্য এই ব্যবস্থাপনা পনির তৈরি কারখানা, গোশত প্যাকেটজাত তেল, ঘি এবং অন্যান্য তেল প্রস্তুতের কারখানাগুলোকেও দিতে হবে।

দুই.

যেসব অমুসলিম রাষ্ট্র থেকে সৌদিআরবসহ অন্যান্য ইসলামি রাষ্ট্র গোশত আমদানি করে থাকে, সেই সব রাষ্ট্রে এমন জবাইখানা তৈরি করে নেবে যার সব কর্মচারী হবে মুসলিম যারা ইসলামি নিয়ম অনুযায়ী জবাই করে থাকে।

তিন.

অমুসলিম দেশগুলোর যেসব কোম্পানি সৌদিআরবসহ অন্যান্য ইসলামি রাষ্ট্রে গোশত রফতানি করে, তাদের কোম্পানিগুলোতে বিশ্বস্ত এবং শরিয়তসম্মত জবাইয়ের ব্যাপারে জ্ঞান রাখে এমন কিছু লোক নির্দিষ্ট করে পাঠিয়ে দিতে হবে। এ জাতীয় শ্রমিকের সংখ্যা হবে

সৌদিআরবসহ অন্যান্য ইসলামি রাষ্ট্রে যে পরিমাণ গোশত সরবরাহের প্রয়োজন, সে পরিমাণ গোশত সরবরাহে সক্ষম এমন একটি শ্রমিক সংখ্যা।

চার.

সৌদিআরবসহ অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রে গোশত রফতানিকারক কোম্পানিগুলোতে জবাইয়ের শরয়ি বিধান এবং খাদ্যদ্রব্য সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ মুসলিম কর্মচারী নিয়োগ দেবে। যাতে করে তারা জবাই কার্যক্রম, পনির তৈরি এবং গোশত প্যাকেটজাত করতে তদারকি করতে পারে।

ইহুদিরা যেহেতু এ বিষয়ে গুরুত্ব দিতে পারে, তাদের আকিদ বিশ্বাস অনুযায়ী জবাই কার্য সম্পাদন করতে পারে। নিজস্ব জবাইখানা ও কর্মচারী নিয়োগ দিতে পারে তাহলেতো মুসলিমরা এ বিষয়ে আরও অধিক অগ্রসর হওয়া উচিত এবং অপরিহার্য। কারণ, পশ্চিমা বিশ্বের উৎপাদিত পণ্যগুলো ব্যপকহারে মুসলিম সম্প্রদায় ব্যবহার করতে থাকে। আর রফতানিকারক দেশগুলো নিজেদের গোশত ও উৎপাদিত পণ্যগুলোকে মুসলিম রাষ্ট্রে রফতানি করার প্রয়োজনটা তাদেরই বেশি।

সভাপতি : আবদুল আজিজ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু বাজ
সহ-সভাপতি : আবদুর রাজ্জাক আকিফি
সদস্য : আবদুল্লাহ ইবনু গাদয়ান
সদস্য : আবদুল্লাহ ইবনু কুউদ

মোটকথা, 'গ্রান্ড ওলামা বোর্ড' এর উল্লিখিত প্রতিনিধিদের রিপোর্ট এবং 'লাজনাতুত দায়িমাহ লিল-বুহুস ওয়াল ইফতা' এর উল্লিখিত সুপারিশসমূহ এই কথা প্রমাণে যথেষ্ট যে, আমদানিকৃত গোশতের প্যাকেটে 'ইসলামি বিধান অনুযায়ী জবাইকৃত' এর যে লেভেল থাকে তার ওপর মোটেও আস্থা রাখা যায় না। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বস্ত মাধ্যমে শরিয়ত অনুযায়ী জবাইয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত না হওয়া যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই গোশত খাওয়া জায়েজ হবে না।

আলোচনার সারমর্ম

এক.

জবাইয়ের বিষয়টি সাধারণ অন্যান্য বিষয়ের মতো নয় যে, তাতে কোনো শরিয়তের বাধ্যবাধকতা নেই। যেমন : খাবার পাকানো। বরং এটি একটি ইবাদত কেন্দ্রিক বিষয়, যা কুরআন-সুন্নাহ-এ বর্ণিত বিধিবিধানের অনুবর্তী। শুধু তাই নয়, জবাইয়ের কাজটি ইসলামি নিদর্শনের অন্যতম একটি নিদর্শন। যে নিদর্শনের মাধ্যমে মুসলিম-অমুসলিম এর মাঝে পার্থক্য নির্ণিত হয়। যেমন : রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

> من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذى له ذمة الله وذمة رسوله.
>
> 'যে ব্যক্তি আমাদের নামাজের মতো নামাজ পড়ে, আমাদের কেবলামুখি হয় এবং আমাদের জবাইকৃত পশু খায়, তাহলে সে মুসলিম। আল্লাহ এবং তার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম এর জিম্মাদার।'[১৯৯]

দুই.

যে প্রাণীর গোশত খাওয়া হালাল, সে প্রাণীও ততক্ষণ পর্যন্ত হালাল হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত শরিয়তসম্মত পদ্ধতিতে জবাই করা না হবে । আর শরিয়তসম্মত জবাইয়ের জন্য যেসব শর্তের প্রয়োজন তা নিচে দেওয়া হলো।

ক. যে প্রাণীকে জবাই করা সম্ভব, সেই প্রাণীর প্রাণ বের করতে হবে গলার রগ-শিরা কাটার মাধ্যমে। প্রকাশ থাকে যে, রগ কাটার সর্বনিম্ন পরিমাণ নিয়ে ফকিহগণের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে।

খ. জবাইকারী আকেল, মুসলিম অথবা ইহুদি বা খ্রিস্টান হতে হবে।

গ. জবাইয়ের সময় আল্লাহর নাম নিতে হবে। সুতরাং কেউ যদি জেনেশুনে আল্লাহর নাম না নেয়, তাহলে অধিকাংশ ফকিহ-এর অভিমত অনুযায়ী সেই পশু 'মৃত পশুর হুকুমে হয়ে যায়। এই অভিমতের স্বপক্ষে এমন দলিল-প্রমাণও পাওয়া যায়, যেগুলোর উদ্দেশ্য খুব পরিস্কার।

---

[১৯৯] সহিহ বুখারি, হাদিস : ৩৯১।

হ্যাঁ, তবে যদি কেউ জবাইয়ের সময় আল্লাহর নাম নিতে ভুলে যায়, তাহলে এমন ব্যক্তি 'অপারগ' বলে গণ্য হবে এবং তার জবাইকৃত পশু হালাল হিসেবে বিবেচিত হবে। ইমাম শাফিয়ি রহ.-এর দিকে যে অভিমতের নিসবত করা হয়ে থাকে যে, ইচ্ছাকৃতভাবে জবাইয়ে 'বিসমিল্লাহ' ছেড়ে দিলেও সেই জবাইকৃত পশু হালাল। মূলত এ অভিমতটি এমন যার কোনো ভিত্তি নেই। বরং 'কিতাবুল উম্ম'-এ যে ভাষ্য উল্লেখ আছে তা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম শাফি রহ.-এর বক্তব্য ভুলবশত 'বিসমিল্লাহ' ছেড়ে দিলে তখন তা খাওয়া জায়েজ। উল্লেখ্য, তিনি এ কথা স্পষ্ট করে বলেছেন যে, কেউ যদি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে 'বিসমিল্লাহ' ছেড়ে দেয় তাহলে ওই জবাইকৃত পশু হারাম হিসেবে গণ্য হবে।

তিন.

আহলে কিতাবের জবাইকৃত পশু এ জন্য হালাল সাব্যস্ত করা হয়েছে যে, তারা জবাইয়ের সময় শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত শর্তাবলির প্রতি লক্ষ্য রাখে। যেমন : আহলে কিতাব, মৃত জন্তু, শ্বাসরোধে মৃত জন্তু, পাথরের আঘাতে মৃত জন্তু, হিংস্র প্রাণীর আক্রমনে নিহত জন্তু, এ জাতীয় সব মৃত জন্তুকে তারা হারাম সাব্যস্ত করে থাকে। যেমনটি তার পবিত্র ধর্মগ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। ইতোপূর্বে এ বিষয়গুলো আমরা বিশদভাবে আলোচনা করে এসেছি। তাছাড়া আহলে কিতাবিরা জবাইয়ের সময় শুধু আল্লাহর নাম নিয়ে থাকে। এজন্যই তাদের জবাইকৃত পশু মুসলিমদের জবাইকৃত পশুর মতো মনে করা হয় এবং মুসলিমদের জন্য তা হালাল সাব্যস্ত করা হয়।

চার.

এমনিভাবে মুসলিমদের জন্য, আহলে কিতাবের নারীদের বিয়েকে বৈধ সাব্যস্ত করা হয়েছে। কারণ, তারা বিয়ে-শাদীর ক্ষেত্রে ওইসব নিয়মনীতির অনুসরণ করে থাকে, যাতে ইসলামি বিয়ের সাদৃশ্য রাখে। এ জন্য শরিয়ত অনুযায়ী বিয়ে জায়েজ হওয়ার ক্ষেত্রে জরুরি হলো, এ বিয়ে ইসলামি শরিয়তসম্মত হতে হবে। যেভাবে 'মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন—

﴿وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ.﴾

'তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তাদের সচ্চরিত্রা নারীগণ (তোমাদের জন্য বৈধ করা হলো); যদি তোমরা তাদেরকে মোহর দিয়ে বিয়ে করো।'[২০০]

সর্বসম্মতিক্রমে এটি শর্তযুক্ত যে, স্বামী-স্ত্রী অবশ্যই শরয়ি নিয়ম-নীতি অনুযায়ী বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে। অন্যথায় বিয়ে সঠিক হবে না। ঠিক একইভাবে জবাইও শরিয়তসম্মতভাবেই হতে হবে। অন্যথায় হালাল হবে না।

﴿وَ طَعَامُ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ﴾

'মহান আল্লাহ বলেন— যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তাদের (জবাইকৃত পশু) খাদ্যদ্রব্য তোমাদের জন্য বৈধ'[২০১]

উপর্যুক্ত এই ঘোষণাতেও শর্ত হলো, জবাইয়ের সময় অবশ্যই ইসলামি বিধান মেনে জবাই করতে হবে। কারণ, এই উভয় হুকুম একই সূত্রে গাঁথা।

পাঁচ.

ইবনু আরাবি রহ.-এর এই উক্তি; যে প্রাণীকে আহলে কিতাব শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করেছে। ওই প্রাণী খাওয়া হালাল। ইবনু আরাবি রহ.-এর এই উক্তিটি স্বয়ং তার আরেকটি উক্তির বিপরীত। যেখানে তিনি বলেছেন, আহলে কিতাবের জবাইকৃত প্রাণী তখনই হালাল যখন তারা জবাইয়ের ক্ষেত্রে শরিয়তের বিধিবিধানের অনুসরণ করবে। সুতরাং তাঁর এই বিপরীতমুখী উক্তি থেকে ওই উক্তিই গ্রহণ করা হবে যা স্পষ্ট দলিল-প্রমাণ ও আহলে ইলমদের সর্বসম্মত অভিমতের অনুকূলে হয়।

দ্বিতীয় বিষয় হলো, ইবনু আরাবি রহ.-এর অভিমত হলো আহলে কিতাবের 'শ্বাসরোধে মৃত জন্তু' হালাল। আর ইবনু আরাবি রহ.-এর এই মতটির ভিত্তি হলো, খ্রিস্টান ধর্মে 'শ্বাসরোধে মৃত জন্তু' হালাল এর ওপর। তবে খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থসমূহে এর বিপরীত হুকুম রয়েছে (অর্থাৎ, শ্বাসরোধে মৃত জন্তু হালাল নয়)। সুতরাং ইবনু আরাবি রহ.-এর এই দুর্লভ অভিমতের কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই।

---

[২০০] সুরা মায়িদা, আয়াত : ৫।

[২০১] সুরা মায়িদা, আয়াত : ৫।

ছয়.

নির্ভরযোগ্য অভিমত হলো, আহলে কিতাবের জবাইকৃত প্রাণী হালাল হওয়ার জন্য শর্ত হলো, 'বিসমিল্লাহ' বলা। যেমনিভাবে মুসলিমদের জবাইকৃত প্রাণী হালাল হওয়ার জন্য 'বিসমিল্লাহ' বলা শর্ত। 'মহান আল্লাহ বলেন— وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ 'যে প্রাণী জবাইয়ের সময় আল্লাহর নাম নেওয়া হয়নি, তা তোমরা খেয়ো না'। উল্লিখিত আয়াতের ব্যাপকতার কারণে এতে মুসলিমদের এবং আহলে কিতাব সবাই শামেল। বিশেষ করে এ আয়াতের لَمْ يُذْكَرِ শব্দটি 'মাজহুল' এর সিগা ব্যবহৃত হওয়াই এর কারণ।

সাত.

আহলে কিতাব দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ওই ইহুদি ও খ্রিস্টান যারা নিজ ধর্মের মৌলিক আকিদা-বিশ্বাসের ওপর ইমান রাখে। যদিও নিজ ধর্মের ভ্রান্ত আকিদা-বিশ্বাস, যেমন : 'ত্রিত্ববাদ, 'কাফফারা' ইত্যাদির ওপর ইমান রাখে। তবে যে আহলে কিতাব 'আল্লাহ' 'রাসুল' ও আসমানি কিতাবের ওপর ইমান রাখে না এমন আহলে কিতাব মূলত নাস্তিক ও বস্তুবাদে বিশ্বাসী। তাদের ক্ষেত্রে আহলে কিতাবের বিধান লাগানো যাবে না। যদিও 'ধর্মের ঘরে' তাদের নামের সঙ্গে ইহুদি, খ্রিস্টান লেখা হয়েছে।

আট.

মুসলিমদের অঞ্চলে যে গোশত কেনা-বেচা হয়, যদিও তার জবাইকারী সম্পর্কে কিছু জানা না থাকে, তবুও ধরে নিতে হবে যে, এটি শরয়ি পদ্ধতিতে জবাই করা হয়েছে এবং তার গোশত খাওয়া হালাল। হ্যাঁ, তবে যদি নিশ্চিতভাবে এই গোশতের ব্যাপারে জানা যায় যে, এর জবাই শরিয়তসম্মত পদ্ধতিতে হয়নি তাহলে সেই গোশত খাওয়া জায়েজ হবে না। এর প্রমাণ আয়শা রা.-এর হাদিস, যা 'গ্রাম্য ব্যক্তির জবাইয়ের ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে।

নয়.

আহলে কিতাবের বাজারে যে গোশত বেচা-কেনা হয় সে ক্ষেত্রে এটিই মনে করতে হবে যে, এটি আহলে কিতাবের জবাইকৃত গোশত। তবে যদি

নিশ্চিতভবে জানা যায় যে, এর জবাইকারী ভিন্ন কেউ তাহলে সেটি ভিন্ন কথা। (অর্থাৎ, খাওয়ার কোনো সুযোগ নেই)

দশ.

বর্তমান যুগে খ্রিস্টানদের জবাই কার্যক্রম নিজ ধর্মের আমল থেকে দূরে সরে আছে। এখন তারা নিজেদের ধর্মের বিধিবিধান ছাড়তে কোনো পরোয়া করে না। তাই তারা জবাইয়ের ক্ষেত্রে শরিয়তের বিধানকে অপরিহার্য মনে করে না। সুতরাং বর্তমান যুগের খ্রিস্টানদের জবাইকৃত গোশত খাওয়া হালাল হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত নির্দিষ্ট গোশত সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে জানা না যাবে যে, এই গোশত খ্রিস্টানরা শরিয়তসম্মত পদ্ধতিতে জবাই করেছে। সুতরাং খ্রিস্টানদের বাজারে যে গোশত কেনা-বেচা হয়, তার জবাইকারী সম্পর্কে জানা ছাড়া গোশত খাওয়া হালাল হবে না।

এগারো.

মেশিন দ্বারা মুরগি জবাই করলে শরিয়তের দৃষ্টিতে কয়েকটি আপত্তি রয়েছে। নিচে সেগুলো তুলে ধরা হলো—

ক. জবাইয়ের আগে মুরগিকে বিদ্যুৎ-সংযোজিত ঠান্ড পানিতে ছেড়ে দেওয়া হয়। এতে করে এই সম্ভাবনা রয়েছে যে, জবাইয়ের আগেই মুরগি মারা গিয়েছে।
খ. ঘূর্ণমান ছুরি দ্বারা মুরগি জবাইকালে যথাযথভবে 'বিসমিল্লাহ' পড়া একটি অসম্ভব কাজ।
গ. অনেক সময় সবগুলো রগ কেটেছে কি না তাতে সন্দেহ থেকে যায়।

বারো.

নিচে যে পদ্ধতিগুলো উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোর প্রতি যত্নবান হলে, মেশিনে জবাই শরিয়তসম্মত পদ্ধতিতে হওয়া সম্ভব।

ক. মুরগিকে বেঁহুশ করার জন্য বিদ্যুৎ সংযোজন পদ্ধতি বর্জন করতে হবে। অথবা বিদ্যুৎ সংযোজন এমন সহনীয় পর্যায়ে রাখতে হবে যা দ্বারা নিশ্চিত হওয়া যায় যে, এর দ্বারা মুরগির মৃত্যু হবে না।

খ. ঘূর্ণমান ছুরি তুলে নেওয়া হবে। এর স্থলে কয়েকজন মুসলিম। কিংবা আহলে কিতাব দাঁড় করিয়ে রাখবে। যারা অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে প্রত্যেকটা মুরগির ক্ষেত্রে স্বতন্ত্রভাবে 'বিসমিল্লাহ' বলে জবাই করে।

গ. জবাইয়ের পরে যে গরম পানিতে মুরগি রাখা হয়, সে পানি স্বাভাবিক গরম হতে হবে।

তেরো.

গরু, ছাগল ইত্যাদি মেশিনের সাহায্যে জবাই করলে নিম্নোক্ত আপত্তি দুটি উত্থাপিত হতে পারে।

ক. যে পদ্ধতিতে প্রাণী অজ্ঞান করা হয়, যেমন : পিস্তল ব্যবহার করে, কার্বন অক্সাইড গ্যাস ব্যবহার করে অথবা বিদ্যুৎ শর্ট দিয়ে। এ জাতীয় পদ্ধতি অবলম্বন করে পশুকে অজ্ঞান করা হলে জবাইয়ের পূর্বে পশু মারা যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই এ জাতীয় পদ্ধতিগুলোকে এমন সহনীয় পর্যায়ে আনতে হবে। যাতে তা অবলম্বন করার দ্বারা প্রাণীর কষ্ট না হয় এবং মৃত্যুর কারণও না হয়।

খ. দ্বিতীয় আপত্তি হলো, এ জাতীয় পদ্ধতিগুলো অনেক সময় পশুর রগ কাটার মাধ্যম না হয়।

যদি উপর্যুক্ত দুটি আপত্তির নিরসন করা যায় তাহলে মেশিনের মাধ্যমে জবাই করা যেতে পারে।

চৌদ্দ.

অমুসলিম রাষ্ট্র থেকে যে গোশত এসে থাকে, তা খাওয়া জায়েজ নেই। যদিও সেই গোশতের প্যাকেটে পরিস্কার ভাষায় লিখে দেওয়া হয়, 'ইসলামি পদ্ধতিতে জবাইকৃত'। কারণ, প্রমাণিত হয়েছে, যে মূলত এর কোনো বাস্তবতা নেই। সুতরাং এর ওপর আস্থা রাখা যায় না। আর গোশতের প্রকৃত অবস্থা হলো 'হারাম' হওয়া।

সুপারিশসমূহ

এক.

মুসলিম দেশসমূহের উচিত, পশু উৎপাদন ও প্রজননে বেশ তৎপর হওয়া এবং পর্যায়ক্রমে আরও ব্যাপকহারে উৎপাদনের ব্যবস্থা করা যাতে করে দেশের চাহিদা মেটাতে ভিন্ন কোনো অমুসলিম দেশ থেকে পশু আমদানি করতে না হয়।

দুই.

যদি কোনো মুসলিম দেশের গোশত আমদানির প্রয়োজন হয়, তাহলে যেন শুধু মুসলিম রাষ্ট্র থেকেই গোশত আমদানি করে।

তিন.

যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলামি রাষ্টগুলো নিজের দেশের চাহিদা অনুযায়ী গোশতের যোগান দিতে না পারবে, ততক্ষণ পর্যন্ত রাষ্ট্র কর্তৃক অমুসলিম দেশের রফতানি কারক কোম্পানিগুলোকে বাধ্য করবে। তারা যেন মুসলিম রাষ্ট্রের বিজ্ঞ আলেম এবং বিশ্লেষকদের একটি প্রতিনিধি দল তাদের কোম্পানিগুলো পরিদর্শনে নিয়ে যায়। এই প্রতিনিধি দল, কোম্পানি কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানাবে তারা যেন ইসলামি শরিয়ত অনুযায়ী জবাই কার্যক্রম পরিচালনা করে। এরপর মুসলিম দেশ কর্তৃক বিচক্ষণ আত্মমর্যাদাবোধ-সম্পন্ন কয়েকজন মুসলিম নির্দিষ্ট করে দেবে। যারা একান্তভাবে জবাইয়ের পদ্ধতিকে বিশ্বস্ততার সঙ্গে তত্ত্বাবধান করবে। যতক্ষণ পর্যন্ত জবাই সংক্রান্ত বিষয়ে পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত শরিয়তসম্মত জবাই-এর সার্টিফিকেট দেবে না।

অবশ্য বর্তমানে প্রচলিত যে সংক্ষিপ্ত সার্টিফিকেট দিয়ে থাকে, তা কখনো দেবে না। যেমন : 'এই গোশত হালাল' অথবা 'ইসলামি পদ্ধতিতে জবাইকৃত'। বরং সার্টিফিকেটে শরয়ি জবাইয়ে আবশ্যক, এমন সবগুলো বিষয় উল্লেখ করবে। যেমন : 'এই পশুর জবাইকারী মুসলিম কিংবা আহলে কিতাব, জবাইয়ের সময় 'বিসমিল্লাহ' পড়া হয়েছে। পশু হালাল হওয়ার জন্য যেসব রগ কাটা জরুরি, সেগুলো কাটা হয়েছে।

চার.

মুসলিম রাষ্ট্র গোশত আমদানিকারক কোম্পানিগুলোকে গোশতের প্যাকেটে সংক্ষিপ্ত এই লেভেল লাগাতে নিষেধ করবে। যেমন : 'এই গোশত হালাল' বরং তিন নং সুপারিশে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা উল্লেখ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করতে হবে।

পাঁচ.

'ইসলামি ফেকাহ্ একাডেমি' একটি মতবিনিময় সভার আহ্বান করতে পারে। যাতে গোশত আমদানিকারক মুসলিম দেশের কোম্পানিগুলোর কর্তৃপক্ষ ও প্রতিনিধিরা থাকবে। তাদের সামনে এ বিষয়টির গুরুত্ব ও সঠিক পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা হবে। এরপর 'ইসলামি ফেকাহ্ একাডেমি' এ বিষয়ে একটি বিস্তারিত প্রস্তাব পেশ করবে।

চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত

মাকতাবাতুল ইসলাম থেকে প্রকাশিত
লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

১. পরকালের সম্বল : সহজে নেকি অর্জন [আসান নেকিয়াঁ]

২. দেশ দেশান্তর-১ [জাহানে দিদা-১]

৩. দেশ দেশান্তর-২ [জাহানে দিদা-২]

৪. দেশ দেশান্তর-৩ [দুনিয়া মেরে আগে]

৫. দেশ দেশান্তর-৪ [সফর দর সফর]

৬. নির্বাচিত গল্প [সংকলন]

৭. ইসলাহি গল্প [সংকলন]

৮. ইমানি গল্প [সংকলন]

৯. আমার পিতা আমার শায়খ [মেরে ওয়ালিদ মেরে শায়খ]

১০. সুদবিহীন ব্যাংকিং [গায়রে সুদি ব্যাংকারি]

পাঠকের পাতা

ফিকহি মাকালাত চতুর্থ খণ্ডে যা আছে

- উমরি কাজার হাকিকত
- কারাগার, সেনানিবাস ও বিমানবন্দরে জুমার নামাজ
- নারীর হিজাব ও তার সীমারেখা
- ইসলামে ছবি-ভাস্কর্যের বিধান
- হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসার বিধান
- পশু জবাইয়ের বিধান
- আধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা পশু জবাইয়ের পদ্ধতি ও তার হুকুম
- অমুসলিম দেশ থেকে আমদানিকৃত গোশতের বিধান

মাকতাবাতুল ইসলাম
ISBN [illegible]
www.maktabatulislam.com